মুখতাসার

লাতায়িফুল মাআরিফ

গ্রন্থের অনুবাদ

জীবনকে কাজে লাগান

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সারা বছরের আমল

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী رحمه الله

ফালাহ

'মুখতাসারু লাতায়িফিল মাআরিফ' গ্রন্থের সরল অনুবাদ

জীবনকে কাজে লাগান

(কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সারা বছরের আমল)

মূল
ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী ﵀

সংক্ষেপণ
আহমাদ ইবনু উসমান আল-মাযইয়াদ
মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান আল-মুহান্না

অনুবাদ
মাওলানা আবদুল্লাহ জুবায়ের রাফে

এমন আরও বই পেতে
https://t.me/Pdfbookislmic

دار الفلاح
দারুল ফালাহ

টেলিগ্রাম : PDF আকারে ইসলামিক বই

জীবনকে কাজে লাগান

গ্রন্থস্বত্ব ©সংরক্ষিত ২০২২

প্রকাশক :
দারুল ফালাহ

একমাত্র পরিবেশক :
সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড
৩৪, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
☏ ০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯, ০১৪০৬ ৩০০ ১০০
অভিযোগ ও পরামর্শ : ০১৭১১ ০৬৯ ০৩৯
darulfalah2050@gmail.com
www.facebook.com/darulfalah2050

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০২২
অনলাইন পরিবেশক : ওয়াফি লাইফ, রকমারি.কম, বইফেরী
মুদ্রণ ও বাঁধাই : বই কারিগর

মূল্য : ৪৫০৳

ISBN : 978-984-96375-9-2

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ৭

সংকলকের ভূমিকা ১০

আল্লাহর যিকরের গুরুত্ব এবং উপদেশের আলোচনা ১৫

আল্লাহর মাস মুহাররমের পালনীয় ৩২

প্রথম পর্ব : মুহাররম মাস এবং তার প্রথম দশকের ফযিলত ৩২

প্রথম পরিচ্ছেদ : নফল সিয়ামের গুরুত্ব ৩২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তাহাজ্জুদ সালাতের গুরুত্ব ৩৭

দ্বিতীয় পর্ব : আশুরার দিন ৪৫

তৃতীয় পর্ব : হাজীদের আগমন ৫৪

সফর মাসে পালনীয় ৫৮

রবিউল আউয়াল মাসে পালনীয় ৬৮

প্রথম পর্ব : নবি ﷺ-এর জন্মের আলোচনা ৬৮

দ্বিতীয় পর্ব : নবি ﷺ-এর জন্মের আলোচনা ৭৮

তৃতীয় পর্ব : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের আলোচনা ৮৩

রজব মাসে পালনীয় ১০৪

শাবান মাসে পালনীয় ১১১

প্রথম পর্ব : নবি ﷺ-এর সিয়াম ১১১

দ্বিতীয় পর্ব : অর্ধ শাবানের আলোচনা ১২২

তৃতীয় পর্ব : শাবানের শেষে সিয়াম পালন করা ১২৯

সম্মানিত রমাদান মাসে পালনীয় ১৩৭

প্রথম পর্ব : সিয়ামের ফযিলত ১৩৭

দ্বিতীয় পর্ব : রমাদানে দান এবং তিলাওয়াতের ফযিলত ১৫০

তৃতীয় পর্ব : মধ্য-রমাদান এবং শেষার্ধের আলোচনা ১৬৫

চতুর্থ পর্ব : রমাদানের শেষ দশকের আলোচনা ১৭৫

পঞ্চম পর্ব : রমাদানের আখেরি সাত রাত ১৮০

ষষ্ঠ পর্ব : বিদায় মাহে রমাদান ১৮৪

শাওয়াল মাসের পালনীয় ১৯৪

প্রথম পর্ব : শাওয়াল মাসের সিয়াম ১৯৪

দ্বিতীয় পর্ব : হাজ্জের আলোচনা ১৯৮

তৃতীয় পর্ব : ওজরের কারণে বদলি হাজ্জ ও উমরাহ ২১১

যুল-ক্বা'দাহ মাসে পালনীয় ২২৬

যুল-হিজ্জাহ মাসে করণীয় ২৩২

প্রথম পর্ব : প্রথম দশকের গুরুত্ব ২৩২

প্রথম পরিচ্ছেদ : এ দশকের আমলের ফযিলত ২৩২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : এই দশকের ফযিলত ২৩৫

দ্বিতীয় পর্ব : আরাফাহ এবং কুরবানির দিনের ফযিলত ২৪০

তৃতীয় পর্ব : তাশরীকের দিনগুলো সম্পর্কে ২৫৩

চতুর্থ পর্ব : বছরের পড়ন্ত বেলা ২৬২

সৌরবর্ষের ঋতুগুলোতে করণীয় ২৬৯

প্রথম পর্ব : বসন্তকালের আলোচনা ২৬৯

দ্বিতীয় পর্ব : গ্রীষ্মকালের আলোচনা ২৮০

তৃতীয় পর্ব : শীতকালের আলোচনা ২৮৩

পরিশিষ্ট : তাওবার আলোচনা ২৮৯

অনুবাদকের কথা

সময়ের বিবর্তন, রাত দিনের আবর্তন, মৌসুমের পরিবর্তন সবই আল্লাহর দান। এগুলো পৃথিবীতে আল্লাহর রীতি। তাঁরই একান্ত অনুগ্রহের ফলে পালাক্রমে সবকিছুর পরিবর্তন হয়। উদ্দেশ্য, বান্দা যাতে এসব দেখে আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয় এবং শিক্ষা নেয়। আল্লাহ বলেন,

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبۡرَةٗ لِّأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ ٤٤

'আল্লাহ দিন ও রাতের আবর্তন ঘটান, নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।'[১]

وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ خِلۡفَةٗ لِّمَنۡ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوۡ أَرَادَ شُكُورٗا ٦٢

'যারা উপদেশ গ্রহণ করতে বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়, তাদের জন্য তিনি রাত-দিন সৃষ্টি করেছেন সেগুলো পালা করে আসতে থাকে।'[২]

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। সেগুলো শেখানোর জন্য আল্লাহ মানুষের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আদি পিতা আদম ﵇ থেকে শুরু করে সব নবিই এ দায়িত্ব পালন করেছেন। শেষ নবি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এরও দায়িত্ব ছিল এটাই। এ দায়িত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَذَكِّرۡ فَإِنَّ ٱلذِّكۡرَىٰ تَنفَعُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٥

'আপনি মনে করিয়ে দিন; কারণ, মনে করিয়ে দিলে মুমিনদের উপকার হয়।'[৩]

[১] সূরা নূর, ২৪ : ৪৪

[২] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬২

[৩] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫৫

নবিগণের পরে তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ যুগে যুগে এ দায়িত্ব পালন করছেন এবং করে চলেছেন। তাদের অনেকে আমাদের মাঝে রেখে গেছেন অনেক কীর্তি, গড়ে গেছেন অনেক ইতিহাস। সেসব অমর কীর্তি ও স্মরণীয় ইতিহাসের প্রভাব আজও অনস্বীকার্য। দেশের পর দেশ, যুগের পর যুগ পেরিয়ে আজও সেগুলো সমান সমাদৃত।

সেসব পূর্বসূরির একজন হলেন ইমাম যাইনুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনু আহমাদ ইবনু রজব হাম্বলী ﵀। ইবনু রজব হাম্বলী নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। ১৩৩৫ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৭৩৬ হিজরিতে তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৯৩ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৭৯৫ হিজরিতে তাঁর ইন্তিকাল হয়। জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু শাখায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। মূলত হাম্বলী ফিকহের অনুসারী হলেও, তিনি বিশেষ কোনো ফিকহের নয়; বরং গোটা উম্মাহর এক অনন্য সম্পদ ছিলেন। হাদীস অনুধাবন এবং তার শিক্ষা উম্মাহর মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন।

তাঁর সংকলিত *'লাতায়িফুল মাআরিফ'* গ্রন্থটি এক অনবদ্য সংকলন। এতে তিনি বছরের বিভিন্ন সময়, মাস এবং ঋতু সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ, পূর্বসূরিদের বক্তব্য, শিক্ষণীয় ঘটনাবলি এবং কবিতার অপূর্ব সমাহার ঘটিয়েছেন। চমৎকার আলোচ্যবিষয়, সুন্দর ভাষাশৈলী এবং প্রাসঙ্গিক সংযোজনের মাধ্যমে উপদেশ এবং শিক্ষা যেমন লাভ হয়, তেমনি পাঠকের আত্মিক পরিশুদ্ধিও ঘটে থাকে। উপস্থাপনা এবং বর্ণনাভঙ্গি চমৎকার হওয়ার কারণে গ্রন্থটি পড়তে পাঠকের মনে কোনো রকম বিরক্তির উদ্রেক হয় না।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি, এ অমূল্য গ্রন্থটি বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে নির্বাচন করেছেন। দেশের অন্যতম সৃজনশীল প্রকাশনী *'দারুল ফালাহ'* এর কর্ণধার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আহমাদ রোকন উদ্দিন আমাকে বইটি অনুবাদের দায়িত্ব প্রদান করেন। পাশাপাশি নির্দেশ দেন—মূল কিতাবটির কলেবর বড় হওয়ায় বাঙালি পাঠকদের সুবিধার কথা চিন্তা করে সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি অনুবাদ করতে।

আমি খোঁজ করে কিতাবটির দুটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সন্ধান পাই। একটি শাইখ আহমাদ ইবনু উসমান আল-মাযইয়াদকৃত; আর অপরটি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান আল-মুহান্নাকৃত। উভয়টিকেই সামনে রেখে শুরু করি অনুবাদকর্ম। তবে বরাবরই মূল কিতাবটি পাশে রেখেছি। দুই সংক্ষিপ্ত সংস্করণের যথাসাধ্য সমন্বয়

ঘটিয়ে কখনো কখনো মূল কিতাব থেকেও যেসব অংশ অতীব প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে, তার কিছু অংশ তুলে দিয়েছি। বাংলায় বক্তব্যের গতি ধরে রাখার সুবিধার্থে আরবি কবিতাগুলি এড়িয়ে গেছি। কতটা সফল হয়েছি, তা বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ পাঠকই ভালো বলতে পারবেন। এ ব্যাপারে তাদের সুচিন্তিত মতামত আমরা সাদরে গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র পরিশ্রমকে একান্তভাবে তাঁর নিজের জন্য বানিয়ে নেন। এর বিনিময়ে তিনি যেন উপকৃত করেন সম্মানিত গ্রন্থকার, অনুবাদক, অনুবাদকের সম্মানিত বাবা-মা এবং উস্তায, গ্রন্থের সম্মানিত প্রকাশক, শ্রদ্ধাভাজন পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে এবং সব মুমিন নর-নারীকে। আমরা যেন তাঁর পছন্দনীয় কাজগুলো আঞ্জাম দিতে পারি। আমাদের জীবিতদের তিনি যেন ঈমানের সাথে, সালামতের সাথে, আফিয়াতের সাথে এবং কাফালতের সাথে 'খাতিমা বিল খাইর' নসীব করেন। আমীন।

মহান আল্লাহর অনুকম্পাপ্রার্থী
আবদুল্লাহ জোবায়ের রাফে

সংকলকের ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ

‘আমি রাত ও দিনকে করেছি দুটি নিদর্শন। রাতকে করেছি নিরালোক এবং দিনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পারো; এবং আমি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।’[৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ

‘তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিমান আর চাঁদকে বানিয়েছেন জ্যোতির্ময় এবং তার কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পারো।’[৫]

আল্লাহ তাআলা বছর ও সময়ের হিসাব জানাকে চাঁদের কক্ষপথের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কারও কারও মতে, তিনি এটাকে সম্পৃক্ত করেছেন সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে জ্যোতির্ময় বানানোর সাথে। কারণ, বছর ও মাসের হিসাব জানা যায় চাঁদের মাধ্যমে, আর সপ্তাহ ও দিনের হিসাব জানা যায় সূর্যের মাধ্যমে।

---

[৪] সূরা ইসরা, ১৭ : ১২

[৫] সূরা ইউনুস, ১০ : ৫

সূর্যের সাথে সালাত এবং সিয়ামের বিধান সম্পৃক্ত করার কারণ হলো, সূর্য দৃশ্যমান। এর জন্য কোনো রকম হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন পড়ে না। সুবহে সাদিক, সূর্যোদয়, সূর্য হেলে পড়া, অস্ত যাওয়া কিংবা বস্তুর ছায়া সমপরিমাণ হওয়া এবং লালিমা অস্ত যাওয়ার সাথে সালাতের ওয়াক্ত জড়িত। আর সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিনের অংশটুকু সিয়ামের সময়।

কিছু হুকুম মানার জন্য বান্দাকে আল্লাহ দৈনিক সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ সময়গুলোতে কিছু হুকুম মানা ফরয আর কিছু নফল। ফরয হুকুম হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং নফল হলো নফল যিকর, তিলাওয়াত, তাসবীহ ইত্যাদি। আবার চান্দ্রমাস অনুযায়ীও কিছু হুকুম মানার সময় নির্ধারণ করেছেন। যেমন : সিয়াম, যাকাত এবং হাজ্জ। এখানেও রমাদানের সিয়াম এবং হাজ্জের মতো কিছু হুকুম মানা ফরয আবার কিছু নফল। যেমন : শাবান, শাওয়াল এবং সম্মানিত কয়েকটি মাসের সিয়াম।

কয়েকটি মাসকে তিনি অন্য মাসগুলোর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন,

مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ

‘তার মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এগুলোতে তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করো না।’[৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

‘হাজ্জ হয় সুনির্দিষ্ট কয়েকটি মাসে।’[৭]

আবার কিছু রাত এবং দিনকে অন্যান্য রাত এবং দিনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যেমন লাইলাতুল কদরকে হাজার মাস থেকেও বেশি শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন এবং শপথ করেছেন দশটি রাতের। নির্ভরযোগ্য মতানুসারে এই দশটি রাত হলো যুল-হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ রাত। এ বিষয়ে আল্লাহ চাহেন তো যথাস্থানে আলোচনা করব।

---

[৬] সূরা তাওবা, ৯ : ৩৬

[৭] সূরা বাকারা, ২ : ১৯৭

এই শ্রেষ্ঠ সময়গুলোতে বান্দাকে আল্লাহ তাঁর নৈকট্য অর্জন করার জন্য কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন, যা বান্দার জন্য এক গোপন উপহার বিশেষ। সুতরাং সে ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান, যে আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করে। বিশেষ মাস, দিন এবং সময়গুলো কাজে লাগিয়ে নির্ধারিত উপহার লাভ করে। ফলে জাহান্নাম ও সেখানে থাকা কষ্ট থেকে বেঁচে গিয়ে হয় চিরসুখী।

তাবিয়ি মুজাহিদ ﷺ বলেছেন, "প্রতিটি দিন মানুষকে লক্ষ করে বলে, 'হে আদম-সন্তান! আমি আজ তোমার কাছে এসেছি। আজকের পরে আমি আর তোমার কাছে ফিরে আসব না। সুতরাং তুমি আমার মাঝে কী কাজ করছ, তা ভেবে-চিন্তে করো।' দিনটি চলে যাওয়ার পর সেটিকে গুটিয়ে নিয়ে তাতে সিলমোহর মেরে দেওয়া হয়। কেবল কিয়ামাতের দিনই আল্লাহ তাআলার নির্দেশে সেই সিলটি ভাঙা হবে।"

হাসান ﷺ বলতেন, 'দুনিয়ার প্রতিটি দিন মানুষকে ডেকে বলে : লোকসকল! আমি তো একটি নতুন দিন। আমাতে যেসব কাজ করা হয় সে ব্যাপারে আমি সাক্ষী থাকি। আজকে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত আমি আর ফিরে আসব না।'

উমার ইবনু যার ﷺ বলতেন, 'তোমরা নিজেদের জন্য আমল করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের এই রাতের আঁধারেও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। সত্যিকারের প্রতারিত তো সে ব্যক্তি, যে রাত-দিনের কল্যাণের ব্যাপারে প্রতারিত। আর বঞ্চিত তো সে ব্যক্তি, যে এ দুয়ের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। মুমিনদের জন্য রাত এবং দিনকে আল্লাহর ইবাদাতের মাধ্যম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যদের জন্য এ দুটি হলো উদাসীনতার মাধ্যম। তোমরা আল্লাহর যিকরের মাধ্যমে নিজেদের অন্তরকে সতেজ রাখো। কারণ, অন্তর কেবল আল্লাহর যিকরের মাধ্যমেই সতেজ থাকে। কবরে এমন কত রাত্রি জাগরণকারী আছে, যারা নিজেদের রাত্রি জাগরণ নিয়ে পরিতৃপ্ত। আবার এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যারা ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছে। তারা যখন আগামীকাল আল্লাহর কাছে ইবাদাতকারীদের মর্যাদা দেখবে, তখন অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকবে। সুতরাং চলে যাওয়া সময় এবং রাতগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হও।'

কাতাদাহ ﷺ বলেন, 'মুমিন কখনো রাতে ইবাদাতের কথা ভুলে যায় এবং দিনে তার স্মরণ হয়। আবার কখনো দিনে ইবাদাতের কথা ভুলে যায় এবং রাতে তার মনে পড়ে।' তিনি আরও বলেন, এক লোক সালমান ফারসি ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি রাত জেগে ইবাদাত করতে পারি না। তিনি বললেন, (রাতে ইবাদাত

করতে না পারলেও) দিনে ইবাদাত করা থেকে বিরত থেকো না।

পরকথা এই যে, কল্যাণ লাভের আশায় এ কিতাবে আমি সালাত, সিয়াম, যিকর, শোকর, খাবার বিতরণ এবং সালাম প্রসারের মতো বছরের বিভিন্ন সময়কার পালনীয় ইবাদাত সংকলন করেছি। যাতে এ কিতাবটি আমার নিজের এবং আমার বন্ধুদের পরকালীন পাথেয় এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতিস্বরূপ হয়ে যায়। অবশেষে আমার এ বিষয়টি আমি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি। তিনি তো বান্দার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। পাশাপাশি যারা ওয়াজ ও নাসীহাহ করতে আগ্রহী, এ সংকলনটি তাদের জন্যও উপযোগী। কারণ, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বান্দাকে সতর্ক ও সচেতন করা। এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে তিনি বলেন,

وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝

'আপনি মনে করিয়ে দিন; কারণ মনে করিয়ে দিলে মুমিনদের উপকার হয়।'[৮]

তিনি এ-ও জানিয়েছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সাদাকাহ এবং কল্যাণের আদেশদাতাকে তিনি মহা প্রতিদান দেবেন।[৯] আর নবি ﷺ বলেছেন,

«مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ.»

'যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান জানায়, তার জন্য সে পথের অনুসারীদের সাওয়াবের অনুরূপ সাওয়াব রয়েছে।'[১০]

অবশ্যই এটা এক মহা অনুগ্রহ।

মাসের সাথে সম্পৃক্ত এই পালনীয়গুলো আমি পর্ব হিসেবে বিভক্ত করেছি। মাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছি চান্দ্রবর্ষের হিসেবে। মুহাররাম থেকে শুরু করে যুল-হিজ্জাহতে শেষ করেছি। প্রত্যেক মাসের অধীনে তার পালনীয় বিষয়গুলো এনেছি। যে মাসে বিশেষ কোনো পালনীয় নেই, সে মাসে কিছু উল্লেখ করিনি। সবগুলোর শেষে সৌরবর্ষের তিনটি ঋতু তথা বসন্ত, শীত এবং গ্রীষ্মের আলোচনা করেছি। আর কিতাবের পরিশিষ্টে তাওবা এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র পর্ব রেখেছি। কারণ তাওবা গোটা জীবনেরই অংশ। মাসগুলোর পালনীয় শুরু

[৮] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫৫

[৯] সূরা নিসা, ৪ : ১১৪-এর মর্মার্থ।

[১০] মুসলিম, ২৬৭৪

করার আগে যিকরের ফযিলত নিয়ে একটি পর্ব দিয়েছি। যাতে যিকরের মাজলিসের উপকারিতাও সন্নিবেশিত আছে। কিতাবটির নামকরণ আমি করেছি—লাতায়িফুল মা'আরিফ ফীমা লিমাওয়াসিমিল 'আমি মিনাল ওয়াযায়িফ।

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই কাজকে একান্তভাবে তাঁর জন্য বানিয়ে নেন। একে যেন তাঁর চিরস্থায়ী নিয়ামাতপূর্ণ শান্তির আলয়ে নৈকট্যের মাধ্যম বানিয়ে দেন। এর বিনিময়ে তিনি যেন উপকৃত করেন আমাকে এবং তাঁর সব মুমিন বান্দাকে। আমাদের দিয়ে যেন করিয়ে নেন তাঁর পছন্দনীয় কাজগুলো। আমাদের যেন তিনি কল্যাণকর মৃত্যু নসীব করেন। তিনি তো পরম সম্মানিত এবং সর্বাধিক দয়াবান। আমীন।

এখন আমরা কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করছি। পূর্বে বলা পদ্ধতি অনুসারে আমাদের আলোচনা শুরু হবে প্রথম পর্বের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলাই শক্তি এবং সামর্থ্য দিয়ে থাকেন।

আল্লাহর যিকরের গুরুত্ব এবং উপদেশের আলোচনা

আবূ হুরায়রা ﵁ বলেছেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যতক্ষণ আপনার কাছে থাকি ততক্ষণ আমাদের মনটা নরম থাকে। দুনিয়ার প্রতি আমরা অনাসক্ত থাকি এবং আমরা আখিরাতের বাসিন্দা হয়ে যাই। কিন্তু আপনার কাছ থেকে উঠে পরিবারের সাথে মিলিত হলে, সন্তানদের আদর করলে, তখন আমরা নিজেদেরকেই চিনতে পারি না। নবি ﷺ বললেন,

«لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي كُنْتُمْ عَلَى حَالِكُمْ ذَلِكَ لَزَارَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللهُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ كَيْ يُذْنِبُوا فَيَغْفِرَ لَهُمْ.»

'আমার কাছে থাকার সময় তোমাদের যে অবস্থা থাকে এখান থেকে উঠে যাওয়ার পরও যদি সে অবস্থা বহাল থাকত, তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের ঘরে গিয়ে তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করত। তোমরা গুনাহ না করলে আল্লাহ নতুন এক দল সৃষ্টি করতেন। যেন তারা গুনাহ করে, আর তিনি তাদের মাফ করে দেন।'

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সৃষ্টির উৎস কী? তিনি বললেন, 'পানি।' আমি বললাম, জান্নাত কী দিয়ে তৈরি? তিনি বললেন,

«لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ، وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ.»

'জান্নাতের একটি ইট স্বর্ণের, আরেকটি ইট রুপার। তার গাঁথুনি নির্ভেজাল

মিশকের সুগন্ধি। সেখানকার নুড়ি হলো মুক্তা এবং নীলকান্তমণি। আর মাটি হলো জাফরান। সেখানে প্রবেশকারী (সীমাহীন) নিয়ামাত ভোগ করবে। তারা দুঃখ পাবে না, মারাও যাবে না। চিরস্থায়ী হবে। তাদের পরনের কাপড় কখনো পুরোনো হবে না, আর না তাদের যৌবন ক্ষয় হবে।'[১১]

নবি -এর মাজলিস

নবি ﷺ-এর সাধারণ মাজলিস ছিল আল্লাহর যিকর, তাঁর রহমতের প্রতি আশা জাগ্রতকরণ এবং আযাবের প্রতি ভীতিপ্রদর্শন সংক্রান্ত। সেখানে কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত হতো। হিকমাত, সদুপদেশ এবং দ্বীনের উপকারী আলোচনা চলত। যেমনটা কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা নবিজিকে আদেশ করেছেন, তিনি যেন উপদেশ দেন এবং নাসীহাহ করেন। ঘটনা শোনান। হিকমাত এবং সদুপদেশের মাধ্যমে আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করেন। সুসংবাদ দেন এবং সতর্ক করেন।

নবি ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী এবং আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন। সুসংবাদ দেওয়া এবং সতর্ক করাই হলো আশা জাগ্রতকরণ এবং ভীতিপ্রদর্শন। ফলে সেসব মাজলিসে অংশগ্রহণকারীদের মন নরম হতো। তাঁরা দুনিয়ার প্রতি হতেন বিরাগভাজন, আর আখিরাতের প্রতি হতেন আগ্রহী।

মন নরম হওয়ার কারণ

মন নরম হতো আল্লাহর স্মরণের কারণে। আল্লাহর স্মরণে মন ভীত হয়, মন্দ অবস্থা হয় সংশোধিত। সৃষ্টি হয় নম্রতা ও কোমলতা এবং দূর হয়ে যায় রুক্ষতা ও উদাসীনতা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ ٢٨

'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়ে থাকে।'[১২]

---

[১১] তিরমিযি, ২৫২৬; আহমাদ, ৮০৪৩; আবূ দাউদ, ২৭০৬; মান : সহীহ। "আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সৃষ্টির উৎস কি? তিনি বললেন, 'পানি।'" এ অংশটুকু কেবল ইমাম তিরমিযি ﷺ এর বর্ণনাতে এসেছে।

[১২] সূরা রা'দ, ১৩ : ২৮

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝٢

'মুমিন তো তারাই, আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় কম্পিত হয়। এবং আল্লাহর আয়াত তাদের কাছে পাঠ করা হলে, তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদের প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর করে।'[১৩]

ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝٣٥

'সুসংবাদ দিন বিনয়ীদের, আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় ভয়ে কেঁপে ওঠে। যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে, সালাত কায়েম করে। আর আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি, তা থেকে খরচ করে।'[১৪]

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ۝١٦

'যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি—আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে? তারা যেন সেসব লোকের মতো না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল এরপর বহুকাল অতিক্রম হওয়ায় যাদের অন্তর হয়ে গিয়েছিল কঠিন।'[১৫]

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ

'আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী, সাদৃশ্যপূর্ণ একটি কিতাব (আল-কুরআন), যা বারবার আবৃত্তি করা হয়। যারা তাদের রবকে ভয় করে,

---

[১৩] সূরা আনফাল, ৮ : ২

[১৪] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩৫

[১৫] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১৬

তাদের শরীর এতে শিহরিত হয়। তারপর তাদের দেহ ও মন আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়ে যায়।'[১৬]

ইরবায ইবনু সারিয়া ﷺ বলেছেন, একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের অনেক কঠোর নাসীহাহ করলেন। ফলে আমাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল এবং অন্তর ভীত হয়ে পড়ল।[১৭]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ বলেছেন, যে মাজলিসে হিকমাতের প্রচার হয় এবং আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করা হয়, সে মাজলিস কতই-না উত্তম। (অর্থাৎ যিকরের মাজলিস)

এক লোক হাসান বসরি ﷺ-এর কাছে অন্তর কঠোর হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করল। তখন তিনি বললেন, অন্তরকে যিকরের কাছাকাছি নিয়ে যাও। তিনি আরও বলেছেন, যিকরের মাজলিসগুলো ইলমকে সতেজ করে এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করে।

বৃষ্টিতে ভূমি যেমন উর্বর হয়, যিকরের মাধ্যমে তেমনি সতর্ক হয় উদাসীন অন্তর।

যিকরের মাজলিসের উপকারিতা

যিকরের মাজলিসের[১৮] কারণে দুনিয়াবিমুখতা সৃষ্টি হয়। কেননা, সেখানে দুনিয়ার সমালোচনা, নিন্দা এবং তার প্রতি অনাসক্তির জন্য উদ্‌বুদ্ধ করা হয়। জান্নাতের শ্রেষ্ঠত্ব, এর প্রতি আশাজাগানিয়া আলোচনা যেমন হয়, তেমনি জাহান্নাম, এর ভয়াবহতা এবং তার প্রতি ভীতিপ্রদর্শনও করা হয়।

যিকরের মাজলিসগুলোতে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। সাকীনা (প্রশান্তি) সেগুলোকে ছেয়ে ফেলে। ফেরেশতারা সেসব বেষ্টন করে রাখেন। আর ফেরেশতাদের কাছে আল্লাহ সেসব লোকদের কথা আলোচনা করে থাকেন। তাদের সাথে থাকা লোকেরাও বঞ্চিত হয় না। সেখানে অংশগ্রহণকারী পাপীর ওপরও আল্লাহর রহমত নাযিল হয়ে থাকে। কখনো দেখা যায়, তাদের মাঝে থাকা এক ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করেছে। তখন সে ব্যক্তির কারণে মাজলিসের অন্য সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

---

[১৬] সূরা যুমার, ৩৯ : ২৩

[১৭] আহমাদ, ১৭১৪৫; সহীহ

[১৮] যিকরের মাজলিস বলে ওয়াজ, নাসীহাহ এবং আল্লাহর কথা স্মরণ করানোর মাজলিস, আলিমদের মাজলিস এবং তিলাওয়াতের মাজলিস উদ্দেশ্য।

মাজলিস সমাপ্তির পর

মাজলিস শেষ হলে সেখানে থাকা লোকেরা কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক শ্রেণির লোক তো তাদের প্রবৃত্তি নিয়েই ফিরে যায়। মাজলিসে শোনা কথার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। তাদের হিদায়াতও হয় না, আবার মন্দ কাজ থেকেও তারা পিছিয়ে আসে না। এই প্রকারের লোকেরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। মাজলিসে আলোচিত কথাগুলোই তাদের বিপক্ষে উপস্থাপন করে তাদের আযাব বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এরা নিজেদের প্রতি অবিচারকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ ﴿١٠٨﴾

'এরাই তারা, যাদের অন্তর, কান এবং চোখের ওপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই গাফিল।'[১৯]

আবার কিছু লোক মাজলিসের কথার দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে। এরা কয়েক ভাগে বিভক্ত। এক দল আলোচনা শুনে নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকে এবং করণীয় জিনিস পালন করে। এই সত্যপন্থিরা ডানদিকে শামিল হবে। আরেক দল এর থেকে আগে বেড়ে নফল আমলে মনোনিবেশ করে। ছোটোখাটো মাকরূহ বিষয়ও এড়িয়ে চলে। পূর্বসুরিদের অনুসরণ করে চলতে আগ্রহী হয়। এরা হবে নৈকট্যপ্রাপ্ত অগ্রবর্তী।

মাজলিসের আলোচনা স্মরণ রাখা

আলোচনা স্মরণ রাখা এবং ভুলে যাওয়া—এই হিসেবে মানুষ তিন ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের মানুষ দুনিয়ার বৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে আলোচনা ভুলে যায়। এমনটা সাহাবিদেরও হতো। এজন্য তাঁরা ভীত হয়ে পড়তেন। এটা আবার নিফাক নয়তো! অবশেষে নবি ﷺ-কে বিষয়টি অবগত করলে তিনি আশ্বস্ত করে দেন যে, এটা নিফাক নয়।

হানযালা উসাইদি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। রাসূল ﷺ বললেন, 'সে কী কথা!' আমি বললাম, আমরা আপনার কাছে থাকলে, আপনি জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সে সময় আমরা যেন সরাসরি তা দেখতে পাই। কিন্তু এরপর যখন স্ত্রী, সন্তানসন্ততি এবং ধনসম্পদের মাঝে যাই, তখন অনেক কিছু ভুলে যাই।

[১৯] সূরা নাহল, ১৬ : ১০৮

রাসূল ﷺ এই কথা শুনে বললেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً».

'যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি! আমার কাছে থাকাকালে তোমাদের যে অবস্থা হয়, যদি সর্বদা এ অবস্থায় অবিচল থাকতে এবং আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকতে, তবে তো ফেরেশতারা তোমাদের বিছানায় এবং রাস্তাঘাটে তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত। কিন্তু হানযালা! ধীরেসুস্থে এটি হবে।' কথাটি রাসূল ﷺ তিনবার বললেন।[২০]

এ থেকে বোঝা যায়, সর্বদা আখিরাতের কথা স্মরণ রাখাটা কষ্টকর। অধিকাংশ মানুষই তা পারে না। কিছু সময় স্মরণ রাখলেও দুনিয়ার বৈধ কাজে ব্যস্ত হয়ে তা ভুলে যায়। কিন্তু মুমিনের কাছে এটাও কষ্টকর ঠেকে। এজন্য সে নিজেকে তিরস্কার করতে থাকে।

আরেক ধরনের মানুষ যিকরের মাজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পরও সেখানকার আলোচনা স্মরণ রাখে। এ ধরনের লোকেরা দুই প্রকার। প্রথম ধরনের লোকেরা দুনিয়াবি বৈধ কারবারে ব্যস্ত হতে পারেন না। ফলে মানুষ থেকে তারা হয়ে পড়েন বিচ্ছিন্ন। না পারেন তাদের সাথে মিশতে, আর না পারেন তাদের হক আদায় করতে। এজন্য সালাফের অনেকেই হাসতেন না।

আরেক প্রকারের লোকেরা আল্লাহর যিকর, তাঁর বড়ত্ব, তাঁর সাওয়াব এবং শাস্তির কথা স্মরণে রাখেন। তা সত্ত্বেও সশরীরে হালাল উপার্জন, পরিবার পরিচালনা ও মানুষের সাথে মেলামেশার মতো দুনিয়াবি কাজে অংশ নেন। ইলম শিক্ষাদান, জিহাদ করা, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের মতো ইবাদাতও তারা মিলেমিশে পালন করে থাকেন। আলোচ্য দুই প্রকারের মাঝে এরাই সর্বোত্তম।

সহীহ মুসলিমে জাবির رضي الله عنه-এর বর্ণনায় এসেছে, খুতবা দেওয়ার সময় নবি ﷺ-এর চোখ দুটো লাল হয়ে যেত, স্বর উঁচু হতো এবং কঠোর রাগ প্রকাশ পেত।[২১]

আবার আয়িশা رضي الله عنها-এর কাছে নবি ﷺ-এর একান্ত জীবন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছেন, 'তিনি ছিলেন সর্বাধিক নম্র। হাসিমুখে থাকতেন এবং মজাও

[২০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭৫০

[২১] মুসলিম, ৮৬৭

করতেন।'[২২]

উপদেশের হাকীকত

উপদেশ হলো চাবুকের মতো, যার মাধ্যমে অন্তরকে আঘাত করা হয়ে থাকে। চাবুক দ্বারা শরীরে আঘাত করলে তাৎক্ষণিকভাবে খুব ব্যথা অনুভূত হয়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তা হালকা হয়ে আসে। আঘাতের তীব্রতা অনুযায়ী যন্ত্রণা বোধ হতে থাকে। আঘাত যত জোরালো হয়, যন্ত্রণাও তত বেশি অনুভূত হয়।

অনেক সালাফের অবস্থা এমন ছিল যে, যিকরের মাজলিস থেকে ওঠার পর তাদের মাঝে স্থিরতা এবং গাম্ভীর্য ফুটে উঠত। কেউ কেউ তো সেখান থেকে ওঠার পর খাবার খেতে পারতেন না। আবার কেউ কেউ একটা সময় পর্যন্ত শোনা বিষয়ের ওপর আমল জারি রাখতেন। আসলে শ্রেষ্ঠতম সাদাকাহ হলো অজ্ঞ লোককে শিক্ষা দেওয়া, অথবা উদাসীনকে সতর্ক করা।

একবার আবদুল ওয়াহিদ ইবনু যায়িদ ﵀ লোকদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক লোক চিৎকার করে বলে উঠল, 'থামুন! আপনি তো আমার হালচাল প্রকাশ করে দিয়েছেন।' আবদুল ওয়াহিদ ﵀ কথা থামিয়ে দিলে, লোকটি সেখানেই মৃত্যুবরণ করল।

উপদেশ কখন ফলপ্রসূ হয়

সালাফরা বলতেন, 'উপদেশ ফলপ্রসূ হয় যদি সেটা অন্তর থেকে আসে। তখন সেটা শ্রোতার অন্তরে পৌঁছে যায়। পক্ষান্তরে বক্তার মুখ থেকে বের হওয়া কথা শ্রোতার এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।'

জনৈক সালাফ বলেছেন, 'আলিমের উপদেশ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে না হয়, তাহলে শ্রোতার অন্তর থেকে তা এমনভাবে সরে যায়—মৃসণ পাথরের ওপর থেকে যেভাবে পানি গড়িয়ে পড়ে।'

আসলে যে আলিম তার ইলম অনুযায়ী আমল করে না সে হলো এমন প্রদীপ, যে মানুষকে আলো দেয় ঠিকই কিন্তু নিজেকে পুড়িয়ে শেষ করে (ঠিক যেন মোমের মতো)।

[২২] ইসহাক ইবনু রাহুয়া, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ১০০১

উপদেশ হচ্ছে গুনাহের প্রতিষেধক। অভিজ্ঞ আর সুস্থ চিকিৎসকই কেবল প্রতিষেধক সেবন করাতে পারেন। পক্ষান্তরে গাফিল ব্যক্তি অন্যকে দেওয়ার পরিবর্তে নিজেই সেবন করার অধিক হক রাখে।

পূর্ববর্তী কোনো এক গ্রন্থে আছে, 'তুমি মানুষকে নাসীহাহ করার আগে নিজেকে উপদেশ দাও। যদি সে উপদেশ গ্রহণ করে থাকে, তবে তো ভালো। না হয় আমাকে নাসীহাহ করা থেকে বিরত থাকো।'

তবুও মানুষকে সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ এবং নাসীহাহ করতে হবে। যদি এমন হয় যে নিষ্পাপ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ উপদেশ দিতে পারবে না, তবে তো নবিজির পরে এ কাজের যোগ্য কেউ থাকবে না। কারণ তাঁর পরে কেউ নিষ্পাপ নয়।

হাসান বসরি ﵀-কে বলা হলো, অমুক ব্যক্তি কাউকে উপদেশ দেয় না। সে বলে, নিজে যা করি না, এমন কথা অন্যকে বলতে সংকোচ বোধ করি। তখন হাসান ﵀ বললেন, 'মানুষ যা বলে, তার সবই কি করতে পারে?—এই চিন্তার মাধ্যমে শয়তান জয়ী হয়ে গেছে। কারণ লোকটি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করা থেকে বিরত ছিল।'

সাঈদ ইবনু জুবাইর ﵀ বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি যদি ভাবে সে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হয়ে তবেই সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে, তাহলে সে কখনোই তা করতে পারবে না।' মালিক ﵀ বলেছেন, 'সাঈদ ঠিক কথা বলেছেন। কোনো ব্যক্তি কি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হতে পেরেছে?'

হে আল্লাহ! আপনি মহামহিম এবং শ্রেষ্ঠতম দয়াবান! আপনার কাছে প্রত্যাশা করে আপনার জন্যেই আপনার বান্দাদেরকে আপনার দরবারে ডেকে এনেছে, এমন বান্দাকে আপনি খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন না। আপনার সাথে বান্দাদের জুড়ে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করায়, আমি আপনার অনুগ্রহ প্রত্যাশা করি। যদিও নিজেকে যোগ্য বলে দাবি করতে পারি না। কিন্তু আপনার ব্যাপক উদারতা এবং বদান্যতার কাছে আমরা আশাবাদী। কারণ আপনি উদারতা এবং বদান্যতার অধিকারী। উদার ব্যক্তিও তো তার দস্তরখানে বসা অনাহূত ব্যক্তিকে উঠিয়ে দিতে সঙ্কোচ বোধ করে।

বান্দা গুনাহ না করলে, নতুন এক দল সৃষ্টি

বান্দা গুনাহ না করলে আল্লাহ নতুন এক দল সৃষ্টি করতেন—যারা গুনাহ করত, আর তিনি তাদের তিনি ক্ষমা করে দিতেন। বান্দার অন্তরে আল্লাহ যে উদাসীনতা দিয়ে রেখেছেন, তার রহস্য উদ্ঘাটনই এর মূল উদ্দেশ্য। এ উদাসীনতার কারণেই বান্দা গুনাহ করে ফেলে। তা না হলে উপদেশ শোনার সময়কালীন অবস্থা সবসময় বিরাজমান থাকত।

মাঝেমধ্যে উদাসীন হয়ে গুনাহ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার দুটি উপকারিতা রয়েছে। প্রথমত, বান্দা নিজের গুনাহের স্বীকারোক্তি দেয়। নিজের অক্ষমতার কারণে মনিবের সামনে লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়ে আসে। এ অবস্থা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি ইবাদাত করার থেকেও পছন্দনীয়। কারণ অধিক ইবাদাতে আত্মমুগ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত, গুনাহের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভ করে। তাওবা কবুল এবং মাফ করতে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। এ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যবাচক নামও তাঁর রয়েছে। বান্দাকে যদি গুনাহ থেকে সর্বদা বিরতই রাখেন, তবে তাঁর এ বিশেষত্ব কার সামনে প্রকাশ করবেন?

জান্নাতের ভিত্তি, গাঁথুনি, নুড়ি এবং মাটির বর্ণনা

আবূ হুরায়রা ﵁-এর প্রশ্নের উত্তরে নবি ﷺ বলেছেন,

«لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ، وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ.»

‘জান্নাতের একটি ইট স্বর্ণের, আরেকটি ইট রুপার। তার গাঁথুনি হচ্ছে নির্ভেজাল মিশকের সুগন্ধি। সেখানকার নুড়ি হলো মুক্তা এবং নীলকান্তমণি। আর মাটি হলো জাফরান।’

এখানে চারটি বিষয় লক্ষণীয় :

⇨ প্রথমত, জান্নাতের ভিত্তির বর্ণনা। এটা জান্নাতের প্রাসাদের ভিত্তিও হতে পারে, আবার দেয়াল বা সীমানা-প্রাচীরও হতে পারে। দ্বিতীয়টি হওয়াই অধিক সঙ্গত। বিভিন্ন হাদীসে এর পক্ষে দলিল পাওয়া যায়। যেমন :

(ক) আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا، وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا، وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ.»

'দুটি জান্নাত এমন হবে, যেখানকার পানপাত্রসহ ভেতরে থাকা সবকিছুই হবে রুপার। আর দুটি জান্নাত এমন হবে, যেখানকার পানপাত্রসহ অভ্যন্তরীণ সবকিছুই সোনার। জান্নাতু আদন-এ তাদের ও তাদের প্রতিপালকের দর্শনের মাঝে তাঁর চেহারার গর্বের চাদর ছাড়া কোনো কিছুর অন্তরাল থাকবে না।'[২৩]

(খ) আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«قَالَ اللهُ : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.»

'আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমার নেক বান্দাদের জন্য আমি এমন সব সামগ্রী তৈরি করে রেখেছি, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো অন্তরের কল্পনাতেও আসেনি।'[২৪]

⇨ দ্বিতীয়ত, জান্নাতের গাঁথুনির বর্ণনা। যা হবে খাঁটি এবং নির্ভেজাল মিশকের সুগন্ধি। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤَ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ.»

'তারপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলে সেখানে আমি মুক্তার গম্বুজ দেখতে পেলাম। তার মাটি ছিল মিশকের সুগন্ধি।'[২৫]

এখানে মাটি বলতে পানি-মিশ্রিত গাঁথুনি উদ্দেশ্য। যেমন আল-কাউসার সম্পর্কে একটি হাদীস আছে, যা আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। নবি ﷺ বলেছেন,

«طِينُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ.»

'তার মাটি ছিল উৎকৃষ্ট মানের মিশকের সুগন্ধি।'[২৬]

---

[২৩] বুখারি, ৪৮৭৮; মুসলিম, ১৮০।

[২৪] মুসলিম, ২৮২৪; বুখারি, ৪৭৭৯।

[২৫] বুখারি, ৩৩৪২; মুসলিম, ১৬৩।

[২৬] বুখারি, ৬৫৮১।

⇨ তৃতীয়ত, জান্নাতের নুড়ির বর্ণনা। যা হবে মুক্তা এবং নীলকান্তমণি। নুড়ি বলতে ছড়িয়ে থাকা পাথরকণা বোঝানো হয়েছে। আল-কাউসারের একটি বর্ণনা মুসনাদু আহমাদে এসেছে। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«وَإِذَا رَضْرَاضُهُ اللُّؤْلُؤُ.»

'আমি দেখলাম, তাতে থাকা পাথরকণাগুলো হচ্ছে মুক্তার।'[২৭]

⇨ চতুর্থত, জান্নাতের মাটি হবে জাফরান। এখানে মাটি বলতে পানিবিহীন সমতল জমিন উদ্দেশ্য। আর পানি মেশানো মাটি অর্থাৎ গাঁথুনি সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে। সেটা হবে মিশকের সুগন্ধি। জান্নাতের মাটির যেসব বর্ণনা পাওয়া যায় তার সমষ্টি থেকে এটা বুঝে আসে যে, জান্নাতের মাটির রং হবে সাদা। উজ্জ্বলতা এবং সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে তা হবে জাফরানের মতো। যার ঘ্রাণ হবে খাঁটি মিশকের সুগন্ধির ন্যায়। স্বাদের ক্ষেত্রে তা হবে একদম টাটকা রুটি সদৃশ। মহান আল্লাহ এই নিয়ামাত থেকে যেন আমাদের বঞ্চিত না করেন।

জান্নাতি নিয়ামাতের বর্ণনা

'জান্নাতে প্রবেশকারী নিয়ামাত ভোগ করবে। সে কোনো কষ্ট পাবে না। চিরস্থায়ী হবে, মৃত্যুবরণ করবে না। পরনের কাপড় কখনো পুরানো হবে না, যৌবন কখনো ক্ষয় হবে না।' এ কথা বলে নবি ﷺ এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, জান্নাত এবং সেখানকার সব নিয়ামাত চিরস্থায়ী। সেখানকার অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্য এমন যে, যুবকদের কোনো রকম পরিবর্তন হবে না। তাদের পরনের পোশাক কখনো পুরাতন ও জীর্ণ হবে না। এমন নিয়ামাতের কথা কুরআনের কয়েক স্থানে বলা হয়েছে। যেমন :

وَجَنَّٰتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾

'এবং জান্নাত, যেখানে তাদের জন্য স্থায়ী নিয়ামাত আছে।'[২৮]

أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا

'তার (জান্নাতের) ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং তার ছায়াও।'[২৯]

---

[২৭] আহমাদ, ১৩৪২৫। হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ।

[২৮] সূরা তাওবা, ৯ : ২১

[২৯] সূরা রা'দ, ১৩ : ৩৫

خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًاۖ

'তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।'[৩০]

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ.»

'যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে আরাম-আয়েশে চিন্তামুক্ত থাকবে। না তার কাপড় কখনো পুরাতন হবে এবং না তার যৌবন কখনো নিঃশেষ হবে।'[৩১]

নবি ﷺ আরও বলেছেন,

«يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}.»

'এক আহ্বানকারী জান্নাতি লোকদের ডেকে বলবে, এখানে তোমরা সুস্থ থাকবে, কখনোই অসুস্থ হবে না। তোমরা যুবক থাকবে, কোনোদিনও বৃদ্ধ হবে না। তোমরা সুখে থাকবে, কখনোই দুর্দশাগ্রস্ত হবে না। এটাই হলো আল্লাহ তাআলার বাণী : এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।'[৩২]

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী

জান্নাতে প্রবেশকারীদের কথা বলে নবি ﷺ প্রকারান্তরে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার নিন্দা করেছেন। কারণ দুনিয়ার অধিবাসীরা যত সুখেই থাকুক না কেন, চিন্তামুক্ত থাকে না। এখানকার বাসিন্দাদের মরতেই হবে। চিরস্থায়ী হওয়ার কোনো সুযোগ তাদের নেই। তাদের যৌবন ফুরিয়ে যায়। কাপড় তো বটেই, দেহও জীর্ণ হয়ে পড়ে।

[৩০] এই আয়াতাংশটি জান্নাতিদের সম্পর্কে কুরআন কারীমে ৮ বার এসেছে। যথা- সূরা নিসা, ৪ : ৫৭ ও ১২২; সূরা মায়িদা, ৫ : ১১৯; সূরা তাওবা, ৯ : ২২ ও ১০০; সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ৯; সূরা ত্বলাক, ৬৫: ১১ এবং সূরা বাইয়্যিনাহ, ৯৮ : ৮

[৩১] মুসলিম, ২৮৩৬।

[৩২] মুসলিম, ২৮৩৭; আয়াতটি সূরা আ'রাফ, ৭ : ৪৩

কুরআন কারীমেও আখিরাতের প্রশংসা এবং তার পূর্ণতা ও স্থায়ীত্বের বর্ণনা দিয়ে প্রকারান্তরে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾ ۞ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿١٥﴾

'নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের কাছে সুশোভিত করে তোলা হয়েছে। এসব হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর কাছেই আছে উত্তম আশ্রয়। আপনি বলুন, আমি কি তোমাদের এসবের চেয়েও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলবো? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে রয়েছে এমন সব জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদী। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। তাদের জন্য সেখানে পবিত্র সঙ্গীগণ রয়েছে এবং রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ বান্দাদের সবকিছু দেখেন।[৩৩]

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾

'বস্তুত পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত এরকম, যেমন আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়, যা মানুষ ও জীবজন্তু খেয়ে থাকে। তারপর জমিন যখন শোভা ধারণ করে এবং তার অধিকারীরা মনে করে এসব তাদের আয়ত্তাধীন,

[৩৩] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৪-১৫

তখন দিনে অথবা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে। আর আমি তা এমনভাবে নির্মূল করে দিই, যেন গতকালও তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এভাবে আমার নিদর্শনগুলো আমি বিশদভাবে বর্ণনা করি চিন্তাশীল লোকদের জন্য। আর আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথ প্রদর্শন করেন। যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারও চেয়ে বেশি। আর তাদের মুখমণ্ডলকে মলিনতা ও অপমান আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা অনন্তকাল বসবাস করতে থাকবে।’[৩৪]

وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا كَمَآءٍ أَنزَلۡنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلۡأَرۡضِ فَأَصۡبَحَ هَشِيمٗا تَذۡرُوهُ ٱلرِّيَٰحُۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ مُّقۡتَدِرًا ﴿٤٥﴾ ٱلۡمَالُ وَٱلۡبَنُونَ زِينَةُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱلۡبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيۡرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابٗا وَخَيۡرٌ أَمَلٗا ﴿٤٦﴾

‘তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির মতো, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি। তা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়, তারপর তা শুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সব বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন। ধন-সম্পদ এবং সন্তানসন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা; এবং স্থায়ী সৎকর্ম আপনার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবেও উত্তম।’[৩৫]

وَمَا هَٰذِهِ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا لَهۡوٞ وَلَعِبٞۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ لَهِيَ ٱلۡحَيَوَانُۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ﴿٦٤﴾

‘এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।’[৩৬]

ٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا لَعِبٞ وَلَهۡوٞ وَزِينَةٞ وَتَفَاخُرُۢ بَيۡنَكُمۡ وَتَكَاثُرٞ فِي ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِۖ كَمَثَلِ غَيۡثٍ أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصۡفَرّٗا ثُمَّ يَكُونُ

---

[৩৪] সূরা ইউনুস, ১০ : ২৪-২৬

[৩৫] সূরা কাহফ, ১৮ : ৪৫-৪৬

[৩৬] সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৬৪

حُطَٰمًاۖ وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ ۝٢٠ سَابِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۚ

'জেনে রেখো, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহমিকা, ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া কিছুই না। তার উপমা বৃষ্টি, যা দ্বারা উৎপন্ন সবুজ ফসল কৃষকদের চমকিত করে। এরপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তা খড়কুটোয় পরিণত হয়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা আর সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়। তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং সেই জান্নাত লাভের তরে, যার প্রশস্ততা আসমান এবং জমিনের মতো। তা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনকারীদের জন্য।'[৩৭]

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۝١٦ وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ۝١٧

'কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকো! অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী।'[৩৮]

أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْءَاخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝٣٨

'তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গিয়েছ? আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অতি অল্প।'[৩৯]

ফিরআউন-পরিবারের একজন মুমিন ব্যক্তি স্বজাতিকে উপদেশ দিয়েছিল। তার ভাষ্য আল্লাহ তাআলা তুলে ধরেছেন,

يَٰقَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَٰعٌ وَإِنَّ ٱلْءَاخِرَةَ هِىَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ۝٣٩

[৩৭] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২০-২১

[৩৮] সূরা আ'লা, ৮৭ : ১৬-১৭

[৩৯] সূরা তাওবা, ৯ : ৩৮

'হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো ক্ষণস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাত হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।'[৪০]

ক্ষণস্থায়িত্ব এবং অবস্থার পরিবর্তন নিয়ে দুনিয়াকে যত বেশি দোষারোপ করা হবে, দুনিয়ার সমাপ্তি এবং পতনের সেটাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কারণ দুনিয়ার সুস্থতা অসুস্থতায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। অস্তিত্ব পাল্টায় অনস্তিত্বে। যৌবন বদলে যায় বার্ধক্যে। সুখ পরিবর্তিত হয় অসুখে। জীবন বদলায় মৃত্যুতে। আবাদ পাল্টায় অনাবাদে। আর প্রিয়জনের মিলন পরিণত হয় বিচ্ছেদে। পরিশেষে মাটির ওপরে থাকা সবকিছুই মাটি হয়ে যায়।

হাসান ﷺ বলেছেন, 'মৃত্যু দুনিয়াকে লাঞ্ছিত করেছে। ফলে জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য দুনিয়াতে আনন্দদায়ক বলতে কিছু নেই।'

মুতাররিফ ﷺ বলেছেন, 'এই মৃত্যু তো সুখীদের সুখ খতম করে দিয়েছে। সুতরাং এমন কোনো সুখ খুঁজে দেখো, যেখানে মৃত্যু নেই।'

জনৈক সালাফ একবার বললেন, 'মৃত্যুর স্মরণ—জীবন এবং আনন্দের সমস্ত স্বাদ কেড়ে নিয়েছে।' তারপর তিনি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'ইশ! এমন জগৎ কতই-না চমৎকার হবে, যেখানে থাকবে না কোনো মৃত্যু!'

ইউনুস ইবনু উবাইদ ﷺ বলেছেন, 'মৃত্যুর স্মরণের কারণে, না পরিবার-পরিজনের মধ্যে শান্তি আছে, আর না ধন-সম্পদে আছে।'

ইয়াযীদ রাক্কাশি ﷺ বলেছেন, 'মৃত্যু থাকবে না বলেই জান্নাতিরা সুখে থাকবে। আর রোগ-বালাই থাকবে না বলে, তারা আল্লাহর প্রতিবেশী হয়ে দীর্ঘদিন অবস্থান করবে।'

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা! এমন এক জগতের দিকে চলুন, যেখানকার অধিবাসীরা না মারা যাবে, আর না তাদের বাড়িঘর কখনো বিরান হবে। সেখানে যুবকদের কখনো বার্ধক্য স্পর্শ করবে না। সব সৌন্দর্য এবং নিয়ামাত হবে চিরস্থায়ী। সেখানে বয়ে যাওয়া হিমেল হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। পানি হবে অমৃতের মতো। সেখানে থাকা লোকেরা পরম দয়াময়ের অনুগ্রহে ঘুরে বেড়াবে এবং সর্বক্ষণ উপভোগ করবে তাঁর দিদার।

---

[৪০] সূরা গাফির, ৪০ : ৩৯

دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَٰمٌۚ وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝١٠

'সেখানে তাদের প্রার্থনা হবে 'ইয়া আল্লাহ! আপনি মহান, পবিত্র।' আর অভিভাবদন হবে সালাম আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হবে (এই বলে,) সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।'[৪১]

[৪১] সূরা ইউনুস, ১০ : ১০

আল্লাহর মাস মুহাররমের পালনীয়

প্রথম পর্ব : মুহাররম মাস এবং তার প্রথম দশকের ফযিলত

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.»

'রমাদানের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সিয়াম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের সিয়াম এবং ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে তাহাজ্জুদের সালাত।'[৪২]

এ হাদীসের আলোচ্য বিষয় দুটি :

১. সর্বোত্তম নফল সিয়াম এবং

২. সর্বোত্তম নফল সালাত।

প্রথম পরিচ্ছেদ : নফল সিয়ামের গুরুত্ব

এ হাদীসে এটা সুস্পষ্ট যে নফল সিয়ামের মধ্যে সর্বোত্তম হলো মুহাররমের সিয়াম। এটাও হতে পারে যে, রমাদান ছাড়া একাধারে নফল সিয়াম রাখার জন্য সর্বোত্তম মাস হলো মুহাররম। কারণ, অন্যান্য কিছু মাসের সিয়াম মুহাররমের কিছু কিছু দিনের নফল সিয়াম থেকে উত্তম। যেমন আরাফার দিন, যুলহিজ্জার দশ দিন ও শাওয়াল মাসের ছয় দিন ইত্যাদি।

---

[৪২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৬৩

নফল সিয়ামের উত্তম মাস

সাধারণভাবে নফল সিয়ামের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সম্মানিত মাসগুলোর সিয়াম। এক সাহাবিকে নবি ﷺ সম্মানিত মাসগুলোতে সিয়াম পালন করার আদেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ চাহেন তো, সে আলোচনা আমরা অন্য স্থানে করব। অবশ্য সম্মানিত মাসগুলোর মধ্যে কোন মাসের সিয়াম সর্বোত্তম, তা নিয়ে উলামাগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

হাসান ﵀ সহ একাধিক উলামায়ে কেরামের মতে মুহাররম মাসে সিয়াম পালন করা সর্বোত্তম। পরবর্তী উলামায়ে কেরাম এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

ওয়াহাব ইবনু জারীর ﵀ কুররা ইবনু খালিদ ﵀-এর সূত্রে হাসান ﵀ বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন, ‘আল্লাহ বছরের প্রথম মাসটি যেমন সম্মানিত করেছেন, তেমনিস ম্মানিত করেছেন শেষের মাসটিকেও। তবে বছরের মাঝে রমাদানের পর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো মুহাররম। সম্মান বেশি হওয়ার কারণে তাকে আল্লাহর নীরব মাস নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।’

মুহাররমকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ

মুহাররম মাসকে নবি ﷺ ‘আল্লাহর মাস’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ হলো, সম্মান এবং গুরুত্ব বোঝানো। কারণ আল্লাহর বিশেষ বিশেষ সৃষ্টিকেই কেবল তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। যেমন মুহাম্মাদ, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব (আলাইহিমুস সালাম)-সহ অন্যান্য নবিদেরকে ‘আল্লাহর বান্দা’ বলে উল্লেখ করা। কাবাকে বলা হয় ‘আল্লাহর ঘর’ এবং (সালিহ ﵇-এর সময়কার) উটনিকে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা।

সিয়ামের গুরুত্ব

আল্লাহ এবং বান্দার একান্ত বিষয় সিয়াম। এজন্যই হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

«كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي.»

‘আদম-সন্তানের সব আমল তার নিজের জন্য, কেবল সিয়াম ছাড়া। সেটা আমারই জন্য এবং আমিই সেটার প্রতিদান দেব। সিয়াম আমারই জন্য,

আর আমিই এর প্রতিদান দেব। কারণ, সে আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তার প্রবৃত্তি(র চাহিদা) এবং পানাহার ত্যাগ করেছে।'[৪৩]

নবি ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ، أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.»

'জান্নাতে রাইয়ান নামে একটি দরজা থাকবে, যা দিয়ে কিয়ামাতের দিন রোজাদাররা প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া অন্য কেউ তাদের সাথে (সে দরজা দিয়ে) প্রবেশ করতে পারবে না। বলা হবে, রোজাদাররা কোথায়? তখন তারা সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। তাদের শেষ ব্যক্তি প্রবেশ করার পর দরজাটি বন্ধ হয়ে যাবে। ওটা দিয়ে অন্য কারও প্রবেশ করার সুযোগ থাকবে না।'[৪৪]

আবূ উমামা ﵁ একবার নবি ﷺ-এর কাছে উপদেশ চাইলেন। তখন তিনি বললেন,

«عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ»

'তুমি সিয়াম পালনে অভ্যস্ত হও। কারণ এর কোনো বিকল্প নেই।'[৪৫]

এরপর থেকে আবূ উমামা ﵁-সহ তাঁর পরিবারের সবাই সিয়াম পালন করতেন। দিনের বেলা তাঁর ঘর থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখলে বোঝা যেত, তাঁদের কাছে মেহমান এসেছে।

একইভাবে উমার, আবূ তালহা, আয়িশা ﵁-সহ সাহাবি ও সালাফদের অনেকেই নিয়মিত সিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। কেউ কেউ বলতেন, 'সিয়াম পালন মানে দুপুরে খাওয়া এবং রাতে খাওয়া। দুপুরের খাওয়ার সময়টা একটু পিছিয়ে দিয়ে সন্ধ্যায় খেলেই সিয়াম হয়ে যায়।'

---

[৪৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৫১

[৪৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৫২

[৪৫] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ২২১৪৯; সুনানু নাসায়ি, হাদীস নং : ৩৪২৬, হাফিয ইবনু হাজার ﵀ ফাতহুল বারি : ৪/১০৪ এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

সিয়াম পালনকারীর পুরস্কার

«لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ»

'সিয়াম পালনকারীর জন্য দুটি আনন্দের সময় আছে। একটি আনন্দ হয় ইফতারের সময়, আরেকটি আনন্দ হবে তাঁর রবের সাথে সাক্ষাতের সময়।'[৪৬]

তখন সে পালনকৃত সিয়ামের সাওয়াব সংরক্ষিত দেখতে পাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

'রোজাদার পুরুষ, রোজাদার নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী মহিলা, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী তাদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।'[৪৭]

كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

'(তাদের বলা হবে,) বিগত দিনে তোমরা যা করেছিলে তার প্রতিদানে তৃপ্তি ভরে পানাহার করো।'[৪৮]

মুজাহিদ رحمه الله সহ অন্যরা বলেছেন, এ আয়াত সিয়াম পালনকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য পানাহার এবং প্রবৃত্তির চাহিদা দমন করবে আল্লাহ তাকে এমন খাদ্য ও পানীয় দান করবেন যা কখনো নিঃশেষ হবে না এবং এমন জোড়া মিলিয়ে দেবেন যার কখনো মৃত্যু হবে না।

---

[৪৬] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৭৪৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৫১

[৪৭] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৫

[৪৮] সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ২৪

সিয়ামের প্রতি সালাফের গুরুত্ব

আবূ বকর ইবনু আবী মারইয়াম ছিলেন মৃত্যুশয্যায়। ওই সময় তিনি সিয়াম রেখেছিলেন। সিয়াম ভাঙার জন্য লোকেরা পানি বাড়িয়ে দিল। তিনি জানতে চাইলেন, সূর্য ডুবেছে কি না। লোকেরা না-বাচক উত্তর দিল। তখন তিনি পান করতে অস্বীকৃতি জানালেন। একসময় তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা বেড়ে গেল। লোকেরা আবার পানি নিয়ে এলো। তিনি ইশারায় সূর্যাস্তের কথা জানতে চাইলেন। এবার লোকেরা হাঁ-বাচক উত্তর দিলে তিনি সামান্য পানি পান করলেন। এরপরই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল।

গোটা দুনিয়াই মুত্তাকিদের জন্য সিয়াম পালনের মাস। আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাতের দিনটি হবে তাদের জন্য ঈদের দিন। সিয়ামের দিন তো বেশিরভাগ শেষ হয়ে গেছে, রবের সাথে সাক্ষাতের ঈদ তো প্রায় ঘনিয়েই এসেছে।

সিয়াম আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যকার একান্ত বিষয়। তাই আল্লাহর খাঁটি বান্দারা তা সাধ্যমতো লুকিয়ে রাখেন। যাতে সে ব্যাপারে কেউ জানতে না পারে। ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ বলতেন, 'তোমাদের কেউ সিয়াম পালন করলে দাড়িতে তেল লাগাবে এবং ঠোঁটে তেল বুলিয়ে নেবে। যাতে কেউ তার সিয়াম পালনের বিষয়টি বুঝতে না পারে।'

ইবনু মাসঊদ ﷺ বলেছেন, 'সিয়াম পালন করলে সকালে চুলে চিরুনি করে নেবে। (অর্থাৎ চুলে তেল লাগিয়ে পরিপাটি করবে।) সাদাকাহ এতটাই গোপনে করবে, যাতে ডান হাতে করা সাদাকাহর খবর বাম হাত জানতে না পারে। আর নফল সালাত আদায় করবে ঘরের ভেতরে।'

আবুত তাইয়াহ বলেছেন, আমার বাবা এবং এলাকার মুরুব্বিদের দেখতাম, সিয়াম পালন করলে তাঁরা তেল ব্যবহার করতেন এবং উত্তম পোশাক পরিধান করতেন।

সালাফের মাঝে এমন ব্যক্তিও ছিলেন যিনি চল্লিশ বছর ধরে সিয়াম পালন করেছেন কিন্তু কেউ তা জানতেও পারেনি। তাঁর দোকান ছিল। প্রতিদিন ঘর থেকে দোকানে যাওয়ার সময় দুটি রুটি নিয়ে বের হয়ে পথে সেগুলো সাদাকাহ করে দিতেন। ঘরের লোকেরা ভাবত, দোকানে বসে খাওয়ার জন্য তিনি রুটি দুটি নিয়েছেন। আর বাজারের লোকেরা ভাবত, তিনি ঘর থেকে খেয়ে বের হয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তাহাজ্জুদ সালাতের গুরুত্ব

পূর্বে বর্ণিত আবূ হুরায়রা ﷺ-এর হাদীসটি থেকে জানা যায় যে তাহাজ্জুদের সালাত হলো ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত। তবে সেটা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার চেয়েও উত্তম কি না, তা নিয়ে অবশ্য উলামাদের দ্বিমত রয়েছে।

ইবনু মাসঊদ ﷺ বলেছেন, 'প্রকাশ্য সাদাকাহর চেয়ে গোপন সাদাকাহ যেমন শ্রেষ্ঠ, দিনের সালাতের চেয়ে রাতের সালাতও তেমন শ্রেষ্ঠ। দিনের সালাতের ওপর তাহাজ্জুদের সালাতকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ হলো, তা গোপনে করা হয়। আর তাই ইখলাসের বেশি কাছাকাছি হয়ে থাকে।'

নফল আমলে গোপনীয়তা রক্ষা

তাহাজ্জুদ গোপন রাখতে সালাফগণ সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। হাসান ﷺ বলেছেন, 'এক ব্যক্তির কাছে মেহমান ছিল। সে ব্যক্তি রাতে এমনভাবে সালাত আদায় করতেন যে, মেহমানও টের পেত না।'

অনেক সালাফ মনোযোগ দিয়ে দুআ করতেন কিন্তু কোনো আওয়াজ হতো না। তাঁদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন, যিনি সারা রাত কেঁদেছেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী টের পায়নি। অথচ স্ত্রীর সাথে এক বালিশে শুয়েই রাত কাটিয়েছেন। মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি ﷺ মক্কায় যাওয়ার পথে হাওদাতে বসে সারারাত সালাত আদায় করতেন। লোকেরা যাতে তা বুঝতে না পারে, এজন্য তিনি উটচালককে জোরে আওয়াজ করতে বলতেন।

সালাফদের অনেকে মধ্যরাতে এমন চুপিচুপি উঠতেন যে, টের পাওয়া যেত না। ভোর হয়ে এলে তখন সশব্দে তিলাওয়াত শুরু করতেন। যাতে মনে হয়, তিনি মাত্রই ঘুম থেকে উঠেছেন।

তাহাজ্জুদের সালাত শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ

তাহাজ্জুদের সালাত শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ হলো, এটা আদায় করা বেশি কষ্টকর। দিনের পরিশ্রম এবং খাটুনির পর রাত হলো ঘুম এবং আরামের সময়। আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ঘুম ত্যাগ করা কঠোর পরিশ্রমের বিষয়। বলা হয়ে থাকে, যে আমল করতে মনকে বাধ্য করা হয়, সেটাই সর্বোত্তম।

আরেকটি কারণ হলো, রাতের সালাতে তিলাওয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনা করা সহজ। রাতে ব্যস্ততা না থাকায়, সহজেই মন বসে। ফলে মুখে উচ্চারণ করা আয়াত, অন্তর অনুধাবন করতে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْـًٔا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝٦

'রাত জাগরণ করা আত্মসংযমের জন্য বেশি কার্যকর এবং (কুরআন) স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল।'[৪৯]

এ অর্থেই রাতের সালাতে কুরআনকে তারতীলের সাথে তথা ধীরেসুস্থে এবং স্পষ্টভাবে পড়তে বলা হয়েছে। তাহাজ্জুদের সালাতকে প্রাধান্য দেওয়ার আরও একটি কারণ হলো, তাহাজ্জুদের সময়টা নফল সালাতের সর্বোত্তম সময়। বান্দা এ সময় আল্লাহর বেশি নিকটবর্তী হয়ে থাকে। এ সময়েই আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, দুআ কবুল করা হয়। আর প্রয়োজনগ্রস্তকে বলা হয়, তার জরুরত উপস্থাপন করতে।

আল্লাহ তাআলার প্রশংসা

রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যিকর, দুআ, ইসতিগফার, এবং মুনাজাতকারীদেরকে আল্লাহ অনেক প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝١٦
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝١٧

'তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়। তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে। আর আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। কেউই জানে না, তাদের কাজের পুরস্কার হিসেবে চোখ জুড়ানো কী (জিনিস) তাদের জন্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে।'[৫০]

وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ۝١٧

'এবং শেষ রাতে ইসতিগফারকারী।'[৫১]

---

[৪৯] সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩ : ৬

[৫০] সূরা সাজদাহ, ৩২ : ১৬-১৭

[৫১] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৭

كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ ۝١٧ وَبِٱلۡأَسۡحَارِ هُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ ۝١٨

'তারা রাতের সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত এবং রাতের শেষ প্রহরে তারা ইসতিগফার করত।'[৫২]

وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدًا وَقِيَٰمًا ۝٦٤

'তারা রাত কাটিয়ে দেয় তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সাজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে।'[৫৩]

أَمَّنۡ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيۡلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحۡذَرُ ٱلۡأٓخِرَةَ وَيَرۡجُواْ رَحۡمَةَ رَبِّهِۦۗ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ۝٩

'যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে সাজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এমন করে না? বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? আসলে বুদ্ধিমানরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।'[৫৪]

مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتۡلُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيۡلِ وَهُمۡ يَسۡجُدُونَ ۝١١٣

'কিতাবিদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা রাতের গভীরে অবিচলভাবে আল্লাহর আয়াতগুলো পাঠ করে এবং সাজদা করে।'[৫৫]

নবি ﷺ-কে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحۡمُودًا ۝٧٩

'রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ কায়েম করুন, এটা আপনার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায়, আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।'[৫৬]

[৫২] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ১৭-১৮
[৫৩] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৪
[৫৪] সূরা যুমার, ৩৯ : ৯
[৫৫] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১১৩
[৫৬] সূরা ইসরা, ১৭ : ৭৯

وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَٱسۡجُدۡ لَهُۥ وَسَبِّحۡهُ لَيۡلًا طَوِيلًا ۝٢٦

'রাতের কিছু অংশে তাঁর প্রতি সাজদাবনত হোন এবং রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিম ঘোষণা করুন।'[৫৭]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُزَّمِّلُ ۝١ قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٢ نِّصۡفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصۡ مِنۡهُ قَلِيلًا ۝٣ أَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا ۝٤

'হে বস্ত্রাবৃত! রাত জাগরণ করুন, কিছু অংশ বাদ দিয়ে, অর্ধ রাত বা তার চেয়ে কিছু কম, অথবা তার চেয়ে বেশি। এবং কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরেসুস্থে ও স্পষ্টভাবে।'[৫৮]

আয়িশা ﵂-এর উপদেশ

আয়িশা ﵂ এক লোককে বলেছিলেন, 'কখনো তাহাজ্জুদের সালাত ছাড়বে না। কেননা, রাসূল ﷺ কখনোই তা পরিত্যাগ করেননি। কখনো অসুস্থ বা অবসন্ন বোধ করলে বসে বসে আদায় করতেন (কিন্তু পরিত্যাগ করতেন না)।'[৫৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়িশা ﵂ বলেছেন, "শুনেছি এক দল লোক নাকি বলে, 'আমরা কেবল ফরয আদায় করাই যথেষ্ট মনে করি; এর থেকে বেশি করার প্রয়োজন বোধ করি না।' আল্লাহর কসম! তিনি তো কেবল ফরয সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করবেন। কিন্তু এসব লোক তো রাত দিন কত গুনাহই করে থাকে! তোমরা তো তোমাদের নবির চেয়ে উত্তম নও। আর তিনি ছিলেন তোমাদের মতো মানুষ। তবুও আল্লাহর রাসূল ﷺ কখনো তাহাজ্জুদের সালাত ছাড়েননি।"

এ কথা বলে আয়িশা ﵂ তাহাজ্জুদের দুটি উপকারিতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

প্রথমত, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণ এবং তাঁর আদর্শ গ্রহণ করা। যেমনটা আল্লাহ বলেছেন,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'অবশ্যই তোমাদের জন্যে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।'[৬০]

[৫৭] সূরা ইনসান, ৭৬ : ২৬

[৫৮] সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩ : ১-৪

[৫৯] আবূ দাউদ, আসসুনান, হাদীস নং : ১৩০৭, হাকিম ﵀ এই হাদীসটিকে মুসলিম ﵀-এর শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন।

[৬০] সূরা আহযাব, ৩৩ : ২১

দ্বিতীয়ত, গুনাহের কাফফারা হওয়া। আদম সন্তানের রাতদিন গুনাহ হতেই থাকে। সেজন্য অধিক হারে প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন। আর তাহাজ্জুদের সালাত বড় বড় প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে অন্যতম। যেমন মুআয ইবনু জাবাল ﵁-কে নবি ﷺ বলেছিলেন,

«قِيَامُ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يُكَفِّرُ الْخَطَايَا»

'রাতের মধ্যভাগে সালাত আদায় করা বান্দার গুনাহের কাফফারা।'

এরপর নবি ﷺ সূরা সাজদাহ'র ১৬ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।[৬১]

তাহাজ্জুদের আরও কিছু উপকারিতা

⇨ বর্ণিত আছে, তাহাজ্জুদ আদায়কারীরা কোনো রকম হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

⇨ জনৈক সালাফ বলেছেন, রাতের সালাতের কারণে কিয়ামাতের দিন অবস্থান করা সহজ হবে।

⇨ আবূ উমামা এবং বিলাল ﵄ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ
وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ، وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ.»

'তোমাদের উচিত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা। কেননা, এটা তোমাদের পূর্ববর্তী নেককারদের পালিত রীতি। তাহাজ্জুদের সালাত আল্লাহর নৈকট্যলাভ এবং গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়। মন্দ কাজের কাফফারা এবং দৈহিক রোগের প্রতিষেধক।'[৬২]

⇨ 'স্বপ্নের প্রসিদ্ধ হাদীসটিতে' এসেছে, সর্বোচ্চ ফেরেশতাদের মাজলিসে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি এবং গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে বিতর্ক হচ্ছিল। ওই মাজলিসে মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয় হলো—মানুষকে খাবার খাওয়ানো, সালামের প্রসার ঘটানো এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত আদায় করা।[৬৩]

---

[৬১] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ২২০৬৮

[৬২] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৩৫৪৯; সহীহ ইবনু খুযাইমাহ, হাদীস নং : ১১৩৫; হাকিম, আলমুসতাদরাক : ১/৪৫১; আবূ উমামা ﵁-এর রিওয়ায়াতটি বিশুদ্ধতম। তবে তাতে 'দৈহিক রোগের প্রতিরোধক' বাক্যটি নেই।

[৬৩] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ৩৪৮৪; তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৩২৩৩, সহীহ।

⇨ আবদুল্লাহ ইবনু সালাম ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় এলে লোকেরা দ্রুত তাঁর দিকে ছুটে গেল। বলাবলি হতে লাগল, আল্লাহর রাসূল ﷺ এসেছেন। লোকদের মধ্যে আমিও তাঁকে দেখতে গেলাম। রাসূল ﷺ-এর চেহারা আমার সামনে স্পষ্ট হওয়ামাত্র আমি চিনে ফেললাম। এ চেহারা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। তিনি প্রথম যে কথা বললেন তা হলো,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِسَلَامٍ.»

'হে লোকসকল! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, লোকদের আহার করাও এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাতে দাঁড়াও। তাহলে তোমরা নিশ্চিন্তে জান্নাতে দাখিল হতে পারবে।'[৬৪]

⇨ তাহাজ্জুদের অন্যতম ফযিলত হলো, এই সালাত আদায়কারীদের আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। ফেরেশতাদের সামনে তাদের নিয়ে গর্ব করেন এবং তাদের দুআ কবুল করে থাকেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ، مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ وَحَيِّهِ إِلَى صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ رَبُّنَا: أَيَا مَلَائِكَتِي، انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ، وَمِنْ بَيْنِ حَيِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي.»

'আমাদের মহান প্রতিপালক এমন বান্দার প্রতি খুশি হন, যে কিনা বিছানা থেকে কম্বল সরিয়ে নিজের পরিবার ও প্রিয়জনদের মাঝ থেকে উঠে সালাতে দাঁড়িয়ে যায়। তখন আল্লাহ বলেন, ফেরেশতারা! আমার বান্দাকে দেখো! সে বিছানা থেকে কম্বল সরিয়ে পরিবার ও প্রিয়জনের মাঝ থেকে উঠে সালাতে দাঁড়িয়েছে। বান্দার এ কাজের কারণ হলো, আমার কাছে থাকা পুরস্কারের প্রতি (তার) আগ্রহ এবং আমার শাস্তির ভয়।'[৬৫]

মূল হাদীসে ثَارَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা উদ্যমতা এবং দৃঢ়তা প্রকাশ করে।

---

[৬৪] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ২৪৮৫, তিরমিযি ﵀ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬৫] ইবনু আবি শায়বাহ, আলমুসান্নাফ, হাদীস নং : ১৯৩৯৫, সহীহ

আরেক হাদীসে এসেছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ.»

'আবদুল্লাহ (ইবনু উমার) বড় ভালো লোক, যদি সে রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করত!'[৬৬]

এ কথা শোনার পর আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাতে খুব কম ঘুমাতেন।

আবূ যার একবার লোকদের বললেন, 'বলো তো দেখি, কোনো লোক সফর করতে চাইলে কি যথাযথ এবং দরকারি পাথেয় গ্রহণ করবে না?' লোকেরা জবাব দিল, অবশ্যই করবে। আবূ যার বললেন, 'তাহলে কিয়ামাতের সফর তো অনেক দীর্ঘ। সুতরাং তোমরা প্রয়োজনীয় পাথেয় গ্রহণ করো। গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নাও। যেদিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে, সেদিনকার ভীষণ গরম থেকে আত্মরক্ষার জন্য গরমের দিনে সিয়াম পালন করো। কবরের অন্ধকার দূর করার জন্য রাতের অন্ধকারে দু' রাকআত সালাত আদায় করো। কঠিন দিনের কষ্ট দূর করার জন্য সাদাকাহ করো।'

কোথায় সেই তাহাজ্জুদ আদায়কারীরা? হাসান, সুফইয়ান আর ফুযাইল কোথায়?

তাহাজ্জুদের সময়

দাউদ এর তাহাজ্জুদের পদ্ধতি আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দনীয়। তিনি রাতের প্রথম অর্ধেক ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশ তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং রাতের ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন।[৬৭]

নবি ﷺ তাহাজ্জুদের জন্য কখন জাগতেন, সেটা জানতে চাওয়া হলো আয়িশা -এর কাছে। তিনি বললেন, 'যখন মোরগের ডাক শুনতে পেতেন।'[৬৮] মোরগ ডেকে ওঠে মধ্যরাতে।

[৬৬] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১১২২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৪৭৯

[৬৭] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১১৩১

[৬৮] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১১৩২

তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে না পারার কারণ

সকাল পর্যন্ত ঘুমে কাটিয়েছে, এমন এক ব্যক্তির আলোচনা উঠলে হলে নবি ﷺ বললেন,

«بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ»

'শয়তান তার কানে পেশাব করে দিয়েছে।'[৬৯]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ رضي الله عنه কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, আমরা রাতে সালাতের জন্য উঠতে পারি না কেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'গুনাহ তোমাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে।'

হাসান رحمه الله কে একজন বলল, আমরা তো তাহাজ্জুদের সালাত আদয় করতে অক্ষম হয়ে গেছি। উত্তরে তিনি বললেন, 'গুনাহ তোমাদের আটকে রেখেছে।'

ফুযাইল رحمه الله বলেছেন, 'রাতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে এবং দিনে সিয়াম পালন করতে না পারলে বুঝে নিও, তুমি একজন শৃঙ্খলিত বন্দি। গুনাহ যাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছে।'

হাসান رحمه الله বলেছেন, 'গুনাহের কারণেই বান্দা তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।'

জনৈক সালাফ বলেছেন, 'একবার একটি গুনাহ করার কারণে আমি টানা ছয়মাস তাহাজ্জুদের সালাত থেকে বঞ্চিত হয়েছি।'

রাত আসলে একটি ঘাটের মতো। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন চাওয়া নিয়ে প্রত্যাশীরা জড়ো হয়। প্রত্যেকেই নিজের স্থান চিনে নেয়। প্রেমিক উপভোগ করে তার প্রিয়জনের সাথে একান্ত কথাবার্তা। ভীত ব্যক্তি নিজের গুনাহের জন্য ক্ষমা চেয়ে কাকুতি-মিনতি করে কাঁদতে থাকে। আশাবাদী ব্যক্তি নাছোড়বান্দা হয়ে প্রার্থনা করে চলে। কিন্তু দুর্ভাগা ও উদাসীন ব্যক্তি বঞ্চিত হয়ে সব খুইয়ে বসে।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর رضي الله عنه কে নবি ﷺ বলেছেন,

«.يَا عَبْدَ اللهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ»

'আবদুল্লাহ! তুমি অমুক লোকের মতো হয়ো না—যে রাতে (সালাতে)

[৬৯] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১১৪৪

দাঁড়াত, কিন্তু পরে তা ছেড়ে দিয়েছে।'[৭০]

রাতের বেলা আলি এবং ফাতিমা ﵄-এর দরজায় এসে নবি ﷺ বলতেন,

«أَلَا تُصَلِّيَانِ؟»

'তোমরা সালাত আদায় করছ না?'[৭১]

নবি ﷺ বলেছেন,

إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا، أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا، كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ

'কোনো লোক যদি রাতে তার স্ত্রীকে ঘুম হতে জাগিয়ে, দুজনে মিলে সালাত আদায় করে কিংবা প্রত্যেকে দুই-দুই রাকআত সালাত আদায় করে, তবে যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী মহিলা হিসাবে তাদের নাম আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়।'[৭২]

হাবীব আজামির স্ত্রী রাতের বেলা স্বামীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়ে বলতেন, 'রাত কেটে গেছে। আমাদের সামনে দীর্ঘ পথ কিন্তু আমাদের পাথেয় সামান্য। ভালো লোকদের কাফেলা সামনে এগিয়ে গেছে অথচ আমরা পড়ে আছি পিছনে।'

দ্বিতীয় পর্ব : আশুরার দিন

ইবনু আব্বাস ﵄-কে আশুরার দিনের সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আশুরার দিনের সিয়ামের ওপর অন্য দিনের সিয়ামকে প্রাধান্য দিতে দেখিনি। এবং রমাদান মাসের ওপর অন্য কোনো মাসকে গুরুত্ব দিতেও দেখিনি।'[৭৩]

প্রাচীনকাল থেকেই আশুরার দিন সম্মানিত বলে বিবেচিত হতো। শ্রেষ্ঠত্বের

[৭০] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১১৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৫৯

[৭১] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১১২৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৭৭৫

[৭২] আবূ দাউদ, আসসুনান, হাদীস নং : ১৩০৯, সহীহ

[৭৩] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ২০০৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৩২

কারণে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এ দিনটিতে সিয়াম পালন করতেন। এ দিনে সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে নবি ﷺ-এর চার ধরনের অবস্থা ছিল।

⇨ **প্রথম অবস্থা :** মক্কায় থাকাকালীন নবি ﷺ নিজে আশুরার সিয়াম পালন করতেন কিন্তু কাউকে আদেশ করতেন না। আয়িশা ﵂ বলেছেন, 'জাহিলিয়্যাতের যুগে কুরাইশদের মতো নবি ﷺ-ও আশুরার সিয়াম পালন করতেন। মদীনায় আগমনের পরও তিনি তা জারি রাখেন। সাথে সাথে পালনের আদেশও দেন। রমাদানের সিয়াম ফরয হওয়ার পর তিনি রমাদান মাসে সিয়াম পালন করতে লাগলেন এবং আশুরার সিয়াম নফল করে দিলেন। তখন যার ইচ্ছা, সে সিয়াম পালন করত। আর যার ইচ্ছা সে বিরত থাকত।'[৭৪]

⇨ **দ্বিতীয় অবস্থা :** মদীনায় আগমনের পর নবি ﷺ দেখলেন, আহলে কিতাবরা আশুরার দিন সিয়াম রাখে এবং এ দিনটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। নবি ﷺ-এর অভ্যাস ছিল, হারাম না হলে আহলে কিতাবদের সহমত পোষণ করা। তাই তিনি সিয়াম পালনের নির্দেশ জারি করলেন এবং জোর দিয়ে সাহাবিদের উদ্‌বুদ্ধ করলেন। ফলে সাহাবিরা নিজেরা সিয়াম পালন করতেন এবং শিশুদেরও করাতেন।

ইবনু আব্বাস ﵁ বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় এসে দেখলেন, ইয়াহূদীরা আশুরার দিন সিয়াম পালন করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা এটা কোন দিনের সিয়াম পালন করছ?' তারা বলল, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। এ দিনে আল্লাহ তাআলা মূসা ﵇ ও তাঁর কওমকে মুক্তি দিয়েছেন। এবং ফিরআউনকে তার দলবল-সহ ডুবিয়ে দিয়েছেন। মূসা ﵇ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এ দিনে সিয়াম পালন করেছেন। তাই আমরাও এ দিনে সিয়াম রাখছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন,

«فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ.»

'তোমাদের তুলনায় আমরা মূসা আ-এর (অনুসরণের) বেশি উপযুক্ত এবং যোগ্যতর।' তারপর নবি ﷺ নিজে সেদিন সিয়াম পালন করলেন এবং এর নির্দেশ দিলেন।'[৭৫]

সালামা ইবনুল আকওয়া ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল ﷺ আশুরার দিন আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন। সে লোকদের মধ্যে এ

[৭৪] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ২০০২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১২৫

[৭৫] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ২০০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৩০

কথা ঘোষণা করল, যে সিয়াম পালন করেনি সে যেন সিয়াম পালন করে। আর যে আহার করেছে, সে যেন রাত পর্যন্ত তার সিয়াম পূর্ণ করে নেয়।'[৭৬]

এ সংক্রান্ত অনেক হাদীস আছে।

⇨ **তৃতীয় অবস্থা :** রমাদানের সিয়াম ফরয হওয়ার পরে নবি ﷺ সাহাবিদেরকে আশুরার দিন সিয়াম পালনের আদেশ দেওয়া এবং এ ব্যাপারে জোর প্রদান করা ছেড়ে দিয়েছেন। এ সংক্রান্ত আয়িশা رضي الله عنها বর্ণিত হাদীসটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

ইবনু উমার رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, 'নবি ﷺ আশুরার দিন সিয়াম পালন করেছেন এবং এ সিয়ামের জন্য আদেশও করেছেন। পরে রমাদানের সিয়াম ফরয হলে সেটা ছেড়ে দিয়েছেন তিনি।'[৭৭]

⇨ **চতুর্থ অবস্থা :** শেষ বয়সে নবি ﷺ সঙ্কল্প করেছিলেন, তিনি এককভাবে সে দিনটিতে সিয়াম পালন করবেন না। বরং সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে কিতাবিদের বিরোধিতা করার জন্য এর সঙ্গে আরেকটি দিন যুক্ত করে নেবেন। ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরার দিন নিজে সিয়াম পালন করেন এবং সাহাবিদের সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন। তখন সাহাবিগণ বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইয়াহূদী এবং খ্রিষ্টানরা এ দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

«فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ.»

'তবে আল্লাহ চাহে তো, আগামী বছর আমরা নবম তারিখেও সিয়াম পালন করব।' বর্ণনাকারী বলেছেন, পরবর্তী বছর আসার আগেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়ে যায়।[৭৮]

সালাফের আমল

ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما, আবূ ইসহাক সাবীয়ি এবং যুহরির মতো সালাফের একটি দল সফররত অবস্থাতেও আশুরার সিয়াম পালন করতেন। তাদের বক্তব্য ছিল, 'রমাদানের সিয়াম তো পরে সফরের পরে অন্য সময়ও আদায় করে নেওয়া যায়।

---

[৭৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৩৫; সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৯২৪

[৭৭] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৮৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১২৬

[৭৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৩৪

কিন্তু আশুরার সিয়াম ছুটে গেলে তার তো কোনো কাযা করার সুযোগ নেই।' ইমাম আহমাদ ﷺ-ও সফর অবস্থায় আশুরার সিয়াম পালনের পক্ষে মত দিয়েছেন।

ইমাম আবূ হানীফা ﷺ শুধু দশ তারিখে সিয়াম পালন করা অপছন্দ করতেন।

যা কিছু বর্জনীয়

আশুরার দিন সুরমা ব্যবহার করা, মেহেদি লাগানো এবং গোসল করার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা নিতান্তই বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন। হারব ﷺ বলেছেন, 'আমি ইমাম আহমাদকে আশুরার দিন পরিবারের জন্য খরচ করা সম্পর্কিত হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি হাদীসটিকে কিছু মনে করেননি।'

'হাদীসটিকে আহমাদ কিছু মনে করেননি' বলে উদ্দেশ্য হলো, যে হাদীসটি নবি ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে বলা হয়, তার সনদ তো সহীহ নয়।

আশুরার দিনে হুসাইন ইবনু আলি ﷺ নিহত হওয়ার কারণে শিয়ারা যে মাতম করে থাকে সেটা ভালো কাজের মোড়কে একটি অনর্থক কাজ। আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ কেউই নবিগণের বিপদের দিনে বা তাঁদের মৃত্যুতে মাতম করতে বলেননি। তাহলে নবি ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে এমনটা করা কেমন হবে?

এ দিনের ফযিলত

আশুরার দিনের একটি ফযিলত এটা যে, এ দিনে আল্লাহ একদল লোকের তাওবা কবুল করেছিলেন। এক সাহাবিকে নবি ﷺ বলেছিলেন,

«إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ
عَلَى قَوْمٍ، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ.»

'রমাদান মাসের পর আরও সিয়াম পালন করতে, চাইলে মুহাররামে সিয়াম পালন করো। কারণ, এটি আল্লাহর মাস। এতে এমন একটি দিন আছে, যাতে আল্লাহ এক দলের তাওবা কবুল করেছিলেন এবং আগামীতেও আরেক দলের তাওবা তিনি এ দিনেই কবুল করবেন।'[৭৯]

'আগামীতেও আরেক দলের তাওবা তিনি এ দিনেই কবুল করবেন।' এ কথা বলে নবি ﷺ খাঁটি অন্তরে তাওবা করতে উৎসাহিত করেছেন। পূর্ববর্তী লোকদের

---

[৭৯] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ৭৪১, তিরমিযি ﷺ হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন।

মতো যারা তাওবা করেছে, তাদেরকে অভিবাদন জানিয়েছেন। আদম ﷺ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾

'তারপর আদম তার পালনকর্তার কাছ থেকে কিছু কথা শিখে নিলেন। তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৮০]

আদম ﷺ এবং তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾

'তারা (দুজনে) বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'[৮১]

উমার ইবনু আবদিল আযীয ﵀ বিভিন্ন শহরে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। যাতে তিনি লিখেছিলেন, আদিপিতা আদম ﷺ-এর মতো আপনারাও বলুন,

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'[৮২]

নূহ ﷺ-এর মতো বলুন,

وَإِلَّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِىٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٤٧﴾

'আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'[৮৩]

---

[৮০] সূরা বাকারাহ, ২ : ৩৭

[৮১] সূরা আ'রাফ, ৭ : ২৩

[৮২] সূরা আ'রাফ, ৭ : ২৩

[৮৩] সূরা হূদ, ১১ : ৪৭

মূসা ﷺ-এর মতো বলুন,

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرْ لِي

'রব আমার! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করে ফেলেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন।'[৮৪]

ইউনুস ﷺ-এর মতো বলুন,

سُبْحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٧﴾

'আপনি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালংঘনকারী।'[৮৫]

গুনাহের কথা স্বীকার করে অনুতপ্ত হলে, সে তাওবা কবুল করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ

'আর কিছু লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে, তারা একটি নেককাজ এবং আরেকটি মন্দ কাজ মিশ্রিত করেছে; আশা করা যায়—আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেবেন।'[৮৬]

নবি ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللهِ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ».

'বান্দা নিজের পাপ স্বীকার করে তাওবা করলে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।'[৮৭]

সালাতে দাঁড়িয়ে নবিজি ﷺ শুরুতেই বলতেন,

«اَللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ»

---

[৮৪] সূরা কাসাস, ২৮ : ১৬

[৮৫] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৮৭

[৮৬] সূরা তাওবা, ৯ : ১০২

[৮৭] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৪৭৫০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭৭০

بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ».

'ইয়া আল্লাহ! আপনিই বাদশাহ, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনি আমার প্রতিপালক এবং আমি আপনার বান্দা। আমি নিজের ওপর যুলুম করে ফেলেছি, আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি। অতএব, আমার সব গুনাহ আপনি মাফ করে দিন। আপনি ছাড়া আর কেউ তো ক্ষমা করতে পারে না।'[৮৮]

আবূ বকর ﷺ-কে নবি ﷺ সালাতে পড়ার জন্য এ দুআ শিখিয়েছিলেন :

«اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

'ইয়া আল্লাহ! নিজের ওপর তো আমি অনেক যুলুম করে ফেলেছি। আপনি ছাড়া সে অপরাধ ক্ষমা করার মতো কেউ নেই। আপনার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াবান।'[৮৯]

শাদ্দাদ ইবনু আওস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

'সাইয়িদুল ইসতিগফার হলো এ কথা বলা—ইয়া আল্লাহ! আপনিই আমার পালনকর্তা। আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর আমি আপনারই বান্দা। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী আপনার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের ওপর আছি। আমার প্রতি আপনার নিয়ামাত আমি স্বীকার করছি এবং স্বীকার করে নিচ্ছি আমার কৃত গুনাহ। সুতরাং আমাকে আপনি ক্ষমা করে দিন। কারণ আপনি ছাড়া ক্ষমা করার আর কেউ নেই।'[৯০]

---

[৮৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৭৭১

[৮৯] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৮৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭০৫

[৯০] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৬৩০৬

আদম ﷺ-কে জান্নাত থেকে নামিয়ে দেওয়ার পর, তিন শ বছর তিনি কান্না করতে থাকেন। এমন করাটাই সমীচীন ছিল। কারণ তিনি এমন জগতে ছিলেন যেখানে ক্ষুধা-পিপাসা ছিল না। নগ্নতা এবং ক্লিষ্টতার তো প্রশ্নই আসে না। পৃথিবীতে তিনি এসবের সম্মুখীন হয়েছেন। জিবরীল ﷺ-কে দেখামাত্র তাঁর সেই জগতের কথা স্মরণ হতো। আদম ﷺ তখন এত বেশি কান্নাকাটি করতেন যে, তাঁকে দেখে জিবরীলও কাঁদতেন। জিবরীল ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন, আদম! আপনি এত কান্না করছেন কেন? উত্তরে তিনি বলতেন, 'নিয়ামাতে পরিপূর্ণ জগৎ থেকে দুঃখের জগতে চলে এসেছি। এখন কান্না না করে উপায় আছে?'

সুতরাং এই শত্রু থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে, যে কিনা আমাদের পিতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল। সেখানে যাতে আমরা পুনরায় ফিরে যেতে না পারি, সেজন্য ও সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের সাথে তার শত্রুতা অনেক পুরোনো। কারণ আমাদের পিতাকে সাজদা করার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা অমান্য করার কারণে, সে জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হয়েছিল। অহংকার থেকেই সে এমনটা করেছিল। ফলে সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। জান্নাতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ হারায়। আর জাহান্নাম হয় তার নিশ্চিত ঠিকানা। পিতার সাথে শত্রুতার কারণে সে আদম-সন্তানকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে চায়। এজন্য সে শিরককে শোভিত করে বনী আদমের সামনে উপস্থাপন করে। তারা শিরক না করলেও, অন্তত নাফরমানিতে যেন জড়িয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। সতর্ক করার পাশাপাশি আমাদের দুর্বলতাও তিনি মেনে নিয়েছেন। কাজেই, আমাদেরকে সতর্ক থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ

'হে আদম-সন্তান! (সাবধান!) শয়তান যেন কোনোভাবেই তোমাদের প্রলুব্ধ করতে না পারে, যেভাবে তোমাদের বাবা-মা'কে সে জান্নাত থেকে বের করে এনেছিল।'[৯১]

প্রতিপালকের পরিচয় লাভ করার পরও তাঁর নাফরমানি করা, আর শয়তানকে চেনা সত্ত্বেও তার আনুগত্য করা, এক আশ্চর্যজনক বিষয়। আল্লাহ বলেন,

أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمۡ لَكُمۡ عَدُوُّۢۚ بِئۡسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلٗا ﴿٥٠﴾

[৯১] সূরা আ'রাফ, ৭ : ২৭

‘তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। যালিমদের এই পরিবর্তন খুবই নিকৃষ্ট।’[৯২]

প্রকৃতপক্ষে মুমিনরা দুনিয়াতে এক রণক্ষেত্রে অবস্থান করছে। তাদেরকে নফস এবং প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক লড়াই করতে হয়। এই যুদ্ধযাত্রা সমাপ্তির পরে তারা নিজেদের সেই বাসস্থানে ফিরে যাবে, যেখানে তারা তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে করে অবস্থান করেছিল। উম্মাতে মুহাম্মাদির কাছে তাদের পিতা ইবরাহীম ﷺ একটি বার্তা পাঠিয়েছেন, যা বহন করে নিয়ে এসেছেন আমাদের নবিজি। তিনি বলেছেন,

«لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ المَاءِ، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.»

‘মিরাজের রাতে ইবরাহীম ﷺ-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি বলেন, মুহাম্মাদ! আপনার উম্মাতকে আমার পক্ষ থেকে সালাম দিবেন এবং তাদের জানিয়ে দিবেন—জান্নাতের মাটি উত্তম, তার পানি সুমিষ্ট; তবে তা একটি ফাঁকা ময়দান। এর গাছ হলো সুবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।’[৯৩]

জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ

“কেউ ‘সুবহানাল্লাহিল আযীমি ওয়া বিহামদিহী’ পাঠ করলে জান্নাতে তার জন্য একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হয়।”[৯৪]

জান্নাতের জমিন একটি ফাঁকা ময়দান, নেক আমল যেখানকার স্থাপত্য। এর মাধ্যমেই সেখানে নির্মিত হয় ভবন এবং জান্নাতের জমিনে রোপণ করা হয় গাছ। গাছ রোপণ এবং ভবন নির্মাণ সমাপ্তির পর বাসিন্দারা সেখানে শিফট করে থাকে।

---

[৯২] সূরা কাহফ, ১৮ : ৫০

[৯৩] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৩৪৬২, নববি ﷺ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৯৪] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৩৪৬৫, হাকিম ﷺ হাদীসটিকে ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন।

আল্লাহর পরিচয় যারা লাভ করেছেন, তাদের অন্তর কখনো কখনো জান্নাতের অপূর্ব ঘ্রাণ উপভোগ করে থাকে। যেমন উহুদ যুদ্ধের দিন আনাস ইবনু নাযার ﷺ বলেছিলেন, 'আহ, কী চমৎকার জান্নাতের সুবাস! আল্লাহর কসম! উহুদের দিক থেকে আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি।' এ কথা বলে তিনি সামনে এগিয়ে যান। লড়াই করতে করতে এক পর্যায়ে শাহাদাত বরণ করেন।

আদম ﷺ-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলার চমৎকার এক হিকমাত রয়েছে। তিনি নেমে না এলে না মুজাহিদদের জিহাদ প্রকাশ পেত আর না পরিশ্রমীদের পরিশ্রমের দেখা মিলত। না তাওবাকারীদের দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসত, আর না গুনাহগারদের অশ্রু ঝরত।

তৃতীয় পর্ব : হাজীদের আগমন

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

'যে ব্যক্তি এ ঘরের হাজ্জ করল, অশ্লীলতায় লিপ্ত হলো না এবং আল্লাহর নাফরমানি করল না, সে মাতৃগর্ভ থেকে সদ্য-প্রসূত শিশুর মতো (নিষ্পাপ) হয়ে (হাজ্জ থেকে) প্রত্যাবর্তন করবে।'[৯৫]

ইসলামের পঞ্চ ভিত্তির প্রতিটিই গুনাহের কাফফারা এবং পাপ মোচনকারী। যেমন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সমস্ত গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এটি অপেক্ষা উত্তম আমল হতেই পারে না।[৯৬] পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ এবং এক রমাদান থেকে পরবর্তী রমাদানের মধ্যবর্তী সমস্ত গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। তবে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে।[৯৭] সাদাকাহর কারণে গুনাহ মিটে যায়, পানি দিয়ে যেমন আগুন নিভে।[৯৮] অশ্লীলতা এবং আল্লাহর নাফরমানি-মুক্ত হাজ্জের মাধ্যমে বান্দা সদ্য-প্রসূত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।

---

[৯৫] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৮১৯

[৯৬] ইবনু মাজাহ, আসসুনান, হাদীস নং : ৩৭৯৭; দায়লামি, মুসনাদুল ফিরদাউস, হাদীস নং : ৭২৭৭

[৯৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৩৩

[৯৮] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৬১৪; ইবনু মাজাহ, আসসুনান, হাদীস নং : ৪২১০

নবি ﷺ বলেছেন,

«الحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ»

'কবুল হাজ্জের একমাত্র প্রতিদান হলো জান্নাত।'[৯৯]

আরেক বর্ণনায় আছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«أَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ»

'হাজ্জ, পূর্বের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়।'[১০০]

মোটকথা, হাজ্জে মাবরুর তথা কবুল হাজ্জ হলো গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত এবং জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম। সুতরাং হাজি নিজের জন্য যত দুআ করে অথবা তার জন্য অন্যরা যত দুআ করে, তার মধ্যে সর্বোত্তম দুআ হলো মাবরুর হাজ্জের দুআ।

হাজ্জের আমল শেষ করে ইহরাম থেকে হালাল হতে হয় যুলহিজ্জার দশ তারিখ। তখন জামরাতুল আকাবাতে পাথর নিক্ষেপ করার পর এই দুআর বিধান দেওয়া হয়েছে : 'ইয়া আল্লাহ! আপনি এই হাজ্জকে মাবরুর বানিয়ে নিন, আমলকে বানিয়ে দিন গ্রহণযোগ্য এবং গুনাহকে বানিয়ে দিন মার্জনীয়।' আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ এবং আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ থেকে এমনটা বর্ণিত হয়েছে।

হাজ্জে মাবরুরের নিদর্শন

হাজ্জে মাবরুরের বিনিময় হলো জান্নাত। এ কথা হাসান ﷺ-কে বলা হলে তিনি বললেন, 'এর নিদর্শন হলো, হাজ্জে মাবরুর সম্পাদনকারী দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে আখিরাত-মুখী হবে।' আরেকবার তাকে বলা হলো, হাজ্জে মাবরুরের প্রতিদান তো ক্ষমা। উত্তরে তিনি বললেন, 'এর নিদর্শন হলো, হাজ্জে মাবরুর সম্পাদনকারী পূর্বেকার গুনাহ ছেড়ে দেবে।'

ইবাদাত কবুলের নিদর্শন হলো, এর পরপরই অন্য একটি ইবাদাত করতে পারা। পক্ষান্তরে ইবাদাতের পরে গুনাহে লিপ্ত হওয়া, কবুল না-হওয়ার প্রমাণ। নেককাজের পর নেকি করা উত্তম কাজ। বিপরীতে নেককাজের পরে গুনাহ করা নিকৃষ্টতম কাজ। তাওবার পরের গুনাহ, পূর্বের সত্তরটি গুনাহ থেকেও নিকৃষ্ট।

[৯৯] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৭৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৩৪৯

[১০০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১২১

রোগের পুনরাক্রমণ, প্রথমবারের থেকেও জটিল হয়ে থাকে। ইবাদাতের সম্মান পাওয়ার পর, অবাধ্যতার লাঞ্ছনা ভোগ করা কতই-না ভয়াবহ! এজন্যই মৃত্যু পর্যন্ত ইস্তিকামাত থাকা এবং (আমল) বৃদ্ধির পরে হ্রাস পাওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া উচিত।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﷺ দুআতে বলতেন : 'ইয়া আল্লাহ! আপনার আনুগত্যের কারণে আমাকে সম্মানিত করুন। আপনার নাফরমানির কারণে আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না।'

ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﷺ প্রায়ই এ দুআ করতেন : 'ইয়া আল্লাহ! আমাকে নাফরমানির লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার করে, আনুগত্যের সম্মানের দিকে নিয়ে যান।'

মাবরুর হাজ্জ সমাপ্ত করার পর গুনাহ মাফ হয়ে যায়, দুআ কবুল হয়। তাই হাজির সাথে সাক্ষাৎ করা, তাকে সালাম দেওয়া এবং তার কাছে দুআ চাওয়া মুস্তাহাব।

হাজি'র সাথে সাক্ষাৎ করা সুন্নাহ। এর প্রমাণ হলো আবদুল্লাহ ইবনু জাফর ﷺ-এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর থেকে ফিরে পরিবারের শিশুদের সাথে মিলিত হতেন। একবার তিনি ﷺ সফর থেকে ফেরার পর, সবার আগে আমার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে (বাহনের) সামনে বসালেন। এরপর ফাতিমা ﷺ-এর এক ছেলেকে নিয়ে আসা হলো। তাঁকে বসালেন পেছনে। আমরা তিনজন একই বাহনে করে মদীনায় প্রবেশ করলাম।[১০১]

হাজিদের আগমন ঘটলে সালাম দেওয়া, তার সাথে মুসাফাহা করা এবং তার থেকে দুআ চাওয়ার প্রমাণ হলো আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস। নবি ﷺ বলেছেন,

«إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ، وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ، فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ.»

'হাজি'র সাথে দেখা হলে তাকে সালাম দাও এবং তাঁর সঙ্গে মুসাফাহা করো। সে ঘরে প্রবেশ করার আগেই, তোমার জন্য তাকে ইসতিগফার করতে বলো। কারণ তাকে তো ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।'[১০২]

[১০১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৪২৮

[১০২] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ৫৩৭১, হাদীসটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

হাজি'র আগমন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জনৈক মুসাফির সফর থেকে ফিরলে, পরিবারের সবাই খুব খুশি হলো। কিন্তু সেখানে থাকা একজন নেককার মহিলা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'এই আগমন আমাকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। তখন কতজন খুশি হবে আর কতজন বঞ্চিত হবে?'

কত লোক তো এমন হবে, যাদের সম্পর্কে বলা আছে :

لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾

'মহাভীতি তাদেরকে পেরেশান করবে না। আর ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলবে, এটাই তোমাদের সেই দিন, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।'[১০৩]

আবার অনেকে এমন হবে, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾

'সেদিন তাদেরকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।'[১০৪]

---

[১০৩] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ১০৩

[১০৪] সূরা তূর, ৫২ : ১৩

সফর মাসে পালনীয়

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ»

'(আল্লাহর চাওয়া ছাড়া) কোনো সংক্রমণ নেই, সফরে কোনো কুলক্ষণ নেই, পেঁচার মধ্যেও অশুভ কিছু নেই।'

তখন এক বেদুইন বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তাহলে আমার উটের এ অবস্থা হয় কেন? চারণভূমিতে থাকাকালীন সেগুলো মুক্ত হরিণপালের মতো থাকে। এরমধ্যে চর্মরোগাক্রান্ত উট এসে সেগুলোর মধ্যে মিশে সেগুলোকেও আক্রান্ত করে ফেলে। নবি ﷺ বললেন,

«فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟»

'তাহলে প্রথমটিকে কে রোগাক্রান্ত করেছে?'[১০৫]

সংক্রমণ অর্থ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি থেকে সুস্থ ব্যক্তির কাছে রোগ ছড়িয়ে পড়। যার ফলে সুস্থ ব্যক্তিটিও অসুস্থ হয়ে পড়ে। আরবের লোকদের বিশ্বাস ছিল চর্মরোগ-সহ অনেক রোগের ক্ষেত্রেই এমনটা হতে পারে। এজন্যই বেদুইন নবি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলে, সুস্থ উটের পালের মধ্যে চর্মরোগী উট ঢুকলে সুস্থগুলো আক্রান্ত হয়ে পড়ে কেন? নবিজি ﷺ তখন পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'তাহলে প্রথমটিকে কে রোগাক্রান্ত করেছে?' এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো, প্রথম উটটি তো কোনো সংক্রমণের মাধ্যমে আক্রান্ত হয়নি। বরং আল্লাহর ফায়সালা এবং নির্ধারণের মাধ্যমেই আক্রান্ত হয়েছে। পরবর্তীগুলোও সেভাবেই আক্রান্ত হয়েছে (অর্থাৎ জীবাণুর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ চাইলেই কেবল সংক্রমণ ছড়ায়।)

---

[১০৫] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৫৭১৭

কিছু হাদীস বোঝা অধিকাংশ মানুষে জন্য কষ্টসাধ্য। এজন্যই অনেকে ভেবেছেন, সেগুলোর দ্বারা আলোচ্য হাদীসটি রহিত হয়ে গিয়েছে। যেমন আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। নবি ﷺ বলেছেন,

«لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ»

'রোগাক্রান্ত উট কেউ যেন সুস্থ উটের সাথে না রাখে।'[১০৬]

এ হাদীসে রোগাক্রান্ত উট সুস্থ উটের সাথে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। অন্য হাদীসে নবি ﷺ বলেছেন,

«فِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ»

'কুষ্ঠরোগী থেকে এমনভাবে পলায়ন করো, যেমন তুমি সিংহ থেকে পালিয়ে থাকো।'[১০৭]

আর মহামারি সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন,

«إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا»

'কোনো এলাকাতে মহামারির প্রাদুর্ভাবের সংবাদ পেলে, তোমরা সেখানে প্রবেশ করো না।'[১০৮]

এখানে রহিত হওয়ার ধারণা অর্থহীন। কারণ 'কোনো সংক্রমণ নেই' একটি সংবাদ মাত্র, যা রহিত করা সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা যায় যে এটা সংক্রমণের (নিজস্ব ক্ষমতার ওপর) বিশ্বাস করার নিষেধাজ্ঞা, ওপরের হাদীসের খণ্ডন নয়।

বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, ওই হাদীস রহিত নয়। এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মত। তবে 'কোনো সংক্রমণ নেই'—এ কথার মর্ম নিয়ে তাদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। এ ব্যাপারে খোলাসা হলো, এখানে জাহিলি যুগের বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। আল্লাহর ফয়সালার ওপর বিশ্বাস না রেখে তারা ধারণা করত, রোগ নিজে থেকেই সংক্রমিত হয়ে থাকে। এই মতের পক্ষে দলিল হলো নবি ﷺ-এর পরবর্তী বক্তব্য—'তাহলে প্রথমটিকে কে রোগাক্রান্ত করেছে?' এ কথা বলে তিনি প্রমাণ করে দিলেন, প্রথমটি যেমন আল্লাহর হুকুমে রোগাক্রান্ত হয়েছে, তেমনি

---

[১০৬] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৫৭৭১

[১০৭] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৫৭৭০

[১০৮] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৫৭২৮

পরবর্তীগুলোও আল্লাহর ফয়সালাতেই আক্রান্ত হয়েছে। (অর্থাৎ জীবাণু আল্লাহর হুকুম ছাড়া সংক্রমিত হয় না।)

তবে, রোগাক্রান্ত উটকে সুস্থ উটের সাথে রাখতে বারণ করা হয়েছে। কুষ্ঠরোগীর কাছ থেকে পালানোর নির্দেশ দেওয়া দিয়েছে। আর এমন এলাকায় যেতে নিষেধ করা হয়েছে, যেখানে মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। এর কারণ হলো, সেখানে আল্লাহর সৃষ্টি করা ধ্বংস এবং কষ্টের উপকরণ (অর্থাৎ জীবাণু) রয়েছে। আর বান্দাকে বলা হয়েছে, নিরাপত্তার জন্য এমন সব উপকরণ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। ব্যাপারটা আসলে আগুনে ঝাঁপ দিতে বারণ করা, হেলে-পড়া দেয়ালের কাছে অবস্থান না করতে বলার মতো। কারণ, এসবের মাধ্যমে ক্ষতি হওয়াটাই স্বাভাবিক। অসুস্থের সংস্পর্শে আসা, মহামারিপূর্ণ এলাকাতে প্রবেশ করা, এগুলো হচ্ছে অসুস্থতা এবং মৃত্যুর কারণ। আর আল্লাহ তাআলা কারণ সৃষ্টি ও বাস্তবায়ন করে থাকেন। তিনি ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা এবং নির্ধারক নেই।

কারণ বা মাধ্যমের প্রকারভেদ

কারণ বা মাধ্যম দুই ধরনের। প্রথমত, কল্যাণের মাধ্যম। শারীআ তা নিয়ে খুশি হওয়া এবং সেটাকে শুভ মনে করার অনুমোদন দেয়। তবে এর ওপর ভরসা করা যাবে না। বরং ভরসা করতে হবে সেই সত্তার ওপর, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন ও তাকে মাধ্যম বানিয়েছেন। এটাই হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর ওপর ভরসা করার বাস্তবতা। ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করার ব্যাপারে আল্লাহ যেমনটা বলেন,

وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ
ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

'আল্লাহ এটা করেন শুধু সুসংবাদ দানের জন্য এবং এ উদ্দেশ্যে— যাতে তোমাদের মন প্রশান্তি লাভ করে। আর সাহায্য তো কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[১০৯]

দ্বিতীয়ত, অকল্যাণের মাধ্যম। এটাকে শুধু গুনাহের সাথেই সম্পৃক্ত করতে হবে। কারণ, বান্দার গুনাহের কারণেই বিপদ আসে। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ

[১০৯] সূরা আনফাল, ৮ : ১০

'অকল্যাণ যা কিছু হয়, তা তোমার নিজের কারণে।'[১১০]

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

'তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে, তা তো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল।'[১১১]

বোঝা গেল, সংক্রমণ বা এই জাতীয় কিছুর মাধ্যম হিসেবে গুনাহ ছাড়া অন্যকিছুকে যুক্ত করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে নির্দেশ হলো, শারীআ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ প্রকাশ পেলে, তা পরিহার করা। তা থেকে বেঁচে থাকা। যেমন : কুষ্ঠরোগীর সংস্পর্শে না যাওয়া, মহামারি ছড়িয়ে পড়া এলাকাতে না ঢোকা। পক্ষান্তরে (লক্ষণ) প্রকাশ না পেলে, সেটা পরিহার করার দরকার নেই। কারণ, তখন সেটা হবে অশুভ লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। এটা নিষিদ্ধ।

অশুভ লক্ষণ গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা

অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা মুশরিক এবং কাফিরদের কাজ। ফিরআউনের গ্যাং, সালিহ ﷺ-এর কওম এবং জনপদবাসীর কাছে রাসূল এলে, তারা অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করেছিল। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এটা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে নবি ﷺ স্পষ্টভাষায় বলেছেন,

«لَا طِيَرَةَ»

'অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই।'[১১২]

একবার নবি ﷺ-এর কাছে শুভ-অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন,

«أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ».

'শুভ-অশুভ নির্ণয়ের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে ফাল। কিন্তু এটা কোনো মুসলিমকে (তার কাজ থেকে) বিরত রাখতে পারে না। তবে হ্যাঁ, তোমাদের কেউ অসুবিধাজনক কিছু দেখতে পেলে বলবে—ইয়া আল্লাহ! কল্যাণ আপনিই দেন এবং অকল্যাণ আপনিই প্রতিহত করেন। আপনি

[১১০] সূরা নিসা, ৪ : ৭৯

[১১১] সূরা শূরা, ৪২ : ৩০

[১১২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৫৭৫৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২২২৩

ছাড়া আমাদের কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই।'[১১৩]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ বলেছেন, 'অশুভ লক্ষণের মাধ্যমে কেবল সে ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যে তা গ্রহণ করে।'

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে, বা শোনা কথার ওপর ভরসা করে নিজের প্রয়োজন সমাধা থেকে বিরত থাকে, সে অবশ্যই অপছন্দনীয় বিষয়ে আক্রান্ত হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর আস্থা রাখে, মনে আশা ও ভয় রাখে আল্লাহর প্রতি, এবং মাধ্যমের প্রতি ভীত না হয়ে ওপরে বর্ণিত দুআটি বলে, সে কোনো রকম ক্ষতির সম্মুখীন হবে না।

কাক ডাকতে শুনলে ইবনু আব্বাস ﵁ বলতেন, 'ইয়া আল্লাহ! আপনি যা অশুভ বানিয়েছেন, সেটাই সত্যিকারের অশুভ। আর আপনি যাকে কল্যাণকর বানিয়েছেন, সেটাই প্রকৃত কল্যাণ।'

তদ্রুপ নবি ﷺ-ও আদেশ করেছেন, সূর্যগ্রহণের মতো ভীতিপ্রদ আসমানি আযাব কেটে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যেন সালাত, দুআ, সাদাকাহ এবং দাসমুক্তির মতো নেককাজ জারি রাখা হয়। এথেকে প্রমণিত হয়, অপছন্দনীয় মাধ্যম সামনে এলে শারীআর আদেশ হলো, ভীতিপ্রদ আযাব থেকে বাঁচার সম্ভাব্য পথ অবলম্বন করা। যেমন : নেক আমল করা, দুআ করা এবং আল্লাহর ওপর ভরসা ও আস্থা রাখা। কারণ, এসব (অপছন্দনীয়) মাধ্যম তো কাজের ফলাফল মাত্র, সংঘটক নয়। নেক আমল, তাকওয়া, দুআ, তাওয়াক্কুলের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দ্বারা এগুলো প্রতিহত করা সম্ভব।

আযাব এবং রহমতের মাধ্যম সংঘটনের সময় আমল

মুসলমানদের বিশ্বাস হলো, একমাত্র আল্লাহই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। তবে তিনি আযাব এবং রহমতের জন্য পৃথক পৃথক মাধ্যম বাস্তবায়ন করে থাকেন। আযাবের মাধ্যম দিয়ে বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করেন। এর উদ্দেশ্য হলো, বান্দাকে তাঁর কাছে তাওবা এবং কাকুতি মিনতি করানো। যেমন : সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ। এ দুটি মূলত আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন। এর দ্বারা তিনি বান্দাদের ভয় দেখিয়ে পরীক্ষা করেন যে, কার নসীবে তাওবা জুটে। সুতরাং বোঝা গেল, এই ধরনের গ্রহণ হলো আযাব পতিত হওয়ার সম্ভাব্য একটি মাধ্যম।

---

[১১৩] আবূ দাউদ, আসসুনান, হাদীস নং : ৩৯১৯

আয়িশা ﵂-কে চাঁদের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়ার আদেশ দিয়ে আল্লাহর নবি ﷺ বলেছিলেন,

«فَإِنَّ هَذَا هُوَ الغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ»

‘কারণ, এটা (কুরআনে বর্ণিত) সেই অস্তগামী, যখন তা অন্ধকার হয়ে যায়।’[১১৪]

ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করলে তাতে থাকা কল্যাণ ও যে কল্যাণ দিয়ে তাকে প্রেরণ হয়েছে, তা প্রার্থনা করতে হয়। আর তাতে থাকা অকল্যাণ ও যে অকল্যাণ দিয়ে তাকে প্রেরণ করা হয়েছে, তা থেকে পানাহ চাইতে হয়।[১১৫] ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকলে বা মেঘ দেখলে নবি ﷺ-এর চেহারা পাল্টে যেত। পায়চারী করতে থাকতেন তিনি। অবশেষে বৃষ্টি নামলে তিনি খুশি হয়ে যেতেন। বলতেন,

«قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ، فَقَالُوا: {هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا}»

‘কোনো কোনো জাতিকে ঝড়ো হাওয়া দিয়ে আযাব দেওয়া হয়েছে। এক সম্প্রদায় আযাব দেখতে পেয়ে বলেছিল, এই মেঘ আমাদের বৃষ্টি বর্ষণ করবে।’[১১৬]

সিক্ত মেঘমালা, উত্তম বাতাস এবং প্রয়োজনমতো বৃষ্টির মতো রহমতের মাধ্যম দিয়ে বান্দাকে আশান্বিত করে তোলা হয়। এজন্যই বৃষ্টি বর্ষণের সময় দুআ করতে হয়, ‘ইয়া আল্লাহ! রহমতের বৃষ্টি দিন; আযাবের বৃষ্টি দেবেন না।’

পক্ষান্তরে ক্ষতির মাধ্যম সংঘটিত হওয়ার পর, এথেকে বাঁচার জন্য নিষিদ্ধ উপকরণের দ্বারস্থ হওয়ার মাধ্যমে কোনো উপকারই হয় না। অশুভ লক্ষণ থেকে বাঁচতে মানুষ যা প্রত্যাখ্যান করে, অধিকাংশ সময় সেটাই তাকে পেয়ে বসে। যেমনটা পূর্বে ইবনু মাসউদ ﵁-এর বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[১১৪] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৩৩১৬

[১১৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৮৯৯

[১১৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৮৯৯; সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৪৮২৯; আয়াতটি সূরা আহকাফ, ৪৬ : ২৪

জাহিলি যুগের বিশ্বাস খণ্ডন

'পেঁচার মধ্যেও কোনো ধরনের অশুভ কিছু নেই।' এ কথাটি জাহিলি যুগের একটি বিশ্বাসের খণ্ডন। সে যুগে লোকদের বিশ্বাস ছিল, কোনো লোক মারা গেলে তার আত্মা বা হাড় পেঁচায় পরিণত হয়। এটা পুনর্জন্মে বিশ্বাসীদের মতোই একটি বিশ্বাস। যাদের ধারণা, মৃতদের আত্মার কোনো রকম পুনরুত্থান ঘটবে না। বরং তা কোনো পশুর দেহে স্থানান্তরিত হবে। এসব অলীক বিশ্বাসের দাফন এবং অস্বীকৃতি জ্ঞাপনেরো জন্যই ইসলামের আগমন ঘটেছে। তবে ইসলাম বলে, 'শহীদের রুহগুলো সবুজ পাখির পেটে রক্ষিত থাকে। তারা জান্নাতের ফলমূল খায় এবং জান্নাতে বিচরণ করে। অবশেষে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ সেই রুহগুলোকে তাদের দেহে ফিরিয়ে দেবেন।'[১১৭]

হাদীসে উল্লিখিত 'সফরে কোনো কুলক্ষণ নেই'—এর ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। পূর্ববর্তী অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, 'সফর' হলো পেটের পীড়া। বড় বড় কৃমিকে বলা হয় 'সফর'। জাহিলি লোকদের বিশ্বাস ছিল, এটা একজন থেকে আরেকজনে সংক্রমিত হয়। তাই নবি ﷺ এ বিশ্বাসের খণ্ডন করেছেন।

আরেক দলের মতে ,'সফর' দ্বারা 'সফর মাস' উদ্দেশ্য। এ ব্যাখ্যা হিসেবেও মুহাদ্দিসগণ একাধিক মত দিয়েছেন। কারও মতে, এখানে জাহিলি যুগের মাস পিছিয়ে দেওয়া কার্যক্রমের খণ্ডন করা হয়েছে। সে-সময় কাফিররা মুহাররম মাসের স্থলে সফর মাসকে সম্মানিত বানিয়ে নিয়েছিল। ইমাম মালিক ؒ এই মতের প্রবক্তা।

কেউ কেউ বলেছেন, জাহিলি যুগের লোকেরা সফর মাসকে অশুভ মনে করত। তারা বলত, সফর একটি অশুভ মাস। তাই নবি ﷺ তাদের এ ধারণা খণ্ডন করেছেন। এ মতটি মুহাম্মাদ ইবনু রাশিদ মাকহুলি ؒ থেকে আবূ দাঊদ ؒ বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় মতটিই সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অনেক মূর্খই সফর মাসকে অশুভ মনে করে। এ মাসে সফর করতে নিষেধ করে থাকে। সফর মাসকে অশুভ মনে করা নিষিদ্ধ লক্ষণের পর্যায়ভুক্ত। যেমন অনেকে বুধবারের মতো নির্দিষ্ট কোনো দিনকে অশুভ মনে করে।

[১১৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৮৮৭

জাহিলি যুগে শাওয়াল মাসে বিবাহ করা অশুভ মনে করা হতো। কোনো এক শাওয়ালে মহামারির প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে অনেক নববধূর মৃত্যু ঘটে। তখন থেকেই জাহিলি যুগের লোকেরা এই মাসকে অশুভ ভাবতে শুরু করে। ইসলাম এই মন্দরীতির অবসান ঘটায়।

আয়িশা ﵂ বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শাওয়াল মাসে বিয়ে করেছেন এবং শাওয়াল মাসে আমার সাথে তাঁর বাসর হয়। রাসূলের কোন স্ত্রী আমার চেয়ে বেশি ভাগ্যবান ছিলেন?' আয়িশা ﵂ তাঁর বংশের মেয়েদেরকে শাওয়াল মাসে বাসরঘরে পাঠানো পছন্দ করতেন।

মোটকথা, অশুভ বা খারাবি তো শুধু আল্লাহর নাফরমানি ও গুনাহের মধ্যে। এটা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। আর যে বান্দার প্রতি আল্লাহ নারাজ হন, উভয় জগতে সে চূড়ান্ত হতভাগা। বিপরীতে আল্লাহ যার ওপর সন্তুষ্ট, সে তো দোজাহানে কামিয়াব।

জনৈক বুযুর্গের কাছে লোকেরা বিপদের অভিযোগ করল। তিনি তখন বললেন, 'আমার মনে হয়, তোমাদের এ দুর্দশা তোমাদের গুনাহের অশুভ প্রভাবের কারণেই হয়েছে।'

আবূ হাযিম ﵀ বলেছেন, 'পরিবার-পরিজন, ধনসম্পদ বা অন্যকিছু—যে জিনিসই মানুষকে আল্লাহবিমুখ করে তোলে, সেটাই অশুভ।'

সুতরাং গুনাহ আর অবাধ্যতাই হলো প্রকৃত খারাবি। বিপরীতে, আল্লাহর আনুগত্য আর তাকওয়াই হলো সাফল্য। নাফরমানি এমন এক সংক্রামক ব্যাধি, যার কাছাকাছি হলে ধ্বংস সুনিশ্চিত। যে ব্যক্তি নাফরমানির নিকটবর্তী হয়, নাফরমানের সাথে চলাফেরা করে, তার ধ্বংস নিশ্চিত। নাফরমানিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনকারী মানুষ তো শয়তান থেকেও ক্ষতিকর।

জনৈক সালাফ বলেছেন, 'আসল শয়তান তো আউযুবিল্লাহ শুনলেই পালিয়ে যায়। কিন্তু মানব শয়তান নাফরমানিতে লিপ্ত করিয়ে, তবেই ক্ষান্ত হয়।'

নবি ﷺ বলেছেন,

«الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ»

'ব্যক্তি তাঁর বন্ধুর রীতি-নীতির অনুসরণ করে থাকে। কাজেই তোমাদের

দেখা উচিত, কার সাথে বন্ধুত্ব করছ।[১১৮]

নবি ﷺ আরও বলেছেন,

«لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ.»

'মুমিন ছাড়া অন্য কারো সাথি হয়ো না। আর মুত্তাকী ছাড়া অন্য কেউ যেন তোমার খাবার না খায়।'[১১৯]

মোটকথা, গুনাহগার ব্যক্তি নিজের জন্য এবং অপরের জন্য অমঙ্গল বয়ে আনে। কারণ হতে পারে তার ওপর আল্লাহর এমন কোনো আযাব আসলো, যাতে অন্যরাও আক্রান্ত হবে। বিশেষ করে এমন লোকেরা তো অবশ্যই আক্রান্ত হবে, যারা তার কাজকে অপছন্দ করেনি। এ কারণেই তার থেকে দূরত্ব অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। কারণ অন্যায় ছড়িয়ে পড়লে মানুষ সাধারণত ধ্বংস হয়ে যায়।

তদ্রুপ নাফরমানি এবং শাস্তির স্থান থেকে দূরত্ব অবলম্বন করা এবং আযাব আসার ভয়ে সেখান থেকে দ্রুত সরে যাওয়া আবশ্যক। সামূদ জাতির অঞ্চল হিজর নামক স্থান অতিক্রম করার সময় নবিজি ﷺ সাহাবিদের বলেছিলেন,

«لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ.»

'তোমরা এসব আযাবপ্রাপ্ত কওমের লোকালয়ে কাঁদতে কাঁদতে অবস্থাতে প্রবেশ করো। কান্না না এলে সেখানে প্রবেশ করা হতে বিরত থেকো। যাতে তাদের ওপর আপতিত হওয়া আযাব, তোমাদের ওপর না আসে।'[১২০]

একশজন লোককে হত্যা করেছিল বানী ইসরাইলের ব্যক্তি। এক আলিমের কাছে সে জানতে চাইল, তার তাওবার কোনো সুযোগ আছে কি না। আলিমটি তখন হাঁ-বাচক উত্তর দিয়ে লোকটিকে মন্দ এলাকা ছেড়ে উত্তম এলাকাতে চলে যেতে বললেন। পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়ে গেল। আযাব এবং রহমত—উভয় দলের ফেরেশতারা তাকে নিয়ে যেতে উপস্থিত হলেন। আল্লাহ তাআলা তখন লোকটির মৃত্যুস্থান থেকে এলাকা দুটির দূরত্ব মেপে দেখতে বললেন। মাপলে দেখা গেল, উত্তম এলাকার দিকে সে একটু বেশি এগিয়ে রয়েছে। তখন তাকে ক্ষমা করে

---

[১১৮] আবূ দাউদ, আসসুনান, হাদীস নং : ৪৮৩৩; তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ২৩৭৮

[১১৯] আবূ দাউদ, আসসুনান, হাদীস নং : ৪৮৩২; তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ২৩৯৫

[১২০] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৪৩৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৯৮০

দেওয়া হলো।[১২১]

নাফরমানির স্থান বর্জন করা শারীআ কর্তৃক আদিষ্ট হিজরতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় বর্জনকারী ব্যক্তিই প্রকৃত মুহাজির।

ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﷺ বলেছেন, 'তাওবা করতে চাইলে অন্যায়ের স্থান ত্যাগ করতে হবে এবং বর্জন করতে হবে পরিচিতজনদের সঙ্গ। অন্যথায় কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য হাসিল হবে না।'

সুতরাং গুনাহ ছাড়ুন। কারণ গুনাহ অমঙ্গলজনক, এর পরিণতি নিন্দনীয় এবং শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক। গুনাহের প্রতি আকর্ষণ রাখে এমন অন্তর অসুস্থ। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারা এক বিরাট সুযোগ। এই সুযোগ অমূল্য। গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়া, বিশেষ করে যদি সেটা বৃদ্ধ বয়সে হয়, তবে তা বড় রকমের দুর্ঘটনা।

যে ব্যক্তির হৃদয় হারিয়ে গেছে, তার উচিত যিকরের মাজলিসে গিয়ে তা খোঁজ করা। আশা করা যায়—সেখানে পাওয়া যাবে। অসুস্থ অন্তরের চিকিৎসার জন্যও যিকরের মাজলিসে যাওয়া উচিত।

যিকরের মাজলিসগুলো গুনাহের নিরাময়কেন্দ্র। দুনিয়ার হাসপাতালে হয় দৈহিক রোগের চিকিৎসা, আর যিকরের মজলিসে অন্তরের ব্যধির চিকিৎসা। দুনিয়াবাসীদের দৃষ্টি যেমন খেলাধুলা আর ঘোরাফেরাতে পুলকিত হয়, মুমিনের অন্তর তেমনি হিকমাতপূর্ণ কথায় আনন্দ লাভ করে।

---

[১২১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭৬৬

রবিউল আউয়াল মাসে পালনীয়

প্রথম পর্ব : নবি ﷺ-এর জন্মের আলোচনা

ইরবায ইবনু সারিয়া رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«إِنِّي عِنْدَ اللهِ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ، دَعْوَةِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةِ عِيسَى قَوْمَهُ، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ، وَكَذَلِكَ تَرَى أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ.»

'আমি তো আল্লাহর কাছে লাউহে মাহফুযে সর্বশেষ নবি হিসেবে ছিলাম, যখন আদম মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন। তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা আমি দিচ্ছি। অর্থাৎ আমার বাবা ইবরাহীমের দুআ, নিজ সম্প্রদায়কে দেওয়া ঈসার সুসংবাদ এবং আমার মা দেখেছিলেন—তার থেকে একটি আলোকরশ্মি বের হয়ে শামের প্রাসাদগুলো আলোকিত করে দিয়েছে। আসলে নবিগণের মায়েরা এমনটাই দেখে থাকেন।'[১২২]

হাদীসটির উদ্দেশ্য হলো এ কথা বোঝানো যে, নবি ﷺ দুনিয়াতে আসার আগেই তাঁর নুবুওয়াত ছিল আলোচিত এবং সুপরিচিত। সেটা লাউহে মাহফুযে লিখে রাখা ছিল। আদম عليه السلام-এর শরীরে রূহ ফুঁকে দেওয়ার অনেক আগেই।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»، قَالَ: «وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ.»

[১২২] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ১৭১৬৩

‘আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির তাকদীর লিখেছেন।’ তিনি বলেছেন, ‘সে সময় আল্লাহর আরশ ছিল পানির ওপরে।’[১২৩]

লাউহে মাহফুযে এটাও লেখা ছিল যে, মুহাম্মাদ সর্বশেষ নবি। আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ، يَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا، إِلَّا هَذِهِ اللَّبِنَةَ، فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةَ.»

‘আমার তুলনা এবং আমার পূর্ববর্তী নবিদের তুলনা এমন ব্যক্তির মতো, যে একটি চমৎকার ও সুদৃশ্য প্রসাদ নির্মাণ করেছে। পরে (তা দেখতে আসা) লোকেরা সেটি ঘুরে ঘুরে দেখে মুগ্ধ হয়ে বলতে লাগল,এমন চমৎকার ভবন আমরা আর দেখিনি। তবে একটি ইটের জায়গা অসমাপ্ত রয়ে গেছে। আমি হলাম সেই ইট।’[১২৪]

অন্য বর্ণনামতে নবি ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ.»

‘আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবিগণের অবস্থা এমন এক ব্যক্তির মতো, যে একটি ভবন নির্মাণ করল। সেটাকে সুশোভিত আর সুসজ্জিত করল। কিন্তু এক কোনায় একটি ইটের জায়গা খালি রয়ে গেল। তারপর লোকেরা এর চারপাশে ঘুরে বিস্ময়ের সাথে বলতে লাগল—ওই ইটটি লাগানো হলো না কেন?’ নবি ﷺ বলেন, ‘আমিই সেই ইট। আর আমিই সর্বশেষ নবী।’[১২৫]

ইরবায ﵁ বর্ণিত হাদীসটির মাধ্যমে আহমাদ ﵀ প্রমাণ করেছেন, নবিজি ﷺ জন্ম থেকেই তাওহীদে বিশ্বাসী। পাশাপাশি এর বিপরীত দাবি পোষণকারীদের মতও তিনি খণ্ডন করেছেন। হাদীস থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, নবিজি ﷺ জন্ম

---

[১২৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৬৫৩

[১২৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২২৮৬

[১২৫] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৩৫৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২২৮৬

থেকেই নবি ছিলেন। কারণ আদম ﷺ-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করার সময়ই তাঁর নবুওয়ত সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তার মানে তখন থেকেই তিনি নবি ছিলেন। তবে দুনিয়াতে তাঁর আগমন ঘটেছে দেরিতে। কিন্তু এই বিলম্ব তাঁর নবি হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। যেমন কাউকে শাসনক্ষমতা প্রদান করা হলো, কিন্তু তাতে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা দেওয়া হলো ভবিষ্যতে। ক্ষমতা প্রাপ্তির সাথে সাথে সে ব্যক্তি শাসক হয়ে গেল বটে, কিন্তু নির্ধারিত সময় আসার পরেই কেবল সে কর্তৃত্ব দেখাতে পারবে।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর নুবুওয়াতের প্রমাণ

নবি ﷺ নিজের নাম, নুবুওয়াত এবং দুনিয়াতে আগমনের মর্যাদা বিশেষভাবে উল্লেখ করার পর, তিনটি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। 'তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা আমি দিচ্ছি' বলে এটাই উদ্দেশ্য।

প্রথম প্রমাণ : পিতা ইবরাহীম ﷺ-এর দুআ

নবি ﷺ কুরআনে আলোচিত ইবরাহীম এবং ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম-এর দুআর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যা তাঁরা মক্কাতে কাবা নির্মাণের সময় করেছিলেন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুজনকে আপনার একান্ত অনুগত বানিয়ে দিন এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি করুন। আমাদেরকে ইবাদাতের পদ্ধতি দেখিয়ে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতগুলো তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবে এবং

তাদের পবিত্র করবে। আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[১২৬]

আল্লাহ তাঁদের দুজনের দুআ কবুল করেছেন। মক্কাবাসীদের মাঝে তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যাঁর মাঝে উল্লিখিত গুণাবলি পাওয়া যায়। যিনি ছিলেন বাবা ইবরাহীম ﷺ-এর দুআর সঙ্গী ইসমাঈল ﷺ-এর বংশোদ্ভূত। তাঁদের দুআয় উল্লিখিত গুণাবলি-সহ নবিজিকে প্রেরণ করাটা, মুমিনদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

'আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। যিনি তাঁর আয়াতগুলো তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন। অবশ্য আগে তারা সুস্পষ্ট বিভ্রান্ত ছিল।'[১২৭]

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣﴾ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٤﴾

'তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত। এর আগে তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে; এবং (এ রাসূল প্রেরিত হয়েছেন) তাদের অন্যান্যের জন্যও, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন। আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল।'[১২৮]

---

[১২৬] সূরা বাকারাহ, ২ : ১২৭-১২৯

[১২৭] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৬৪

[১২৮] সূরা জুমু'আহ, ৬২ : ২-৪

এটা জানা কথা যে, মক্কাতে এই সব গুণাবলি নিয়ে মুহাম্মাদ ﷺ ছাড়া অন্য কোনো রাসূল প্রেরিত হননি। অন্যান্য নবিগণ ইসহাক ﷺ-এর বংশোদ্ভূত ছিলেন। কিন্তু নবিজি ছিলেন ইসমাঈল ﷺ-এর বংশের।

এই রাসূল মুমিনদের জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। সুতরাং সত্য এবং সরল পথের দিশারি মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রেরণ করাই হলো আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামাত।

⇨ 'নিরক্ষরদের মাঝে' বলে আল্লাহ আরবদের বুঝিয়েছেন। এটা হলো মহা নিয়ামাতের মূল্যায়ন সম্পর্কে সতর্কবার্তা। কেননা, নিরক্ষর হওয়ার কারণে তাদের না আছে কোনো কিতাব, আর না আছে কিতাবিদের মতো নুবুওয়াতের কোনো নিদর্শন। এমন পরিস্থিতিতে এই রাসূল এবং এই কিতাবের মাধ্যমে আল্লাহ তাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। ফলে তারা সর্বোত্তম এবং সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী জাতিতে পরিণত হয়েছে। তারা জানতে পেরেছে পূর্ববর্তী উম্মাতের বিভ্রান্তির কারণ।

নবি ﷺ-এর আরাবি হওয়ার উপকারিতা

নবি ﷺ প্রেরিত হয়েছিলেন এর আরবে। ফলে দুটি উপকার হয়েছে।

প্রথমত, স্বগোত্রের মতো রাসূলও ছিলেন নিরক্ষর। না কোনো বই পড়তে পারতেন, আর না লিখতে জানতেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

'আপনি তো এর আগে কোনো কিতাব পাঠ করেননি। এবং নিজ হাতে কোনো কিতাব লিখেনওনি যে মিথ্যাচারীরা সন্দেহ করবে।'[১২৯]

স্বজাতি থেকে দূরে গিয়ে কোথাও লেখাপড়া শিখেছেন, এমনটাও হয়নি। বরং নিরক্ষর জাতির মাঝে নিরক্ষর থেকেই তিনি চল্লিশ বছর কাটিয়েছেন। এরপর নিয়ে এসেছেন এই সুস্পষ্ট কিতাব, এই উজ্জ্বল শারীআ এবং সঠিক দ্বীন। পৃথিবীর বাঘা-বাঘা এবং বিচক্ষণ সব ব্যক্তিরা স্বীকার করে নিয়েছে যে, পৃথিবীতে এটাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এর মাধ্যমেই তাঁর সত্যতার প্রমাণ মিলে।

দ্বিতীয়ত, মক্কাবাসীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, প্রেরিত রাসূলের বংশ, আভিজাত্য, সত্যতা, বিশ্বস্ততা এবং চারিত্রিক নিষ্কলুষতা সবই তাদের জানা। এসব গুণ নিয়েই তিনি আরবে বড় হয়েছেন। তিনি জীবনেও মিথ্যা বলেননি। যে

---

[১২৯] সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৪৮

ব্যক্তি কখনো মানুষের নামে মিথ্যা বলেনি, সে আল্লাহর নামে কীভাবে মিথ্যা রটনা করতে পারে? এটা নিতান্তই অসার দাবি। এসব গুণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল হিরাকল। এর দ্বারা প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল যে, নুবুওয়াত এবং রিসালাত সত্য।

⇨ 'যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন' এর অর্থ হলো, তাদের কাছে আল্লাহর নাযিলকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব কুরআন তিলাওয়াত করেন। এই কিতাবে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ইলম, হিকমাত, উপদেশ, ঘটনাবলি, আশা ও ভয়, অতীতে ঘটেছে এমন সংবাদ। পাশাপাশি কিয়ামাত, পুনরুত্থান, জান্নাত এবং জাহান্নামের মতো ভবিষ্যতে ঘটবে, এমন সব বিষয়ের আলোচনাও রয়েছে। এটি এক অনন্য কিতাব। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

'এটা কি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, আপনার প্রতি আমি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে তিলাওয়াত করা হয়?'[১৩০]

সুতরাং মুহাম্মাদ ﷺ-এর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ অন্য কিছু না থাকলেও, স্রেফ এ কিতাবই যথেষ্ট। সেখানে আকাশ এবং পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে তাঁর অগণিত মুজিযা।

⇨ 'তাদের পবিত্র করেন' অর্থ তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করেন এবং শিরক, পাপ ও বিভ্রান্তির পঙ্কিলতা সাফ করেন।

⇨ 'এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত' এখানে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন। আর হিকমাত দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআনের মর্ম অনুধাবন এবং সে অনুযায়ী আমল। হিকমাত দ্বারা সুন্নাহও উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ, সুন্নাহ তো কুরআনের ব্যাখ্যা। সুন্নাহ কুরআনের অর্থকে স্পষ্ট করে তোলে। এর অনুসরণ ও তদনুযায়ী আমলে উদ্‌বুদ্ধ করে। আর তাই, শুধু তিলাওয়াতই যথেষ্ট নয়; বরং তার অর্থ জানা এবং তদনুযায়ী আমল করা জরুরি। এই সবগুলোর সমন্বয় ঘটেছে যার মাঝে, সে হিকমাত প্রাপ্ত হয়েছে। আর আল্লাহ্ বলেন,

يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

'তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে হিকমাত প্রদান করেন। আর যাকে

[১৩০] সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৫১

হিকমাত প্রদান করা হয়েছে, বস্তুত তাকে প্রভূত কল্যাণ করা হয়েছে।'[১৩১]

⇨ 'এর আগে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে' বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে কুরআন নাযিল হওয়ার আগে মানুষ ছিল বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। কিতাবের প্রকৃত অনুসারী মুষ্টিমেয় ক'জন ছাড়া আরব-অনারবের সবাই তখন আল্লাহর ক্রোধের পাত্র।

ইমাম আহমাদ ﷺ-কে তাঁর মৃত্যুর পরে কেউ স্বপ্নে দেখে কুশল জানতে চাইল। উত্তরে তিনি বললেন, 'এই নবি না থাকলে তো আমরা অগ্নিপূজক হয়ে যেতাম।' আসলেও বাস্তবতা এটাই। নবি ﷺ প্রেরিত না হলে ইরাকের লোকেরা হতো অগ্নিপূজক। সিরিয়া, মিশর এবং রোমের লোকেরা হতো খ্রিষ্টান। আর আরব উপদ্বীপের লোকেরা হয়ে যেত পৌত্তলিক। বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ۝١٠٧

'আপনাকে তো আমি বিশ্বজাহানের জন্যে রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।'[১৩২]

এটাই হলো আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাখ্যা—

ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ۝٤

'এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন। আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল।'[১৩৩]

দ্বিতীয় প্রমাণ : ঈসা ﷺ-এর সুসংবাদ

ঈসা ﷺ ছিলেন বানী ইসরাইলের সর্বশেষ নবি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذۡ قَالَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُم مُّصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَمُبَشِّرَۢا بِرَسُولٖ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِي ٱسۡمُهُۥٓ أَحۡمَدُۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ قَالُواْ هَٰذَا سِحۡرٞ مُّبِينٞ ۝٦

[১৩১] সূরা বাকারাহ, ২ : ২৬৯
[১৩২] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ১০৭
[১৩৩] সূরা জুমু'আহ, ৬২ : ৪

'আর যখন মারইয়ামের পুত্র ঈসা বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল। আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন। যার নাম আহমাদ। অতঃপর সে যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল, এটা তো স্পষ্ট যাদু।'[১৩৪]

তৃতীয় প্রমাণ : আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর নিদর্শন

নবি ﷺ-এর মা দেখেছিলেন, তার থেকে একটি আলোকরশ্মি বের হয়ে শামের প্রাসাদগুলো আলোকিত করে দিয়েছে। নবি ﷺ বলেছেন, আসলে নবিগণের মায়েরা এমনটাই দেখে থাকেন। এই দেখা স্বপ্নেও হতে পারে। বর্ণিত আছে, নবিজিকে গর্ভে ধারণের প্রথম দিকে আমিনাকে এ সুসংবাদ দেয়া হয় যে, তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় একটি আলোকরশ্মি বের হবে। যার মাধ্যমে শামের প্রাসাদগুলোও আলোকিত হয়ে যাবে। এই দেখা আবার বাস্তবেও দেখা হতে পারে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِىٓ أَرَيْنَٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

'আপনাকে যে দৃশ্য আমি দেখিয়েছি, তা ছিল কেবল মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য।'[১৩৫]

এই আয়াত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস ﵁ বলেছেন, 'মিরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যেসব চাক্ষুষ নিদর্শন দেখানো হয়েছে, এখানে তার কথা বলা হচ্ছে। নবিজি ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় আমিনাও তাই দেখেছিলেন।'

আলোকরশ্মির মাধ্যমে সে নুরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে পৃথিবীবাসী সঠিক পথের দিশা পাবে। আর শিরকের অন্ধকার কেটে যাবে। যেমনটা আল্লাহ বলেন,

يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

'অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব

[১৩৪] সূরা সাফ, ৬১ : ৬

[১৩৫] সূরা ইসরা, ১৭ : ৬০

এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে। এবং তাঁর অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন আর তাদেরকে সরল–সঠিক পথে পরিচালিত করেন।"[১৩৬]

فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥٧

'সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে সম্মান করে, তাঁকে সাহায্য করে এবং তাঁর সাথে নাযিল হওয়া নুরের অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম।'[১৩৭]

ভাইয়েরা! এই উম্মাতের প্রতিটি সদস্যই আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

'তোমরা হলে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানুষের কল্যাণে যাদের আবির্ভাব হয়েছে।'[১৩৮]

নবি ﷺ বলেছেন,

«أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ»

'তোমাদের দ্বারা সত্তর উম্মাত পূর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে তোমরা শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাবান।'[১৩৯]

এ উম্মাতের প্রথম যুগের লোকেরা সর্বশ্রেষ্ঠ। যেমনটা নবি ﷺ বলেছেন,

«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»

'আমার যুগের লোকেরা সর্বোত্তম লোক, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী যুগের।'[১৪০]

---

[১৩৬] সূরা মায়িদা, ৫ : ১৫-১৬

[১৩৭] সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৭

[১৩৮] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১১০

[১৩৯] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ২০০১৫, হাসান; তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৩০০১

[১৪০] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ২৬৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৫৩৩

কুরআনে সাহাবিদের প্রশংসায় অনেক আয়াত এসেছে। যেমন,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সঙ্গে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।'[১৪১]

لَّقَدْ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ

'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা গাছের নীচে আপনার কাছে বায়আত গ্রহণ করল।'[১৪২]

তবে তাদের মধ্যে আবূ বকর ﵁-কেই কেবল সঙ্গী বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ

'সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, বিষণ্ণ হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।'[১৪৩]

উম্মাতের মধ্যে কোথায় আবূ বকরের মতো ব্যক্তিত্ব? কোথায় উমার, যাঁকে চলতে দেখলে শয়তান রাস্তা ছেড়ে পালাত? উসমানের মতো কঠিন বিপদে ধৈর্যশীলরা কোথায়? কোথায় আলির মতো ইলমের গভীর সাগর? আছে কি হামযা এবং আব্বাস? আছে কি তালহা এবং যুবাইরের মতো দুই বন্ধু? অথবা সাদ এবং সাঈদের মতো সাথি? নাহ, কোথায় ইবনু আউফ এবং আবূ উবাইদার মতো লোক? কে আছে এই দুজনের মতো? আছেন কি উয়াইসের মতো দুনিয়াবিরাগী? অথবা আমির ইবনু আবদি কাইসের মতো ইবাদাতগুজার? কিংবা উমার ইবনু আবদিল আযীযের মতো আল্লাহভীরু? নাহ, সূর্যের আলো তো অগ্নিশিখার মতো নয়।

উম্মাতের আলিমদের মাঝে কি আবূ হানীফা, মালিক এবং শাফিয়ির মতো সঠিক মতের অনুসারী আছে?

কীভাবে তাদের প্রশংসা করব, অথচ প্রশংসার অনেক ঊর্ধ্বে তার অবস্থান। তাক-লাগানো তার ভবন এবং ভিত্তি!

---

[১৪১] সূরা ফাতহ, ৪৮ : ২৯

[১৪২] সূরা ফাতহ, ৪৮ : ১৮

[১৪৩] সূরা তাওবা, ৯ : ৪০

হাসান বসরি ﵀ থেকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং সম্ভ্রান্ত কেউ কি আছে? অথবা ইবনু সীরীনের মতো পরহেজগার? সুফইয়ান সাওরির মতো ইলমসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব? আহমাদের মতো আত্ম-নিবেদনকারী? আল্লাহর কসম! উম্মাতের মধ্যে আহমাদ ইবনু হাম্বলের মতো কেউ নেই। এ কথা উচ্চস্বরে নিঃসংকোচে বলতে পারো।

দ্বিতীয় পর্ব : নবি ﷺ-এর জন্মের আলোচনা

আবূ কাতাদা আনসারি ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ-এর কাছে সোমবারের সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন,

«فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ»

'এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনে আমার ওপর (কুরআন) নাযিল হয়েছে।'[১৪৪]

সোমবারে নবি ﷺ-এর জন্মের বিষয়ে আলিমদের প্রায় সবাই একমত। ইবনু আব্বাস ﵁-সহ অন্যরা এমনটাই বলেছেন। তবে তাঁর জন্ম কোন মাসে হয়েছিল, সেটা নিয়ে ইখতিলাফ আছে। আবদুল্লাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণিত আছে যে, সেটা ছিল রমাদান মাস। এর সনদ সহীহ নয়। কেউ কেউ রজব মাসের কথা বলেছে। সেটাও সঠিক নয়। আরেকটি মত হলো, রবিউল আউয়াল মাস। মানুষের মাঝে এটাই প্রসিদ্ধ। ইবনুল জাউযি ﵀-সহ অন্যরা এ ব্যাপারে ইজমার কথা বললেও, সেটা মূলত অধিকাংশ আলিমের মত।

এরপর ইখতিলাফ হয়েছে দিন নিয়ে। কেউ বলেছেন, দিনটি অজ্ঞাত। রবিউল আউয়াল মাসের সোমবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তবে তারিখটি অজানা। অধিকাংশ আলিমের মতে তা সুনির্দিষ্ট দিন। তবে কোন দিন, সে বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে। কারও মতে ২ তারিখ, কারও মতে ৮, কারও মতে ১০, কারও মতে ১২। আবার ১৭ তারিখের কথাও বলেছেন অনেকে। তবে প্রসিদ্ধ যে তারিখটি অধিকাংশ আলিম বলেছেন, সেটি হলো ১২ তারিখ। ইবনু ইসহাক ﵀-সহ অন্যদের মত এটাই।

---

[১৪৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৬২

অধিকাংশ আলিমের মতে তাঁর জন্মের বছর ছিল হস্তীবর্ষ। প্রসিদ্ধ মতানুসারে, হস্তীবাহিনীর ঘটনার ৫০ দিন পরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ ৫৫ দিন, কেউ কেউ বলেছেন, ১ মাস পরে আর কেউ কেউ ৪০ দিন পরের কথা বলেছেন।

ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আলহিযামি ﷺ বলেছেন, 'আলিমদের সবাই এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, নবি ﷺ হস্তীবর্ষেই জন্মগ্রহণ করেন।' খলিফা ইবনু খাইয়াত এটাকে ইজমা বলেছেন। মূলত হস্তীবাহিনীর ঘটনা ছিল নুবুওয়াতের পূর্বাভাস। তিনি যে আবির্ভূত হতে চলেছেন এবং সত্বরই যে তাঁর আগমন ঘটবে, এটা ছিল তার ভূমিকা। কুরআনে আল্লাহ সেটারই বর্ণনা দিয়েছেন।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ ۝١ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ ۝٢ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝٣ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍۭ ۝٥

'আপনি কি দেখেননি, আপনার প্রতিপালক হস্তীবাহিনীর সাথে কী করেছেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছিলেন, যারা তাদের ওপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। তারপর তিনি তাদেরকে করে দেন ভক্ষিত তৃণের মতো।'[১৪৫]

⇨ 'আপনি কি দেখেননি' এটা হলো শ্রোতার উদ্দেশ্যে সম্মতিসূচক প্রশ্ন। যা থেকে বোঝা যায়, এটি প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা। আরবের সবাই, বিশেষত কুরাইশ এবং মক্কাবাসী ছিল এ ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

মক্কা এবং কাবার সম্মানার্থে নবিজির আবির্ভাব

হস্তীবাহিনীর ঘটনার মাধ্যমে মক্কা নগরীর গুরুত্ব এবং সেখানে থাকা বাইতুল্লাহর সম্মান প্রমাণিত হয়। নবি ﷺ-এর জন্ম, তাঁর নুবুওয়াত ও রিসালাতের প্রমাণ। কারণ তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন এ গৃহের সম্মান রক্ষা, এখানে হাজ্জ এবং সালাত কায়েমের জন্য। এ নগরী ছিল তাঁর জন্মভূমি। দাওয়াতি কাজে স্বজাতির পক্ষ থেকে বাধা ও অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে, দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। পরে আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান করলে তিনি বলপূর্বক সেখানে প্রবেশ করেন। শক্তি প্রয়োগ করে লাভ করেন নগরী এবং সেখাকার লোকদের কর্তৃত্ব। এরপর তিনি দয়াবশত তাদেরকে

[১৪৫] সূরা ফীল, ১০৫ : ১-৫

ক্ষমা ও মুক্ত করে দেন। এই নগরীর ওপর নবি ﷺ-এর কর্তৃত্ব বিস্তার, মালিকানা লাভ এবং পরবর্তী সময়ে উম্মাতের হাতে এর শাসন ন্যস্ত হওয়া—এগুলো নবি ﷺ-এর নুবুওয়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ, যালিমদের ধ্বংস করে নবি ﷺ এবং তাঁর উম্মাতের হাতে কর্তৃত্ব তুলে দিয়েছেন আল্লাহ। যেমনটা নবি ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ»

'অবশ্যই আল্লাহ মক্কা থেকে হস্তীবাহিনীকে রুখে দিয়েছেন। এবং তাদের বিরুদ্ধে তাঁর রাসূল ও মুমিনদের কর্তৃত্ব দান করেছেন।'[১৪৬]

নবি ﷺ এবং তাঁর উম্মাতের উদ্দেশ্য ছিল কাবাঘরের সম্মান রক্ষা করা। এজন্যই মক্কা-বিজয়ের দিন রক্তপাত তিনি অপছন্দ করেছেন। তিনি বলেছেন,

«هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الكَعْبَةَ»

'আজকের দিনে আল্লাহ কাবাকে মর্যাদাবান করবেন।'[১৪৭]

জাহিলি যুগের লোকেরা নিজেদের উদ্ভাবিত শিরক দ্বারা ইবরাহীম এবং ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম-এর দ্বীন পরিবর্তন করে ফেলেছিল। হাজ্জের অনেক পদ্ধতি তারা পাল্টে দিয়েছিল। সেই জন্য আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের কর্তৃত্ব প্রদান করেন। তাঁরা আল্লাহর ঘরকে পবিত্র করে পুনরায় দ্বীনি ইবরাহীম এবং তাওহীদের প্রবর্তন করেন। মূলত এর জন্যই কাবাঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে কারামতি শিয়ারা কাবাঘর দখল করে দিয়েছিল। এটা হয়েছিল মানুষের গুনাহের কারণে। তবে তারা কাবাঘর ভেঙে ফেলেনি, মানুষকে হাজ্জ ও যিয়ারত থেকে বাধা দেয়নি। হস্তীবাহিনী সুযোগ পেলে অবশ্য কাবাঘর ভেঙে দিয়ে মানুষকে সেখান থেকে ফিরিয়ে রাখত। কারামতিরা হাজারে আসওয়াদ এবং কাবাঘরের দরজা খুলে নিয়েছিল। হাজিদের খুন এবং তাদের সম্পদ লুট করছিল। কিন্তু মানুষকে সম্পূর্ণরূপে হাজ্জ থেকে বিরত রাখতে এবং কাবা ভেঙে ফেলতে পারেনি। যেমনটা ছিল হস্তীবাহিনীর পরিকল্পনা। এরপর আল্লাহ তাদের স্বরূপ উন্মোচন করে দেন। চূড়ান্তভাবে তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন। মহিমান্বিত গৃহের সম্মান, যিয়ারত, হাজ্জ, উমরাহ এবং সেদিকে ফিরে সালাত আদায়—বহাল তবিয়তেই ছিল। আল্লাহর দয়া আর অনুগ্রহে তা একটুও বিনষ্ট হয়নি। তবে

[১৪৬] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ২৪৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৩৫৫
[১৪৭] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৪২৮০

কারামতিরা ইরাক থেকে আগত হাজিদের ভীত করে তোলে। ফলে তারা কয়েক বছর হাজ্জ পালন করতে আসেনি। এরপর তারা পুনরায় আগমন করতে থাকে।

মুমিন বান্দাদের আল্লাহ সব সময় নানারকম পরীক্ষা করেন। কিন্তু তাঁর দ্বীন সংরক্ষিত এবং টিকে থাকবে। উম্মতে মুহাম্মাদির একটি দল সর্বদাই হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে, কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবে একসময় আল্লাহর আদেশ (কিয়ামাত) এসে পড়বে। আল্লাহ বলেন,

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٣٢﴾ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

‘তারা মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কাফিররা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর নুরের পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া কিছু চান না। তিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত আর সঠিক দ্বীন-সহ পাঠিয়েছেন যাবতীয় দ্বীনের ওপর একে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকগণ তা অপছন্দ করে।’[১৪৮]

নবি ﷺ-এর মদীনাতে প্রবেশ এবং তাঁর ইন্তেকাল সর্বসম্মতিক্রমে রবিউল আউয়ালে মাসেই হয়েছিল। তবে কত তারিখে হয়েছিল, তা নিয়ে মতবিরোধ আছে।

সোমবারে সিয়াম পালন সম্পর্কে জানতে চাইলে নবিজি ﷺ বলেছিলেন, ‘দিনটিতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি।’ এথেকে বোঝা যায়, যেসব দিনে বান্দার প্রতি আল্লাহর নিয়ামাত নবায়িত হয়, সেদিনগুলোতে সিয়াম পালন করা উত্তম।

আকাশ, পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য, রাত, দিন সৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টি বর্ষণ, গাছপালা ইত্যাদি থেকেও বড় নিয়ামাত হলো নবি ﷺ-কে আমাদের মাঝে প্রেরণ। আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিন বান্দার প্রতি এ নিয়ামাত যেদিনে নবায়ন হবে, সেদিন সিয়াম পালন করা হবে বড় চমৎকার কাজ। এটা মূলত নিয়ামাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন।

আশুরার সিয়াম হলো তেমনি আরেকটি শুকরিয়া আদায়। এদিনে আল্লাহ নূহ عليه السلام-কে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। ফিরআউন ও তার বাহিনীকে ডুবিয়ে দিয়ে মূসা عليه السلام ও বানী ইসরাইলকে রক্ষা করেছেন। ফলে নূহ এবং মূসা

[১৪৮] সূরা তাওবা, ৯ : ৩২-৩২

আলাইহিমাস সালাম আল্লাহর শুকরিয়া-স্বরূপ সিয়াম পালন করতেন। নবিদের অনুসরণে আমাদের নবিজিও সিয়াম পালন করতেন। ইয়াহূদিদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন,

«فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ.»

'তাহলে তোমাদের তুলনায় আমরা মূসা ﷺ-এর (অনুসরণের) বেশি উপযুক্ত এবং যোগ্যতর।'[১৪৯]

এরপর তিনি নিজে সেদিন সিয়াম পালন করেছেন। সাহাবিদেরকেও পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার নবি ﷺ সিয়াম পালন করতেন বলে জানা যায়। আয়িশা, আবূ হুরায়রা এবং উসামা ইবনু যায়িদ ﷺ থেকে এমনটাই বর্ণিত আছে। উসামা ইবনু যায়িদ ﷺ নবিজিকে এই দুই দিনের সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। নবি ﷺ তাঁকে জানিয়েছেন,

«ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.»

'দিন দুটিতে বান্দার আমল আল্লাহর সামনে পেশ করা হয়। আমার আকাঙ্ক্ষা, আমার আমল পেশ করার সময় আমি যেন সিয়াম অবস্থায় থাকি।'[১৫০]

জনৈক তাবিয়ি বৃহস্পতিবার স্ত্রীর কাছে কাঁদতে থাকতেন। স্বামীর কান্না দেখে স্ত্রীও কাঁদতেন। তাবিয়ি কাঁদতে কাঁদতে বলতেন, 'আজ আমাদের আমল আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে।'

হে ভাই! তুমি কি নিজের আমলকে সজ্জিত করছ? তবে কার সামনে করছ, সেটাও ভেবে দেখো। পর্যালোচক তোমার আমল পর্যবেক্ষণ করছেন। হে দীর্ঘ আশা পোষণকারী ব্যক্তি! কতদিন এমন দীর্ঘ আশা করবে? তোমার জীবন তো সংক্ষিপ্ত!

---

[১৪৯] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ২০০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৩০

[১৫০] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ২১৭৫৩

তৃতীয় পর্ব : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের আলোচনা

আবূ সাঈদ খুদরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরের ওপর বসে বললেন,

«عَبْدٌ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ زَهْرَةَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ»

'একজন বান্দাকে আল্লাহ ইখতিয়ার দিয়েছেন যে, তাকে পার্থিব সম্পদ দিবেন, নাকি আল্লাহর কাছে যা আছে তা। বান্দাটি তখন আল্লাহর কাছে যা রয়েছে সেটাই বেছে নিয়েছে।'

এ কথা শুনে আবূ বকর رضي الله عنه কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমাদের পিতামাতা আপনার ওপর কুরবান হোক।' বর্ণনাকারী বলেন, আবূ বকরের কথা আর কাজ দেখে আমরা অবাক হলাম। সবাই বলতে লাগল, এই বুড়োর কাণ্ড দেখো। নবিজি তো এমন এক বান্দার কথা বলেছেন, যাকে আল্লাহ ইখতিয়ার দিয়েছেন। আর বুড়ো লোকটি কিনা বলছে, 'আমাদের পিতামাতা আপনার ওপর কুরবান হোক।' আসলে ইখতিয়ার-প্রাপ্ত বান্দাটি ছিলেন স্বয়ং নবিজি। এ ব্যাপারে আবূ বকরই আমাদের সবার চেয়ে জ্ঞানী ছিলেন। এরপর নবি ﷺ বললেন,

«إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ، لَا تُبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ»

'সম্পদ এবং সহবত দিয়ে আমার ওপর সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ করেছে আবূ বকর। আমি কাউকে পরম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলে, আবূ বকরকেই করতাম। কিন্তু ইসলামি ভ্রাতৃত্বই (যথেষ্ট)। মাসজিদে শুধু আবূ বকর ছাড়া অন্য কারো দরজা যেন খোলা না থাকে।'[১৫১]

আসলে নবি-রাসূলসহ জীবিত সকলের জন্যই মৃত্যু অবধারিত। নবি ﷺ-কে আল্লাহ বলেন,

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾

'আপনি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।'[১৫২]

---

[১৫১] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৩৬৬০, সহীহ

[১৫২] সূরা যুমার, ৩৯ : ৩০

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۖ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَٰلِدُونَ ﴿٣٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

'আপনার পূর্বেও কোনো মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে? প্রতিটি প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ এবং ভালো দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।'[১৫৩]

আল্লাহ আরও বলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْـَٔاخِرَةِ نُؤْتِهِۦ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

'মুহাম্মাদ তো একজন রাসূল মাত্র; তাঁর আগে অনেক রাসূল গত হয়েছেন। সুতরাং যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? আসলে কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করবে না; বরং আল্লাহ কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন। আর কোনো প্রাণী আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মারা যায় না। তা নির্দিষ্টভাবে লিখিত আছে। যে দুনিয়ার প্রতিদান চায়, আমি তা থেকে তাকে দিয়ে দিই। আর যে আখিরাতের বিনিময় চায়, আমি তা থেকে তাকেও দিই। আর আমি অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেব।'[১৫৪]

আদম ﷺ-কে আল্লাহ মাটি থেকে সৃষ্টি করে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। আদম ও তাঁর সন্তানদের রুহকে দেহে রেখেছেন কর্জ হিসেবে। আল্লাহ এই ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, দেহ থেকে তাদের রূহ ফিরিয়ে নেওয়া হবে। আর এ দেহকে পূর্বের অবস্থায়, তথা মাটি বানিয়ে দেবেন। আল্লাহ এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন, দেহকে পুনর্গঠন করে আবার তাতে রূহ প্রদান করবেন স্থায়ীভাবে। এরপর আর কখনো সেটা ফিরিয়ে নেওয়া হবে না।

---

[১৫৩] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৩৪-৩৫

[১৫৪] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৪৪-১৪৫

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

'আল্লাহ বললেন, সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের বের করে আনা হবে।'[১৫৫]

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿٥٥﴾

'আমি মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি, সেখানেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব এবং সেখান থেকেই তোমাদের আবার বের করব।'[১৫৬]

وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾

'আল্লাহ তোমাদের উদগত করেছেন মাটি থেকে, তারপর সেখানেই তোমাদের ফিরিয়ে নেবেন এবং পরে পুনরুত্থিত করবেন।'[১৫৭]

আল্লাহ তাআলা জমি থেকে গাছ উৎপন্ন করেন। শুষ্ক ভূমিকে বৃষ্টি দ্বারা সিক্ত করেন। এর মাধ্যমে মাটি থেকে আমাদের দেহ পুনরুত্থিত করার একটি বাস্তব উদাহরণ এই দুনিয়াতেই দেখিয়ে থাকেন। আর দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন করার পর আবার ফিরিয়ে দেওয়ার একটি উদাহরণ হলো, ঘুমের মধ্যে বান্দার রূহ নিয়ে যাওয়া এবং জাগ্রত হওয়ার সময় ফিরিয়ে দেওয়া। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

'আল্লাহই প্রাণীদের মৃত্যুর সময় তাদের প্রাণ হরণ করেন এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণ হরণ করেন ঘুমের সময়। তারপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অন্যগুলো ছেড়ে দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।'[১৫৮]

---

[১৫৫] সূরা আ'রাফ, ৭ : ২৫

[১৫৬] সূরা ত্ব-হা, ২০ : ৫৫

[১৫৭] সূরা নূহ, ৭১ : ১৭-১৮

[১৫৮] সূরা যুমার, ৩৯ : ৪২

দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় যে ভয়াবহ কষ্ট হয়, তা রূহ এবং দেহ সম্মিলিতভাবে অনুভব করে থাকে। কারণ রূহ দেহের সাথে মিলেমিশে থাকে। বাহ্যিকভাবে দেহ এবং রুহের মাঝে তখন কোনো তফাত থাকে না। ফলে রূহের বিচ্ছেদের সময় মানুষ এমন কষ্ট অনুভব করে, জীবনের অন্য কোনো কষ্টের সাথে তার তুলনা হয় না। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِۗ

'প্রতিটি প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।'[১৫৯]

রবি ইবনু খুসাইম ﷺ বলেছেন, 'মৃত্যুর কথা তোমরা বেশি বেশি স্মরণ করো। কারণ এমন স্বাদ তোমরা কখনোই গ্রহণ করোনি।'

যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায় যখন দেহ জানতে পারে যে, বিচ্ছিন্ন হওয়া রূহ তার ঠিকানা জানে না। বলতে পারে না, সে জান্নাতে যাবে নাকি জাহান্নামে যাবে। সে যদি পাপী হয় এবং মৃত্যু অবধি পাপের ওপর থাকে, তাহলে সে প্রবল ধারণা করে যে তার রূহ জাহান্নামে যাবে। ফলে আক্ষেপ এবং যন্ত্রণা দুইই বেড়ে যায়। আবার কখনো জাহান্নামে নিজের আবাসস্থল দেখতে পায়, অথবা এ ব্যাপারে তাকে জানানো হয়। তখন মৃত্যুযন্ত্রণার পাশাপাশি মন্দ স্থানে গমনের যন্ত্রণা মিলে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেন,

وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴿٢٩﴾

'এবং পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে।'[১৬০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সালাফদের অনেকেই বলেছেন, এখানে মৃত্যুর সময়কার কথা বলা হয়েছে। মৃত্যুযন্ত্রণার সাথে আক্ষেপের যন্ত্রণা মিলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

আল্লাহ এই অবস্থার নামকরণ করেছেন 'সাকরাত'। যার শাব্দিক অর্থ, মাতলামো। সেই কঠিন মুহূর্তের ভয়ঙ্কর চিত্র এমনভাবে বিবককে আচ্ছন্ন করে ফেলে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাতালের মতো বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّۖ

---

[১৫৯] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৮৫; সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৩৫ এবং সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৫৭

[১৬০] সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ২৯

‘মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যই আসবে।’[১৬১]

বেশি বেশি মৃত্যুর স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়ে নবি ﷺ বলেছেন,

«أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ»

‘স্বাদ বিনষ্টকারী (অর্থাৎ মৃত্যু)-কে বেশি বেশি স্মরণ করো।’[১৬২]

মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করার অনেক উপকারিতা আছে। এতে করে মৃত্যুর আগেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া যায়। আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিধি ছোটো হয় এবং অল্পতেই তুষ্টি মিলে। দুনিয়াবিমুখতা এবং আখিরাতের প্রতি আগ্রহ আসে। তুচ্ছ মনে হয় দুনিয়ার সব বিপদাপদ। জেদ, অহংকার এবং দুনিয়ার স্বাদের ক্ষেত্রে আপনা-আপনিই অনীহা তৈরি হয়।

হাসান ﵀ বলেছেন, ‘এই মৃত্যু সুখীদের সুখের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। সুতরাং মৃত্যুবিহীন এক জীবনের অনুসন্ধান করো।’

তিনি আরও বলেছেন, ‘মৃত্যু তো দুনিয়াকে লাঞ্ছিত করেছে। ফলে জ্ঞানী লোকের জন্য আনন্দদায়ক কিছু বাকি থাকেনি।’

জনৈক সালাফ বলেছেন, ‘মৃত্যুর স্মরণ জীবন এবং আনন্দের সমস্ত স্বাদ কেড়ে নিয়েছে।’ তারপর তিনি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন, ‘ইশ! এমন জগৎ কত-না চমৎকার হবে, যেখানে মৃত্যু নেই!’

সালাফদের একজন বলেছেন, ‘দুটি জিনিসের কারণে আমি দুনিয়ার স্বাদ পাই না—মৃত্যুর স্মরণ এবং আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো।’

আবুদ দারদা ؓ বলেছেন, ‘মৃত্যু হলো শ্রেষ্ঠ উপদেশদাতা, যুগ হলো সেরা বিচ্ছিন্নকারী। আজকে ঘরে, তো আগামীকাল কবরে।’

মৃত্যুর হাত থেকে কারোর নিস্তার নেই। এটা জানা সত্ত্বেও মানুষ এ বিষয়ে উদাসীন থাকে। ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যজনক। এ জন্য দায়ী হলো উচ্চাশা।

মৃত্যুর মাঝে কষ্ট এবং ভয়াবহ যন্ত্রণা থাকার কারণে, স্বভাবতই তা সবার কাছে অপছন্দনীয়। তা সত্ত্বেও প্রত্যেক নবিকেই মৃত্যুর আগে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল।

---

[১৬১] সূরা ক্বাফ, ৫০ : ১৯

[১৬২] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ৭৯২৫, হাসান

এজন্যই মুমিনের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ফয়সালা পাল্টাতে থাকে। আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ اللّٰهَ قَالَ: ... وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ.»

‘আল্লাহ বলেন : কোনো কাজ করতে চাইলে আমি কোনোরূপ সংকোচ করি না, যতটা করে থাকি মুমিন বান্দার প্রাণ (হরণের ক্ষেত্রে)। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আর আমি তাকে কষ্ট দিতে অপছন্দ করি।’[১৬৩]

নবিগণকেও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছে! তখন কী করে অমর হওয়ার শখ জাগে? আল্লাহর প্রিয়জনরাও রেহাই পাননি মৃত্যুর ছোবল থেকে। এথেকে বেঁচে যাওয়া কেমন করে সম্ভব? এমনটা আশা করা মরীচিকার মতো।

সূরা নাসর অবতীর্ণ করে নবিজিকে বিদায়-বাণী শুনিয়ে দেওয়া হয়। এ সূরার সারমর্ম হলো, ওগো নবি! আল্লাহ মক্কা বিজিত করে দেবেন এবং লোকেরা দলে দলে দ্বীনের পথে আসতে থাকবে। তখন তোমাকে এটা বুঝে নিতে হবে যে, তোমার নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে এসেছে। সেই সময় তুমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার প্রস্তুতিস্বরূপ তাঁর প্রশংসা এবং ইসতিগফার করতে থাকবে। কারণ তোমার দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব পূর্ণ হয়ে গেছে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা দুনিয়া থেকে উত্তম। সুতরাং তাঁর কাছে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকো।

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, এই সূরাতে নবি ﷺ-কে তাঁর মৃত্যুসংবাদ জানানো হয়েছে। এরপর থেকে তিনি আখিরাতের ব্যাপারে আরও ভালো করে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। তিনি জিবরাঈলের সাথে বছরে একবার কুরআন খতম করতেন। কিন্তু সে বছর দুবার করলেন। প্রতি বছর রমাদানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। কিন্তু সে বছর তিনি ইতিকাফ করলেন বিশদিন। যিকর এবং ইসতিগফারের পরিমাণ আগের তুলনায় বাড়িয়ে দিলেন।

আয়িশা ﷺ বলেছেন, ইন্তেকালের আগে আল্লাহর রাসূল ﷺ বেশি বেশি বলতেন

«سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ»

‘প্রশংশা-সহ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহর কাছে ক্ষমা

[১৬৩] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৬৫০২

চাইছি এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি।'

একবার আমি বললাম, আপনি তো দেখছি এমন দুআ পড়ছেন, যা আগে কখনো পড়েননি! তিনি বললেন,

«إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي سَأَرَى عَلَمًا فِي أُمَّتِي، وَأَنِّي إِذَا رَأَيْتُ ذَلِكَ الْعَلَمَ أَنْ أُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرَهُ، فَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ.»

'আমার প্রতিপালক জানিয়েছেন যে আমার উম্মাতের মাঝে আমি একটি নিদর্শন দেখতে পাবো। তা দেখতে পেলে আমি যেন তাঁর প্রশংসা-সহ পবিত্রতা ঘোষণার সাথে সাথে ইসতিগফার করি। সেই নিদর্শন আমি দেখতে পেয়েছি।' এরপর নবি ﷺ সূরা নাসর তিলাওয়াত করলেন।[১৬৪]

নেককারদের সরদারকে শেষ আমলগুলো উত্তমভাবে সমাপ্ত করতে বলা হচ্ছে। তাহলে পবিত্রতা অর্জন করা দরকার এমন আগাগোড়া গুনাহে লিপ্ত বান্দার অবস্থা কেমন হবে?

মৃত্যু নিকটবর্তী হলে যাকে ওহির মাধ্যমে সতর্ক না করা হয়, তাকে বার্ধক্য এবং সতীর্থদের মৃত্যু দিয়ে সতর্কবাণী জানানো হয়ে থাকে। আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«أَعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ، حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً»

'আল্লাহ যাকে দীর্ঘায়ু করেছেন, এমনকি ষাট বছর অবধি পৌঁছে দিয়েছেন, তাকে অভিযোগ থেকে অব্যহতি দিয়েছেন।'[১৬৫]

সুফইয়ান সওরি ﷺ বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমান বয়সে উপনীত হলে, নিজের কাফন তৈরি করে রাখা উচিত।'

ফুযাইল ﷺ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বয়স কত চলছে?' সে বলল, 'ষাট।' ফুযাইল ﷺ বললেন, 'তার মানে ষাট বছর ধরে তুমি আল্লাহর দিকে সফর করছ। অচিরেই তুমি পৌঁছে যাবে মঞ্জিলে।' লোকটি বলল, 'আমরা তো আল্লাহর জন্যই এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব।' ফুযাইল বললেন, 'যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে সে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে, তার এটাও

[১৬৪] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ২৫৫০৮

[১৬৫] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৬৪১৯

জানা উচিত যে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। কাজেই, সেই ব্যক্তির উচিত জবাব প্রস্তুত করে রাখা।' লোকটি বলল, 'তাহলে বাঁচার উপায় কী?' তিনি বললেন, 'খুবই সহজ।' সে বলল, 'বলে দিন না!' ফুযাইল বললেন, 'সামনের জীবনে ভালো কাজ করবে। তাহলে বিগত জীবনের অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর ভবিষ্যত জীবনে অন্যায় করলে ভবিষ্যত এবং অতীত উভয় সময়ের জন্যই তোমাকে পাকড়াও করা করা হবে।'

নবি ﷺ-এর জীবনের শেষ সময় ঘনিয়ে আসছিল। অবশেষে বিদায় হাজ্জের খুতবাতে সমবেত সাহাবিদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন,

«لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ»

'আমার থেকে হাজ্জের নিয়মকানুন শিখে নাও। কারণ আমি জানি না, এই হাজ্জের পর আর হাজ্জ করতে পারব কি না।'[১৬৬]

তাঁর বিদায় জানানো দেখে সাহাবিরা বলছিলেন, এ তো বিদায় হাজ্জ।

হাজ্জ সেরে মদীনাতে ফিরছিলেন তিনি। এমন সময় উপস্থিত সবাইকে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী 'গাদীরু খুম্ম' নামক জলাশয়ের কাছে একত্র করলেন। সেখানকার এক ভাষণে তিনি বললেন,

«أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ»

'লোকসকল! আমি একজন মানুষ মাত্র। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত অচিরেই আমার কাছে আসবে, তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দেব।'[১৬৭]

তারপর তিনি আল্লাহর কিতাব অবলম্বন করতে উৎসাহ দিলেন এবং তাঁর পরিবারের ব্যাপারে ওসিয়ত করলেন।

এরপর তাঁর অসুস্থতা বেড়ে গেল। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে এই ইখতিয়ার দেওয়া হলো যে, চাইলে তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবেন। অথবা দুনিয়াতে আল্লাহ যতদিন রাখবেন, ততদিন থাকতে পারবেন। তখন তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করাটাই বেছে নিলেন। এই ইখতিয়ারের কথা সাহাবিদের কাছে পরোক্ষভাবে তুলেও ধরেন।

---

[১৬৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১২৯৭

[১৬৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৪০৮

সফর মাসের শেষ দিকে তাঁর রোগের শুরু হয়। প্রসিদ্ধ মত অনুসারে তিনি তেরো দিন রোগাক্রান্ত ছিলেন। কেউ কেউ অবশ্য চৌদ্দ দিনের কথা বলেছেন।

আবূ সাঈদ ﵁ বলেছেন, যে রোগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়, তাতে আক্রান্ত থাকাকালীন একবার তিনি আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁর মাথায় ছিল পট্টি বাঁধা। আমরা তাঁকে অনুসরণ করলাম। এরপর তিনি মিম্বরে উঠে বললেন,

«إِنَّ عَبْدًا عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَاخْتَارَ الْآخِرَةَ»

'একজন বান্দার সামনে দুনিয়া ও তার সৌন্দর্য তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু সে আখিরাতকেই বেছে নিয়েছে।'

নবি ﷺ-এর কথাটি লোকদের মধ্যে শুধু আবূ বকর ﵁-ই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন, 'আমাদের বাবা-মা, ধনসম্পদ, সন্তানসন্ততি এমনকি আমাদের প্রাণও আপনার জন্য কুরবান হোক।' এরপর নবি ﷺ মিম্বর থেকে নেমে গেলেন। সেদিন থেকে (অসুস্থতার কারণে) তাঁকে আর (মাসজিদে আসতে) দেখা যায়নি।[১৬৮]

নবি ﷺ-এর আজাদকৃত দাস আবূ মুওয়াইহিবা ﵁ বলেছেন, একবার মধ্যরাতে নবি ﷺ আমাকে ডেকে পাঠালেন। (আমি উপস্থিত হলে) তিনি বললেন,

«يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ، إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ فَانْطَلِقْ مَعِي»

'আবূ মুওয়াইহিবা! আমাকে তো বাকি গোরস্থানে শায়িতদের জন্য ইসতিগফার করতে বলা হয়েছে। তুমিও আমার সাথে চলো।'

তখন আমি তাঁর সাথে গেলাম। সেখানে গিয়ে কবরগুলোর মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন,

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْمَقَابِرِ، لِيَهْنِ لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ، مِمَّا أَصْبَحَ فِيهِ النَّاسُ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا نَجَّاكُمُ اللهُ مِنْهُ، أَقْبَلَتِ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يَتْبَعُ أَوَّلُهَا آخِرَهَا، الْآخِرَةُ شَرٌّ مِنَ الْأُولَى»

'হে কবরবাসীরা! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। মানুষ যে অবস্থায় আছে, তার তুলনায় তোমরা যে অবস্থায় আছো সেটাই তোমাদের জন্য বেশি সুখকর। তোমরা যদি জানতে যে আল্লাহ তোমাদের কেমন অবস্থা

[১৬৮] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ১১৮৬৩, সহীহ

থেকে মুক্তি দিয়েছেন! অন্ধকারের রাতের মতো ফিতনা ধেয়ে আসছে। একটির পর আরেকটি আসছেই। পরেরটি আগেরটি থেকে ভয়াবহ।'

আবূ মুওয়াইহিবা বলেন, তারপর নবিজি আমার দিকে ফিরে বললেন,

«يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ، إِنِّي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الدُّنْيَا، وَالْخُلْدَ فِيهَا، ثُمَّ الْجَنَّةَ، وَخُيِّرْتُ بَيْنَ ذَلِكَ، وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَالْجَنَّةِ»

'আবূ মুওয়াইহিবা! দুনিয়ার ধনভাণ্ডারের চাবি এবং সেখানে স্থায়িত্বের সুযোগ দেওয়ার পরে আমাকে জান্নাত দেওয়া হয়েছে। তারপর, জান্নাত-সহ আল্লাহর দিদার এবং দুনিয়ার ধনভাণ্ডার-সহ সেখানকার স্থায়িত্ব—এ দুটি থেকে যে-কোনো একটি বেছে নিতে বলা হয়েছে।'

আবূ মুওয়াইহিবা ﵁ তখন আমি বললেন, 'আমার মা-বাবা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি দুনিয়ার ধনভাণ্ডারের চাবি এবং তাতে স্থায়িত্বের সুযোগ গ্রহণ করুন। তারপর জান্নাত বেছে নিন।' কিন্তু নবিজি ﷺ বললেন,

«لَا وَاللهِ يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ، لَقَدِ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي، وَالْجَنَّةَ»

'না, আবূ মুওয়াইহিবা! আমি তো আল্লাহর দিদার এবং জান্নাত বেছে নিয়েছি।'

এ কথা বলে কবরবাসীদের জন্য ইসতিগফার করে নবিজি ফিরে গেলেন। পরদিন সকাল থেকেই তাঁর মৃত্যুকালীন অসুস্থতা শুরু হয়ে যায়।[১৬৯]

আল্লাহর সাথে পরিচয় গভীর হওয়ার সাথে সাথে তাঁর দিদারের আগ্রহ নবি ﷺ-এর মাঝে বাড়তে লাগল। এরপর তাঁকে দুনিয়াতে অবস্থান এবং আল্লাহর দিদার—এ দুটির যে-কোনো একটি বেছে নিতে বলা হলো। তিনি দুনিয়ার পরিবর্তে আল্লাহর দিদার বেছে নিলেন। মিম্বরে আরোহণ করে দুনিয়ার ওপরে দিদারকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা ইঙ্গিতে জানালেন। কিন্তু অনেকেই বিষয়টি ধরতে পারেননি। নবিজির বিশিষ্ট সাথি, তাঁর সাথে গুহায় অবস্থানকারী আবূ বকর ﵁ ছাড়া, বিষয়টি কেউ বুঝতেই পারেননি। নবি ﷺ-এর উদ্দেশ্য কেবল তিনিই ভালো বুঝতেন। নবিজির ইঙ্গিত ধরতে পেরে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমরা নিজেদের জান, মাল এবং সন্তানসন্ততি আপনার জন্য উৎসর্গ করছি।' নবিজি ﷺ তখন আবূ বকর

[১৬৯] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ১৫৯৭৭, সহীহ

ﷺ-কে সান্ত্বনা দিলেন। উপস্থিত সকলের কাছে তাঁর প্রশংসা করলেন। যাতে সবাই আবূ বকর ﷺ-এর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারে এবং পরবর্তী সময়ে তাঁর খিলাফাত নির্দ্বিধায় মেনে নেয়। তিনি বলেছিলেন,

«إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ»

'সাহচর্য এবং সম্পদ দিয়ে আমার ওপর সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ করেছে আবূ বকর।'

অন্য বর্ণনামতে তিনি বলেছিলেন,

«مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ»

'আবূ বকর ছাড়া বাকিদের যত দয়া আমার প্রতি ছিল, আমি তার প্রতিদান দিয়েছি। আমার প্রতি তার যে দয়া রয়েছে, আল্লাহ কিয়ামাতের দিন আবূ বকরকে সেটার প্রতিদান দিবেন। অন্য কারো সম্পদ আমাকে এতটা উপকার করেনি, আবূ বকরের সম্পদ আমাকে যতটা উপকৃত করেছে।'

এরপর নবিজি ﷺ বলেছেন,

«وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ»

'আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে যদি আমি একনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে সেটা হতো আবূ বকর। কিন্তু ইসলামি ভ্রাতৃত্বই (যথেষ্ট)।'

আল্লাহর একনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ার কারণে নবি ﷺ-এর পক্ষে কোনো সৃষ্টির সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সমীচীন ছিল না। কারণ 'একনিষ্ঠ বন্ধু' বানানো মানে আত্মিক সম্পর্ক করা। নবিজির পক্ষে সেটা কোনো মানুষের সাথে করা সম্ভব নয়।

ইবরাহীম ﷺ-কে পুত্র জবাইয়ের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। সেখানে মূল উদ্দেশ্য রক্ত প্রবাহিত করা ছিল না। বরং উদ্দেশ্য ছিল অন্তরের একনিষ্ঠ বন্ধুত্বের অবস্থানকে অপাত্র থেকে মুক্ত করে স্রেফ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা।

এরপর নবি ﷺ বলেছেন,

«لَا تُبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ»

‘মাসজিদে আবূ বকর ছাড়া অন্য কারো ছোট দরজা যেন (খোলা) না থাকে।’[১৭০]

অন্য বর্ণনায় আছে,

«سُدُّوا هَذِهِ الأَبْوَابَ الشَّارِعَةَ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ»

‘আবূ বকরের দরজা ছাড়া মাসজিদের এই দরজাগুলো বন্ধ করে দাও।’

এ কথা থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আবূ বকর হবেন নবি-পরবর্তী ইমাম। কারণ ইমামই প্রয়োজনে মাসজিদে অবস্থান এবং চলাচল করতে পারেন। মাসজিদে মুসল্লিদের সুবিধার্থেই এটা হয়ে থাকে। এরপর আবূ বকরকে দিয়ে সালাতের ইমামতি করানোর মাধ্যমে এ বিষয়টি আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে নবিজিকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেছিলেন,

«مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»

‘আবূ বকরকে বলো, লোকদের সালাত পড়াতে।’[১৭১]

এভাবে আবূ বকরকে সালাতের ইমাম বানিয়ে দেওয়া হয়। কেবল তাঁর জন্য ঘর থেকে সালাতের স্থান পর্যন্ত চলাচলের ব্যবস্থা রাখা হয়। এগুলো নবিজির পরে আবূ বকরের খিলাফাতের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এজন্যই আবূ বকর ﷺ-এর হাতে বাইআত গ্রহণের সময় সাহাবিরা বলেছিলেন, ‘নবি ﷺ তো আমাদের দ্বীনের জন্য তাঁকে মনোনীত করেছিলেন। তাহলে আমরা নিজেদের দুনিয়ার জন্য তাঁকে মেনে নিতে পারব না কেন?’ পরবর্তী সময়ে আবূ বকর رضي الله عنه নিজের বাইয়াত প্রত্যাহার করে নিলে আলি رضي الله عنه বলেছিলেন, ‘আমরা নিজেরাও বাইআত প্রত্যাহার করব না, আপনাকেও করতে দেবো না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আপনাকে সামনে বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাহলে কে আপনাকে পিছনে রাখার দুঃসাহস দেখাবে?’

রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের মাধ্যমে নুবুওয়াতের সমাপ্তি ঘটে। এরপর সিদ্দীকদের স্তর সর্বোচ্চ হিসেবে নির্ধারিত হয়। আবূ বকর رضي الله عنه ছিলেন সিদ্দীকদের সরদার। এ বিবেচনায় তিনিই ছিলেন রাসূল ﷺ-এর প্রতিনিধি এবং তাঁর স্থানে দাঁড়ানোর উপযুক্ত। নবি ﷺ মনস্থ করেছিলেন, আবূ বকর رضي الله عنه-কে মনোনীত করে একটি ফরমান লিখে দেবেন। যাতে এ বিষয়ে কোনো বিতর্ক সৃষ্টি না হয়। কেউ এমনটা

---

[১৭০] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৩৬৬০, সহীহ

[১৭১] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৬৬৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৪১৮

করবে না বুঝতে পেরে পরবর্তী সময়ে এ সিদ্ধান্ত থেকে তিনি সরে আসেন। তাই তিনি বলেছিলেন,

«يَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ»

'আবূ বকর ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ এবং মুসলিমরাও পছন্দ করবে না।'[১৭২]

নবিজির সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আরেকটি কারণ এও হতে পারে, কেউ মনে করবে, নিজের অবদানের কারণে আবূ বকর খিলাফাত পেয়েছেন। নিয়োগ দান তো কেবল নিয়োগকর্তার ইচ্ছাতেই হয় না; বরং সাধারণ মুসলমানদের কল্যাণের বিষয়টিও লক্ষ্য রাখতে হয়।

নবিজির অসুস্থতার সূচনা

প্রথম দিকে নবিজির অসুস্থতা ছিল, মাথাব্যথা। এ জন্যই বক্তব্য প্রদানের সময় তিনি কালো কাপড় দিয়ে মাথায় পট্টি বেঁধে নিয়েছিলেন।[১৭৩] জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি মাথাব্যথাসহ আনুষাঙ্গিক কিছু অসুস্থতায় ভুগেছেন এবং এই যন্ত্রণা তাঁর কয়েকদিন পর্যন্ত স্থায়ী হতো।

মাথাব্যথা ঈমানদার এবং জান্নাতি ব্যক্তির লক্ষণ। আবু হুরায়রা ﵁ বলেছেন, এক বেদুইন নবি ﷺ-এর কাছে এলে তিনি তাকে বললেন,

«هَلْ أَخَذَتْكَ أُمُّ مِلْدَمٍ»

'তোমাকে কি উম্মু মিলদাম স্পর্শ করেছে?'

বেদুইন বলল, উম্মু মিলদাম কী? তিনি বললেন,

«حَرٌّ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ»

'দেহের চামড়া ও গোশতের মধ্যবর্তী স্থানের উত্তাপ।' (অর্থাৎ জ্বর।)

বেদুইন বলল, না।

---

[১৭২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৩৮৭

[১৭৩] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৯২৭

নবি ﷺ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন,

«فَهَلْ صُدِعْتَ؟»

'তুমি কি কখনো মাথাধরায় আক্রান্ত হয়েছ?'

বেদুইন বলল, মাথাধরা আবার কী জিনিস? তিনি বললেন,

«رِيحٌ تَعْتَرِضُ فِي الرَّأْسِ، تَضْرِبُ الْعُرُوقَ»

'একটি বায়ু যা মাথায় অনুভূত হয়, সেটা শিরাগুলোতে আঘাত করে থাকে।'

বেদুইন না-বাচক উত্তর দিলো। পরে বেদুইন উঠে গেলে নবি ﷺ বললেন,

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»

'কোনো জাহান্নামীকে দেখতে চাইলে এই ব্যক্তিকে দেখে নিতে পারো।'[১৭৪]

আয়িশা رضي الله عنها বলেছেন, যেদিন রাসূল ﷺ রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন, সেদিন তিনি এসেছিলেন আমার কাছে। আমি বললাম, মাথাব্যথার চোটে আমি মারা যাচ্ছি। তিনি বললেন, 'আমার জীবিত অবস্থায় তুমি মারা গেলে, আমি তোমাকে কাফন-দাফন দিব।' আমি বললাম, হ্যাঁ, তা তো বলবেনই। আমি মারা গেলে আপনি অন্য স্ত্রীকে নিয়ে আমোদে থাকবেন। তিনি বললেন,

وَأَنَا وَارَأْسَاهْ، ادْعُوا لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ، وَيَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ: أَنَا أَوْلَى، وَيَأْبَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ

'আসলে আমিই মাথাব্যথায় মারা যাচ্ছি। তোমার বাবা-ভাইকে ডাকো। আমি আবূ বকরের নামে একটি ফরমান লিখে দিই। নাহয় আমার আশঙ্কা হয় যে (আমার মৃত্যুর পর) মানুষ নানা কথা বলবে এবং যার ইচ্ছা হয় সে নিজেকে বেশি যোগ্য বলে দাবি করবে। কিন্তু আল্লাহ এবং মুমিনরা আবূ বকরকেই পছন্দ করবেন।'[১৭৫]

---

[১৭৪] বুখারি, আলআদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং : ৪৯৫, হাসান।

[১৭৫] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ২৫১১৩, সহীহ

আর সহীহ বুখারিতে এই বর্ণনার মর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। আয়িশা ﵂ বলেছিলেন, 'হায়! যন্ত্রণায় আমার মাথা গেল।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যদি এমনটি হয় আর আমি জীবিত থাকি তাহলে আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, তোমার জন্য দুআ করব।' আয়িশা ﵂ বললেন, 'আফসোস! আমার তো মনে হচ্ছে, আপনি আমার মৃত্যু চাচ্ছেন। আর এমনটি হলে তো পরের দিনই আপনার অন্য স্ত্রীর সঙ্গে রাত কাটাবেন!' এরপর ইমাম বুখারি ﵀ অবশিষ্ট হাদীস উল্লেখ করেছেন।

মুসনাদু আহমাদে আয়িশা ﵂ থেকে আরেকটি বর্ণনা এসেছে। তাতে আয়িশা ﵂ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরের দরজার সামনে দিয়ে গেলে উপকারী কোনো কথা বলতেন। একদিন তিনি আমার ঘরের সামনে দিয়ে দুই-তিনবার গেলেন, কিন্তু কোনো কথা বললেন না। তখন আমি দাসীকে ডেকে দরজার কাছে বিছানা করালাম এবং আমার মাথায় পট্টি বাঁধলাম। এরপর দরজার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বললেন, আয়িশা! তোমার কী হয়েছে? আমি বললাম, মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। তিনি বললেন, আমারও তো মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। এরপর তিনি চলে গেলেন। কিছু সময় পর একটি চাদরে জড়িয়ে তাঁকে আনা হলো। আমার ঘরে ঢুকে তিনি অন্য স্ত্রীদেরও ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তিনি বললেন, আমার কষ্ট হচ্ছে। তোমাদের পালা অনুসারে আমার যেভাবে থাকা দরকার ছিল সেটা আমি করতে পারছি না। তোমরা আমাকে অনুমতি দিলে আমি আয়িশার কাছে থাকব।'[১৭৬]

এসব বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, নবি ﷺ প্রথমে মাথার যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। তবে এর সাথে জ্বর যে ছিল, সেটা স্পষ্ট। কারণ, মৃত্যুর সময় তাঁর জ্বর প্রবল আকার ধারণ করেছিল। তিনি একটি বড় পাত্রে বসে ছিলেন। তাঁর ওপর কানায় কানায় ভর্তি সাত মশক পানি ঢালা হয়েছিল, যা দ্বারা তিনি নিজেকে শীতল করে নিচ্ছিলেন। তাঁর গায়ে একটি লেপ জড়ানো ছিল। এর ওপর দিয়ে স্পর্শ করলেও তাঁর গায়ের উত্তাপ অনুভূত হতো। এ ব্যাপারে তাঁকে জানানো হলে তিনি বললেন,

«إِنَّا كَذَلِكَ يُشَدَّدُ عَلَيْنَا الْبَلَاءُ وَيُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ»

'আমাদের পরীক্ষা যেমন কঠিন হয়, আমাদের বিনিময়ও তেমন বেশি।'[১৭৭]

---

[১৭৬] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ২৫৮৪১

[১৭৭] হাকিম, আলমুসতাদরাক, হাদীস নং : ১১৯, ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

তিনি এ-ও বলেছেন,

«إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ»

‘তোমাদের দুজন ব্যক্তি যতটা জ্বরে আক্রান্ত হয়, আমি একাই ততটা জ্বরে আক্রান্ত হই।’[১৭৮]

যন্ত্রণার তীব্রতায় তিনি হুঁশ হারিয়ে ফেলতেন। এরপর আবার হুঁশ ফিরে পেতেন। এমনটা একাধিকবার হয়েছিল। আয়িশা ﵂ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে বেশি রোগের যাতনা ভোগ করতে কাউকে দেখিনি।[১৭৯]

অসুস্থতার সময় তাঁর কাছে সাতটি দিনার ছিল। তিনি সেগুলো সাদাকাহ করে দিতে বললেন। এরপর হুঁশ হারিয়ে ফেললেন। উপস্থিত সবাই তাঁর সেবা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হুঁশ ফিরে এলে তিনি দিরহামগুলো নিজের হাতে রেখে বললেন,

«مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ لَقِيَهُ، وَهَذِهِ عِنْدَهُ»

‘এগুলো মালিকানায় থাকা অবস্থাতে মুহাম্মাদ আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলে, আল্লাহর প্রতি তার ধারণা কেমন হবে?’এ কথা বলে সবগুলো দিনারই সাদাকাহ করে দিলেন।[১৮০]

এই যদি হয় নবির অবস্থা, তাহলে মুসলমানদের জান এবং অবৈধ সম্পদ যার দায়িত্বে থাকে তার অবস্থা কেমন হবে? আর আল্লাহ সম্পর্কে তার ধারণাই-বা কী?

নবিজির অসুস্থতার সময় তাঁদের কাছে বাতি জ্বালানোর মতো তেল ছিল না। সোমবার রাতে তাঁর অসুস্থতা বেড়ে গেল। আয়িশা ﵂ অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীনের কাছে বাতি দিয়ে পাঠালেন। আর বললেন, ‘ঘিয়ের পাত্র আমাদের চেরাগে ঢেলে দিন। কারণ সন্ধ্যায় নবি ﷺ-এর মৃত্যুরোগ বেড়ে গিয়েছে।’[১৮১]

নবিজির অসুস্থতার সময় ফাতিমা ﵂ এলেন পিতাকে দেখতে। মেয়েকে নবিজি কানে কানে কিছু কথা বললেন। ফাতিমা ﵂ কাঁদতে লাগলেন। এরপর কানে কানে আরও কিছু কথা বললে তিনি মৃদু হাসতে লাগলেন। আয়িশা ﵂ এ ব্যাপারে

[১৭৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৫৭১

[১৭৯] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৫৬৪৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৫৭০

[১৮০] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ২৪২২২, সহীহ

[১৮১] তাবারানি, আলমুজামুল কাবীর, হাদীস নং : ৫৯৯০, হাইসামি ﵀-এর সনদকে সহীহ বলেছেন।

জানতে চাইলে ফাতিমা ﵂ বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোপন কথা ফাঁস করব না।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর আয়িশা ﵂ আবার জানতে চাইলে ফাতিমা ﵂ বললেন, 'প্রথমবার তিনি এ রোগেই তাঁর মৃত্যু হওয়ার জানালে আমি কেঁদে ফেললাম। দ্বিতীয়বার জানালেন, পরিবারের মধ্যে সবার আগে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করব এবং (জান্নাতে) আমি মুসলিম নারীদের নেত্রী হব। তখন আমি হেসে দিলাম।'

মুমূর্ষু অবস্থায় নবি ﷺ-এর রোগযন্ত্রণা আরও বেড়ে গিয়েছিল। এ ব্যাপারে আয়িশা ﵂ বলেছেন, 'মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে কষ্ট হতে দেখেছি, এরপর কারো মৃত্যু সহজ হতে দেখলে আমার মধ্যে কোনো রকম ঈর্ষা জাগে না।'[১৮২]

আয়িশা ﵂ বলেছেন, নবিজির সামনে একটি পাত্রে পানি রাখা ছিল। তিনি সেটাতে হাত চুবিয়ে পানি দিয়ে চেহারা মুছে বলছিলেন,

«اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ المَوْتِ»

'ইয়া আল্লাহ! মৃত্যুযন্ত্রণায় আমাকে সাহায্য করুন।'

তিনি আরও বলছিলেন,

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ»

'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সত্যিই, মৃত্যুর যন্ত্রণা অনেক।'[১৮৩]

নবি ﷺ-এর রোগ গুরুতর আকার ধারণ করলে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। এ অবস্থা দেখে ফাতিমা ﵂ বলেছিলেন, 'আহ, আমার বাবার কত-না কষ্ট হচ্ছে!' তখন নবি ﷺ বললেন,

«لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْمِ»

'আজকের পরে তোমার বাবার আর কোনো কষ্ট হবে না।'[১৮৪]

ইন্তেকালের আগে নবি ﷺ-কে পুনরায় দুনিয়া এবং আখিরাতের যে-কোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আয়িশা ﵂ বলেছেন, রাসূল ﷺ সুস্থ

[১৮২] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৯৭৯

[১৮৩] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৪৪৪৯

[১৮৪] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৪৪৬২

থাকাবস্থায় প্রায়ই এ কথা বলতেন,

«إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ»

'জান কবজ করার আগে প্রত্যেক নবিকেই তাঁর জান্নাতের ঠিকানা দেখানো হয়। এবং তাঁকে (জীবন অথবা মৃত্যুর বেছে নেওয়ার) ইখতিয়ার দেওয়া হয়।'

নবি ﷺ-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে, তাঁর মাথা তখন ছিল আমার উরুর ওপর। তখন কিছু সময়ের জন্য তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। হুঁশ ফেরার পর তিনি ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

«اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى»

'আল্লাহ! আমি পরম বন্ধুর সান্নিধ্যই পছন্দ করলাম।'

আয়িশা ؓ বলেছেন, তখন আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি এখন আর আমাদের পছন্দ করবেন না।[১৮৫]

অন্য বর্ণনামতে তিনি বলছিলেন,

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى»

'ইয়া আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন এবং ঊর্ধ্বজগতের বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত করুন।'[১৮৬]

আরেক বর্ণনামতে আয়িশা ؓ বলেছেন, মৃত্যুশয্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আওয়াজ ভারী হয়ে গিয়েছিল। সে-সময় আমি তাঁকে বলতে শুনেছি,

مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

'সেসব লোকের সাথে, যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন অর্থাৎ সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল, তাঁরা কত-না ভালো সঙ্গী।'[১৮৭]

[১৮৫] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৬৫০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৪৪৪

[১৮৬] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৩৪৯৬, সহীহ

[১৮৭] সূরা নিসা, ৪ : ৬৯

আয়িশা ﷺ বলেছেন, 'আমার ধারণা, তখনই তাঁকে ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয়েছিল।'[১৮৮]

আয়িশা ﷺ একটি মিসওয়াক চিবিয়ে লালা দিয়ে ভিজিয়ে নরম করে দিলেন। নবিজি ﷺ সেটা দিয়ে সুন্দরভাবে মিসওয়াক করেন। দুর্বলতার কারণে মিসওয়াকটি নবিজির হাত থেকে পড়ে যায়। আয়িশা ﷺ বলেছেন, 'নবিজির দুনিয়ায় শেষ দিন এবং আখিরাতের প্রথম দিনে আল্লাহ্ আমার এবং নবি ﷺ-এর লালা মিশ্রিত করেছেন।'[১৮৯]

আল্লাহর নবি ﷺ-এর ইন্তেকাল

আল্লাহর নবি ﷺ-এর ইন্তেকাল সোমবারে এবং রবিউল মাসে হয়েছিল। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ সবাই একমত। সেদিন নবি ﷺ ঘরের পর্দা সরিয়ে মাসজিদের দিকে তাকালেন। সাহাবিরা তখন আবূ বকর ﷺ-এর পিছনে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। নবি ﷺ-কে দেখতে পেয়ে মুসলমানরা খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলেন। নবিজির চেহারা তাঁদের কাছে কুরআনের পৃষ্ঠার মতো উজ্জ্বল মনে হচ্ছিল। নবিজি সালাতে আসবেন ভেবে তাঁরা খানিকটা পিছিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি ইশারায় তাদেরকে নিজ নিজ স্থানে থাকতে বলে পর্দা ছেড়ে দিলেন। সেদিনই নবিজি ﷺ ইন্তেকাল করেন।

সোমবার ভোরে নবি ﷺ-কে সজাগ দেখে মুসলমানরা ভেবেছিলেন, তিনি সেরে উঠছেন। তাই আবূ বকর ﷺ মদীনার বাইরে সুনহ নামক স্থানে নিজের ঘরে গিয়েছিলেন। সেদিন বেলা বাড়ার সময় নবি ﷺ ইন্তেকাল করেন। কারও কারও মতে, তখন ছিল সূর্য হেলে পড়ার সময়। তবে প্রথম মতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। সোমবার বেলা বাড়ার সময় তিনি ইন্তেকাল করেন। ঠিক এই সময়টাতেই তিনি হিজরত করে মদীনায় প্রবেশ করেছিলেন। তবে সেদিন মাসের কত তারিখ ছিল, তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। কারও মতে ১ তারিখ, কারও মতে ২, কারও মতে ১২। কেউ কেউ আবার ১৩ বা ১৫ তারিখের কথাও বলেছেন। তবে সাধারণ মানুষের কাছে রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখটি প্রসিদ্ধ।

নবি ﷺ-এর ইন্তেকালের খবর ছড়িয়ে পড়ল। মুসলমানরা অস্থির হয়ে গেলেন। কেউ কেউ পাগলপারা হয়ে গেলেন। কেউ তো দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে বসে

---

[১৮৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৪৪৪

[১৮৯] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৪৪৪৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৪৪৩

পড়লেন। অনেকে হয়ে গেলেন নির্বাক। অনেকে নবিজির মৃত্যুর বিষয়টি অস্বীকার করে বলতে লাগলেন, মূসা ﷺ-এর মতো নবিজিকেও আল্লাহ ডেকে পাঠিয়েছেন। উমার ﷺ ছিলেন এই শেষোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন আবূ বকর ﷺ। প্রবেশ করলেন আয়িশা ﷺ-এর ঘরে। নবি ﷺ-কে তখন ঢেকে রাখা হয়েছিল। আবূ বকর ﷺ কাপড় সরিয়ে অশ্রুসজল চোখে নবি ﷺ-এর চেহারায় কয়েকবার চুমু দিলেন। বলতে লাগলেন, 'হায় নবিজি! হায় বন্ধু! হায় প্রিয়তম! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আপনি তো সত্যিই মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহর কসম! তিনি আপনাকে দু'বার মৃত্যু দেবেন না। যে মৃত্যু আপনার জন্য তিনি নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, তা আপনি বরণ করে নিয়েছেন।'

এরপর তিনি মাসজিদে প্রবেশ করলেন। লোকেরা সমবেত হয়েছিলেন সেখানে। উমার ﷺ তাদের উদ্দেশ্যে কথা বলছিলেন। আবূ বকর ﷺ কথা বলতে শুরু করলে সবাই তাঁর দিকে মনযোগী হলেন। আবূ বকর ﷺ বললেন, 'যারা মুহাম্মাদের ইবাদাত করতে তারা জেনে রাখো, মুহাম্মাদ মারা গেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদাত করতে তারা জেনে রাখো, আল্লাহ চিরঞ্জীব; তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না।' এরপর আবূ বকর ﷺ তিলাওয়াত করলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ

'মুহাম্মাদ তো একজন রাসূল মাত্র; তাঁর আগেও রাসূলগণ গত হয়েছেন।'[১৯০]

তখন সবাই বিশ্বাস করলেন যে, নবি ﷺ ইন্তেকাল করেছেন। সবার অবস্থা এমন, যেন আবূ বকর তিলাওয়াত করার আগে আয়াতটি কেউ শুনেইনি। সবাই তাঁর থেকে শিখে নিলো। সবার মুখে মুখে আয়াতটি শোনা যাচ্ছিল। পিতার শোকে আহত ফাতিমা ﷺ বলছিলেন, 'আহহা! আব্বাজান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আব্বাজানের ঠিকানা তো জান্নাতুল ফিরদাউস। আমরা জিবরাঈলকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি।'[১৯১] নবি ﷺ-এর ইন্তেকালের ছয় মাস পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। আসলে এই গুরুতর বিপদের সামনে সব বিপদ তুচ্ছ।

নবি ﷺ-এর বিচ্ছেদের যন্ত্রণা জড়বস্তুও যেখানে সহ্য করতে পারে না, সেখানে

[১৯০] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৪৪

[১৯১] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৪৪৬২

মুমিনদের অন্তরের অবস্থা কেমন হয়েছিল সেটা তো বলাই বাহুল্য। মিম্বর তৈরি করার আগে নবি ﷺ একটি খেজুরগাছের কাণ্ডের সাথে টেক লাগিয়ে খুতবা দিতেন। পরবর্তী সময়ে মিম্বর তৈরি হয়ে গেলে তিনি সেখানে আরোহণ করেন। তখন খেজুরগাছের কাণ্ডটি নবিজির বিরহে শিশুর মতো কান্না শুরু করে দেয়। নবি ﷺ মিম্বর থেকে নেমে সেটিকে জড়িয়ে ধরেন। কান্নারত শিশুকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে, তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। কাণ্ডটি শান্ত হয়ে গেলে নবি ﷺ বলেন,

«لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

'আমি এভাবে জড়িয়ে ধরে তাকে সান্ত্বনা না দিলে, কিয়ামাত পর্যন্ত সে কেঁদে চলত।'[১৯২]

এই হাদীসটি বর্ণনার সময় হাসান ﷺ কাঁদতে কাঁদতে বলতেন, 'আল্লাহর নবির বিরহে একটি কাঠ যদি এভাবে কাঁদতে পারে, তাহলে তোমাদের তো তাঁর প্রতি আরও বেশি আগ্রহী হওয়া উচিত।'

বর্ণিত আছে, নবি ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তাঁকে দাফন করার আগ পর্যন্ত বিলাল ﷺ আযানের মধ্যে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বললেই কান্না এবং বিলাপের আওয়াজে মাসজিদের পরিবেশ ভারী হয়ে উঠত। নবিজিকে দাফন করার পর বিলাল ﷺ আযান দেওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন।

নবি ﷺ-কে দাফন করার পর ফাতিমা ﷺ বলেছিলেন, 'তোমরা কীভাবে আল্লাহর রাসূলকে মাটির নিচে রেখে আসলে?'

আনাস ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর নবি ﷺ যেদিন মদীনাতে আগমন করেছিলেন সেদিন সবকিছু আলোতে ঝলমল করে উঠেছিল। পক্ষান্তরে তাঁর দাফনের দিন মদীনার সবকিছু বিষাদে ছেয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর রাসূলের ওপর মাটি ছড়িয়ে দিতে আমাদের মন সায় দিচ্ছিল না।

[১৯২] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ২২৩৬; ইবনু মাজাহ, আসসুনান হাদীস নং : ১৪১৫, বূসিরি ﷺ এই হাদীসটির সনদ সহীহ বলেছেন।

রজব মাসে পালনীয়

আবূ বাকরাহ ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ، وَذُو الحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ»

'সময় অতিবাহিত হয়ে যথাযথ অবস্থায় ফিরে এসেছে, যে অবস্থায় আল্লাহ আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। বছর হয় বার মাসে, যার মধ্যে চারটি মাস পবিত্র। এর মধ্যে তিনটি মাস ধারাবাহিক। (সেগুলো হলো) যুল-কাদা, যুল-হিজ্জাহ, এবং মুহাররাম। আরেকটি হলো মুযার গোত্রের রজব মাস যা জুমাদাস সানি এবং শাবানের মধ্যবর্তী।'[১৯৩]

আল্লাহ বলেন,

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

'আসমান-জমিন সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর কিতাবে (লাওহে মাহফুজে) মাসগুলোর সংখ্যা হলো বারো। তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস। এটা হলো সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন। কাজেই ওই সময়ের মধ্যে নিজেদের ওপর জুলম করো না। মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করো, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে। জেনে রেখো,

---

[১৯৩] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৪৬৬২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৬৭৯

আল্লাহ অবশ্যই মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।'[১৯৪]

এই আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, যখন থেকে তিনি আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, রাত এবং দিনের আবর্তনের সূচনা ঘটিয়েছেন, আকাশে থাকা চাঁদ, সূর্যসহ অন্যান্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদ-সূর্যকে কক্ষপথে বিচরণের নির্দেশ দিয়েছেন, তখন থেকেই রাতের অন্ধকার এবং দিনের আলো আছে। তখন থেকেই চাঁদের হিসেবে বছরকে তিনি বারো মাসে বিভক্ত করেছেন। সুতরাং শারীআয় বছর ধর্তব্য হবে চাঁদের আবর্তন এবং উদয় হিসেবে। কিতাবিরা সূর্যের পরিভ্রমণ এবং স্থানান্তর হিসেবে যে বর্ষ গণনা করে থাকে, শারীআয় সেটা ধর্তব্য নয়।

⇨ 'সময় অতিবাহিত হয়ে যথাযথ অবস্থায় ফিরে এসেছে...' এ কথা বলে নবি ﷺ জাহিলি যুগের মাস পিছিয়ে দেওয়ার কাজ রহিত করলেন। যেমনটা আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا ٱلنَّسِىٓءُ زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا۟ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا۟ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ

'এই মাস পিছিয়ে দেওয়ার কাজ কেবল কুফরির মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার মাধ্যমে কাফিররা গোমরাহীতে পতিত হয়। তারা একে কোনো বছর বৈধ করে নেয় এবং অন্য বছর অবৈধ করে। যাতে তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোর গণনা পূর্ণ করে নিতে পারে, এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করে নিতে পারে।'[১৯৫]

মাস পিছিয়ে দেওয়ার ব্যাখ্যা

একদল আলিম বলেছেন, 'জাহিলি যুগে কাফিররা নিজেদের প্রয়োজনে কোনো এক সম্মানিত মাসকে অন্য কোনো সাধারণ মাস দিয়ে পরিবর্তন করে নিতো। এরপর সেই সাধারণ মাসটিকে সম্মানিত মাস বলে গণ্য করত। তবে এ ক্ষেত্রে তারা চান্দ্র মাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করত না।' এই মতের প্রবক্তারা বলেছেন, মাস পিছিয়ে দেওয়ার কাজ মূলত তারা করত মুহাররাম মাসের ক্ষেত্রে। কারণ দীর্ঘ তিন মাস যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকায় তাদের সমস্যা হতো। তাই মুহাররামের স্থলে তারা সফর মাসকে সম্মানিত সাব্যস্ত করত। ব্যাপারটা যেন ধার নিয়ে পরিশোধ করার মতো। তারা যেন মুহাররাম মাসের সম্মান ধার নিয়ে সফর মাসে পরিশোধ করত।

---

[১৯৪] সূরা তাওবা, ৯ : ৩৬

[১৯৫] সূরা তাওবা, ৯ : ৩৭

আরেক দলের মত হলো, 'তারা কোনো বছরের সফর মাসের সাথে মুহাররামও বৈধ করে নিত। তখন তারা বলত, এ বছর সফর মাস দুটি। পরবর্তী বছর মুহাররাম এবং সফর মাস দুটোই সম্মানিত করে তারা বলত, এ বছর মুহাররাম মাস দুটি।'

এই মাস চারটিকে 'সম্মানিত' বলার কারণ

কারও মতে, এই মাসগুলোর গুরুত্ব অনেক এবং এই মাসের পাপও বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। তাই মাসগুলোকে 'সম্মানিত' বলা হয়। আর কারও মতে, এ মাসগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে তা সম্মানিত । জাহিলি যুগে এ কথা প্রচলিত ছিল। আবার কারও মতে, আরবের মাঝে এই চারটি মাস মূলত হাজ্জ এবং উমরাহ'র কারণে নিষিদ্ধ ছিল। যুল-হিজ্জাহতে হাজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। যুল-কাদা মাসে হাজ্জে গমন করা এবং মুহাররাম মাসে হাজ্জ থেকে নিরাপদে বাড়ি ফেরার জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর নির্বিঘ্নে উমরাহ পালনের জন্য বছরের মধ্যবর্তী রজব মাস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ মাসে মক্কার নিকটস্থ লোকেরা উমরাহ পালন করত।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সম্মানিত মাসের ব্যাপারে নির্দেশনা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ

'হে মুমিনগণ! আল্লাহর নিদর্শনসমূহের এবং সম্মানিত মাসগুলোর অবমাননা করো না।'[১৯৬]

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ

'সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে; বলে দিন এতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দেওয়া, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারামে বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদের বহিস্কার করা, আল্লাহর কাছে তার চেয়েও বড় অন্যায়। আর ফিতনা সৃষ্টি করা হত্যা থেকেও গুরুতর অন্যায়।'[১৯৭]

---

[১৯৬] সূরা মায়িদা, ৫ : ২

[১৯৭] সূরা বাকারাহ, ২ : ২১৭

সম্মানিত মাসগুলোর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে কি না

আতা ﷺ-সহ সালাফের এক দলের মতে নিষেধাজ্ঞা এখনও বলবৎ আছে। পরবর্তীদের অনেকেই এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। নিজেদের মতের সপক্ষে তারা সূরা মায়িদার আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করে থাকেন। আর সূরা মায়িদা হলো কুরআনের অবতীর্ণ হওয়া সর্বশেষ অংশ। বর্ণিত আছে যে, সূরা মায়িদার আয়াতটির অর্থ হলো, বৈধ মাসগুলোর বৈধতা দাও এবং সম্মানিত মাসগুলোতে বিরত থাকো। কারও কারও মতে সূরা মায়িদাতে রহিত কোনো আয়াত নেই।

অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে এই নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে। ইমাম আহমাদ ﷺ-সহ অন্য ইমামগণ এ মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন, নবি ﷺ-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন দেশ জয় এবং অনবরত জিহাদের কাজে মশগুল ছিলেন। সম্মানিত মাস উপলক্ষে তাঁরা যুদ্ধবিরতি দিয়েছেন, এমন বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না। এটাই সর্বসম্মতিক্রমে সম্মানিত মাসের নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে যাওয়ার প্রমাণ।

মুযার গোত্রের রজব মাসের ব্যাখ্যা

রজব শব্দের অর্থ সম্মান। সম্মানিত হওয়ার কারণে মাসটিকে এই নাম দেওয়া হয়েছে। ভাষাবিদ আসমাঈ, মুফাযযাল এবং ফাররার মত এটাই। কারও মতে, ফেরেশতারা তাসবীহ এবং তাহমীদ দিয়ে এ মাসকে সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। তাই এই নামকরণ। এ ব্যাপারে একটি মারফূ হাদীস রয়েছে, তবে সেটা মাউযূ।

মুযার গোত্রের সাথে এ মাসকে সম্পৃক্ত করার কারণ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, ‘তারা এ মাসকে বেশি সম্মান করত। সেজন্য এ মাসকে তাদের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।’ আবার অনেকে বলেছেন, ‘রবীয়া গোত্র রমাদান মাসকে সম্মানিত মাস বলে অভিহিত করত আর মুযার গোত্র করত রজব মাসকে। এজন্যই মুযার গোত্রের রজব বলা হয়েছে।’

রজব মাসের সাথে সম্পৃক্ত বিধান

রজব মাসের সাথে সম্পৃক্ত অনেক বিধান আছে। কিছু বিধান এমন আছে, যার প্রচলন জাহিলি যুগে ছিল। তবে ইসলামে তা বলবৎ থাকবে কি না, এ নিয়ে উলামাদের মতবিরোধ আছে। যেমন, কিতাল করা। পূর্বে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

⇨ এমনই আরেকটি প্রচলন হলো জবাই করা। জাহিলি যুগে জবাই করার একটি প্রচলন ছিল, যার নাম 'আতীরাহ'। ইসলামে এর প্রচলন আছে কি না, এ বিষয়ে অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম বলেছেন, 'ইসলাম এর বিলোপ সাধন করেছে।' আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ»

'ফারা ও আতীরাহ বলতে (ইসলামে) কিছু নেই।'[১৯৮]

ফারা হলো উটের প্রথম বাচ্চা, যা কাফিররা তাদের দেবদেবীর নামে বলি দিত।[১৯৯]

ইবনু সীরীন ؒ প্রমুখের মতে তা মুস্তাহাব। ইমাম আহমাদ ؒ বসরার আলিমদের থেকে এটা বর্ণনা করেছেন।

রজব মাসের আয়োজন

ইবনু আব্বাস ؓ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, রজব মাসে কোনো উৎসব করা তিনি অপছন্দ করতেন। মূলকথা, ইসলাম যেটাকে উৎসব বলে নির্ধারণ করেছে, সেটা ছাড়া অন্য কিছুকে উৎসব বানানো শারীআ অনুমোদন করে না। ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, আইয়ামুত তাশরীক তথা যুল-হিজ্জাহর ১১ থেকে ১৩ তারিখ হলো শারীআ-অনুমোদিত বার্ষিক উৎসবের দিন। আর জুমুআর দিন হলো সাপ্তাহিক উৎসবের দিন। এগুলো ছাড়া অন্য কোনো সময় বা দিনকে উৎসবের দিন সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। শারীআ এর অনুমোদন দেয় না।

রজব মাসের ইবাদাত

⇨ **সালাত :** রজব মাসের নির্ধারিত কোনো সালাত নেই। রজবের প্রথম জুমুআর রাতে সালাতুল রাগায়িব নামে যে সালাতের বর্ণনা আছে, তা মিথ্যা এবং অসার বর্ণনা। এর কোনো ভিত্তি নেই। অধিকাংশ উলামাদের মতে এই সালাত আদায় করা বিদআত।

পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মধ্যে আবূ ইসমাঈল আনসারি, আবূ বকর ইবনুস সামআনি, আবুল ফাযল ইবনু নাসির, আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি ؒ-সহ প্রমুখ এ কথা বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী উলামাদের এটা নিয়ে আলোচনা না-করার

---

[১৯৮] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৫৪৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৯৭৬

[১৯৯] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৫৪৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৯৭৬

কারণ হলো, তাঁদের যুগে এটা ছিলই না। এই বিদআতের উদ্ভব ঘটেছে চার শ হিজরির পরে। পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের এটা জানা ছিল না, তাই তারা এ বিষয়ে কলম ধরেননি।

⇨ **সিয়াম** : রজব মাসের সিয়াম পালনের ফযিলত সম্পর্কে নবি ﷺ বা সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم থেকে বিশেষ কিছু বর্ণিত হয়নি। উমার رضي الله عنه রজব মাস উপলক্ষ্যে সিয়াম পালনকারীদের হাতে আঘাত করতেন, যাতে তারা খাবার গ্রহণ করে। অর্থাৎ সিয়াম ভাঙতে বাধ্য করতেন। আর বলতেন, 'রজবে আবার (বিশেষ সিয়াম) কী? জাহিলি যুগের লোকেরা রজব মাসকে সম্মান করত। ইসলাম এসে এই প্রথার বিলোপসাধন করেছে।' অন্য বর্ণনায় আছে, রজব মাসে বিশেষ সিয়াম পালন করা তিনি সুন্নাহ মনে করতেন না।

আবূ বাকরাহ رضي الله عنه সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি পরিবারের লোকদের রজব মাসের জন্য সিয়াম পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে দেখে বললেন, 'রজবকে তোমরা কি রমাদান বানিয়ে নিলে নাকি? খেজুরের টুকরি এবং পানির মশক ভেঙে ফেলতে চাও?'

ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما তো গোটা রজব মাসেই নফল সিয়াম পালন করা অপছন্দ করতেন।

⇨ **যাকাত প্রদান** : অনেক দেশের লোকেরা রজব মাসে যাকাত প্রদান করায় অভ্যস্ত। হাদীসে এর বিশেষ কোনো ফযিলত বর্ণিত হয়নি বা সালাফের কেউ এমনটা বর্ণনা করেননি। তবে হ্যাঁ, রমাদানে সাদাকাহর বিশেষ ফযিলত আছে। তখন যাকাত প্রদানে বিশেষ সাওয়াব মিলে থাকে। উসমান رضي الله عنه সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি মিম্বরে উঠে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'এটা তোমাদের যাকাতের মাস। কারও ঋণ থাকলে সে ঋণ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট (নিসাব পরিমাণ) সম্পদের যাকাত দাও।'

যাকাত মূলত ফরয হয় নিসাব পূর্ণ হয়ে বছর অতিক্রান্ত হলে। নিসাব পূর্ণ হওয়ার পর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার হিসাব প্রত্যেকের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। বছরের যে-কোনো মাসে এটা হতে পারে।

⇨ **রজব মাসে উমরাহ পালন** : ইবনু উমার رضي الله عنهما একবার বললেন, 'নবি ﷺ রজব মাসে উমরাহ পালন করেছেন।' তখন আয়িশা رضي الله عنها তাঁর সামনেই এ কথা অস্বীকার

করলেন। ইবনু উমার ﵄ তখন নীরব ছিলেন।[২০০]

আয়িশা ﵂ ও ইবনু উমার ﵄ এ মাসে উমরাহ পালন করেছেন। ইবনু সীরীন ﵀ বর্ণনা করেছেন, সালাফগণ রজব মাসে উমরাহ পালন করতেন। কারণ এক সফরে হাজ্জ করা এবং হাজ্জের মাসের বাইরে অন্য সফরে উমরাহ পালন করা উত্তম। তাহলেই হাজ্জ এবং উমরাহ পালন পূর্ণ হবে। উমার, উসমান এবং আলি ﵃-সহ অনেক সাহাবিই এমনটা বলেছেন।

[২০০] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৭৭৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১২৫৫

শাবান মাসে পালনীয়

প্রথম পর্ব : নবি ﷺ-এর সিয়াম

উসামা ইবনু যায়িদ رضي الله عنه বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে ধারাবাহিক সিয়াম রাখতে থাকতেন যে আমরা বলতাম, তিনি বোধহয় সিয়াম ছাড়বেন না। আবার এমনভাবে সিয়াম ছাড়া থাকতেন যে মনে হতো তিনি আর সিয়ামই পালন করবেন না। তবে জুমুআর দিন থেকে দুটি দিন ছিল ব্যক্তিক্রম। ধারাবাহিক সিয়াম অবস্থায়ও তিনি সে দুটি দিন সিয়াম পালন করতেন, আবার ছাড়াকালীনও সে দুটিতে সিয়াম রাখতেন। শাবান মাসের চেয়ে অন্য কোনো মাসে তিনি ততটা সিয়াম পালন করতেন না। একবার আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সিয়াম পালন করতে থাকলে মনে হয় যেন সিয়াম ছাড়বেনই না। আর সিয়াম ছাড়া থাকলে মনে হয় সিয়ামই পালন করবেন না। তবে দুটি দিনের কথা ভিন্ন। যখন একনাগাড়ে সিয়াম পালন করতে থাকেন, তখন সে দিন দুটিতেও সিয়াম রাখেন। আবার সিয়াম ছাড়া অবস্থাতেও দিন দুটিতে ঠিকই সিয়াম পালন করেন।' নবিজি ﷺ বললেন, 'কোন দিন দুটি?' আমি বললাম, 'সোম এবং বৃহস্পতিবার।' তিনি বললেন,

«ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»

'সে দিন দুটিতে বান্দার আমল আল্লাহর সামনে পেশ করা হয়। আমার আকাঙ্ক্ষা—আমল পেশ করার সময় আমি যেন সিয়াম অবস্থায় থাকি।'

উসামা رضي الله عنه বলেছেন, তখন আমি বললাম, শাবান মাসে আপনি যত সিয়াম পালন করেন অন্য কোনো মাসে আপনাকে এত সিয়াম পালন করতে দেখিনি। তিনি বললেন,

«ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»

‘রজব এবং রমাদানের মধ্যবর্তী সে মাসে মানুষ উদাসীন থাকে। এ মাসে আল্লাহর কাছে বান্দার আমল পেশ করা হয়। আমার আকাঙ্ক্ষা—আমার আমল পেশ করার সময় আমি যেন সিয়ামরত থাকি।’[২০১]

এই হাদীসে নবি ﷺ-এর সারা বছরের সিয়াম, সাপ্তাহিক সিয়াম এবং বিভিন্ন মাসের সিয়ামের আলোচনা এসে গেছে। সারা বছরের সিয়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে, নবি ﷺ মাঝে মাঝে একনাগাড়ে সিয়াম পালন করতেন, মাঝে মাঝে করতেন না। যখন সিয়াম পালন করতেন তখন বলা হতো যে তিনি বোধহয় সিয়াম ছাড়বেন না। আবার তাঁকে সিয়াম ছাড়া দেখে বলা হতো যে তিনি সিয়াম পালন করবেন না।

নফল আমল পালনে শারীআর দৃষ্টিভঙ্গি

ইফতার না করে লাগাতার সিয়াম পালন করা নবি ﷺ অপছন্দ করতেন। তিনি নিজেও এমনটা করতেন না। সহীহ বুখারি এবং সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনু আমর رضي الله عنه বলেছেন, নবি ﷺ আমাকে বললেন, ‘তুমি নাকি দিনে সিয়াম পালন করো এবং রাত জেগে সালাত আদায় করো?’ আমি বললাম, ‘জি হ্যাঁ।’ তিনি বললেন,

«فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ، وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ»

‘এমনটা করতে থাকলে তো তোমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। নিজের প্রতি তোমার (যেমন) অধিকার আছে, তেমনি তোমার পরিবার-পরিজনেরও রয়েছে। কাজেই তুমি সিয়াম পালন করবে এবং বাদও দেবে। রাত জেগে ইবাদাত করবে, আবার ঘুমিয়েও নেবে।’[২০২]

আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ-এর ক’জন সাহাবি উম্মুল মুমিনীনদের কাছে তাঁর গোপন ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারপর ওই সাহাবিদের একজন বললেন, আমি কখনো বিয়ে করব না। অন্যজন বললেন, আমি কখনো

---

[২০১] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ২১৭৫৩, হাসান

[২০২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১১৫৩

গোশত খাব না। আবার কেউ বললেন, আমি কখনো বিছানায় ঘুমাব না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে বললেন,

«مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ،
فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

'লোকদের কী হয়েছে যে, তারা এমন এমন কথা বলছে? কিন্তু আমি তো (রাতে) সালাত আদায় করি আবার নিদ্রাও যাই। সিয়াম পালন করি আবার বাদও দিই। আর আমি বিয়েও করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।'[২০৩]

সহীহ বুখারিতে আছে, সালমান এবং আবুদ দারদা ﵄-কে নবিজি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। একবার সালমান ﵁ আবুদ দারদা ﵁-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। এসে উম্মুদ দারদা ﵂-কে মলিন কাপড় পরা অবস্থায় দেখতে পেলেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে উম্মুদ দারদা ﵂ বললেন, 'আপনার ভাই আবুদ দারদার তো পার্থিব কোনো কিছুর প্রতি আকর্ষণ নেই।'

কিছুক্ষণ পর আবুদ দারদা ﵁ এসে সালমান ﵁-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করালেন। এরপর বললেন, 'আপনি খেয়ে নিন, আমি সিয়াম পালন করছি।' সালমান ﵁ বললেন, 'আপনি না খেলে আমিও খাব না।'

আবুদ দারদা ﵁ তখন সালমান ﵁-এর সঙ্গে খেলেন। রাতে আবুদ দারদা ﵁ সালাতে দাঁড়াতে গেলে সালমান ﵁ বললেন, 'এখন ঘুমিয়ে পড়ুন।' আবুদ দারদা ﵁ শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার সালাতে দাঁড়াতে উদ্যত হলে সালমান ﵁ বললেন, 'ঘুমিয়ে যান।' অবশেষে রাতের শেষভাগে আবুদ দারদা ﵁-কে ডেকে সালমান ﵁ বললেন, 'এখন দাঁড়ান।' এরপর তাঁরা দুজনে সালাত আদায় করলেন।

পরে আবুদ দারদা ﵁-কে সালমান ﵁ বললেন, 'আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের (যেমন) অধিকার আছে, তেমনি নিজের প্রতিও আপনার অধিকার রয়েছে। আবার আপনার পরিবারেরও অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক অধিকারীকে তার অধিকার প্রদান করুন।' আবুদ দারদা ﵁ পরে নবি ﷺ-এর কাছে গিয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা জানালেন।

---

[২০৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৪০১; সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৫০৬৩

(সব শুনে) নবি ﷺ বললেন,

«صَدَقَ سَلْمَانُ»

'সালমান ঠিকই বলেছে।'[২০৪]

অন্য বর্ণনামতে নবি ﷺ বলেছিলেন,

«مَا لِسَلْمَانَ ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ؟ لَقَدْ أُشْبِعَ مِنَ الْعِلْمِ»

'সালমান খুব চমৎকার কথা বলেছে! তাকে তো ইলম দ্বারা ভরপুর করে দেওয়া হয়েছে।'[২০৫]

তদ্রূপ আমর ইবনিল আস رضي الله عنه-এর ছেলে আবদুল্লাহ رضي الله عنه-কে লাগাতার সিয়াম পালন করতে দেখে নবি ﷺ নিষেধ করেন। এর পরিবর্তে তাকে দাঊদ عليه السلام-এর মতো একদিন পরপর সিয়াম পালনের পরামর্শ দেন। আর বলেন,

«لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ»

'এর থেকে উত্তম হতেই পারে না।'[২০৬]

সুতরাং শ্রেষ্ঠতম নফল সিয়াম সেটাই, যা পালন করলে আল্লাহর হক বা বান্দার হক পালনের ক্ষেত্রে শারীরিক দুর্বলতাজনিত অপারগতা সৃষ্টি না হয়। কারণ, যে আমল করলে তার চেয়ে উত্তম আমল পালনের ক্ষেত্রে দুর্বলতা অনুভূত হয়, এমন আমল না করাই ভালো।

আল্লাহর হকের উদাহরণ হলো সালাত, যিকর অথবা ইলম অর্জনে দুর্বলতা বোধ হলে নফল সিয়াম ত্যাগ করা। যেমন (শুধু) জুমুআর দিন এবং আরাফার দিন ময়দানে অবস্থানকারীদের সিয়াম পালন করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা সিয়ামের কারণে সৃষ্ট দুর্বলতা দিন দুটিতে যিকর এবং দুআয় বিঘ্নতা সৃষ্টি করবে।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ رضي الله عنه নফল সিয়াম কম পালন করতেন। এ ব্যাপারে তিনি বলতেন, 'নফল সিয়াম পালন করলে আমি কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি না। আর কুরআন তিলাওয়াত আমার কাছে অন্যান্য নফল আমলের তুলনায় বেশি

[২০৪] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৯৬৭

[২০৫] তাবারানি, আলমু'জামুল আওসাত, হাদীস নং : ৭৬৩৭

[২০৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৫৯

পছন্দনীয়।'

সুতরাং নফল সিয়াম পালন থেকে কুরআন তিলাওয়াত করা উত্তম। সুইফয়ান সাওরি ﷺ-সহ অন্য ইমামগণ এ কথাই বলেছেন। তদ্রুপ উপকারী ইলম শেখা এবং শেখানো নফল সিয়াম থেকে উত্তম।

আর ইমাম চতুষ্টয় এ ব্যাপারে একমত যে ইলম অর্জন করা নফল সালাত থেকে উত্তম। আর নফল সালাত তো নফল সিয়াম থেকে উত্তম। তাই ইলম অর্জন-যে নফল সিয়াম থেকে উত্তম হবে, সেটা তো বলাই বাহুল্য। ইলম হলো মূর্খতা এবং প্রবৃত্তির অন্ধকারে দীপ্তি ছড়ানো আলো। সুতরাং আলো ছাড়া অন্ধকারে পথ চলতে গেলে খাদে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতেই পারে।

ইবনু সীরীন ﷺ বলেছেন, একদল লোক ইলম অর্জন না করেই মাসজিদে পড়ে থাকে। তাদের সালাত-সিয়াম হয় ইলম ছাড়া। আল্লাহর কসম! ইলম ছাড়া আমল তো লাভের চেয়ে ক্ষতিই করে বেশি।

বান্দার আবশ্যক হক (লঙ্ঘনের) উদাহরণ হলো পরিবারের জন্য উপার্জন কিংবা জীবনসঙ্গীর অধিকার আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়া। এমনটা হলে নফল সিয়াম ত্যাগ করাই উত্তম। এদিকে ইঙ্গিত করেই নবি ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»

'তোমার প্রতি তোমার পরিবারেরও অধিকার রয়েছে।'[২০৭]

'নিজের প্রতিও আপনার অধিকার রয়েছে। ... প্রত্যেক হকদারকে তার অধিকার প্রদান করুন।' এ কথা বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে আদম-সন্তানের কাছে তার নিজের সত্তাকে আমানত রাখা হয়েছে। এর অধিকার রক্ষার দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছে। যার অন্যতম অধিকার হলো কবরে যাওয়া পর্যন্ত তার সাথে সদয় আচরণ করা।

হাসান ﷺ বলতেন, 'তোমাদের সত্তা আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছার বাহনস্বরূপ। সুতরাং নিজেদের বাহনগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। যাতে সেগুলো আল্লাহ তাআলার কাছে তোমাদেরকে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দিতে পারে।'

সুতরাং ইবাদাতে সহায়ক হবে এ নিয়তে নিজের প্রতি যত্নবান হলে সাওয়াব

[২০৭] আবূ দাউদ, আসসুনান, হাদীস নং : ২৪৩২

মিলবে। এজন্যই মুআয ﵁ বলতেন, 'আমি ইবাদাতের মতো ঘুমের মাধ্যমেও সাওয়াবের প্রত্যাশা করি।'[২০৮]

এর বিপরীতে নিজের যত্ন না নিয়ে দুর্বল এবং ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেটা অবিচার হবে। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁-কে এটা বোঝানোর জন্যই নবিজি ﷺ বলেছিলেন, 'এমন করতে থাকলে তো তোমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'

সুতরাং সিয়াম-জাতীয় নফল আমল মাত্রাতিরিক্ত পালনের মাধ্যমে শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতির শিকার হতে হয়। ফলে অধিক উপকারী আমলগুলো করা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। নিজের প্রতি যত্নবান হওয়ার ক্ষেত্রে নবি ﷺ মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতেন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন পূর্ণ ন্যায়বান। তাই তিনি নফল সিয়াম পালন করতেন আবার ছেড়ে দিতেন। রাতে ঘুমাতেন, আবার ইবাদাতও করতেন। তিনি বিবাহও করেছিলেন। মিষ্টান্ন, মধু, মুরগির গোশতের মতো পুষ্টিকর খাবার যেমন খেতেন, তেমনি ক্ষুধার্ত থেকে নিজের পেটে পাথরও বাঁধতেন। মোটকথা, শোকর, সবর ও সন্তুষ্টির সমন্বয় ঘটিয়ে নিজের জন্য শ্রেষ্ঠতম অবস্থাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন।

সুতরাং দীর্ঘজীবনে শরীর শক্তিশালী হয় এমন কাজ করলে জীবনাচার হবে সহজ। পক্ষান্তরে নিজের ওপর অসাধ্য বোঝা চাপিয়ে নিলে এমন সব রোগবালাই হবে, যার দরুণ আমল আর করা হয়ে উঠবে না। বরং আমল করতে গিয়ে বিরক্তির উদ্রেক ঘটবে। ফলে অবস্থা হবে 'না ঘরকা না ঘাটকা'।

নবি -এর সিয়াম পালনের দিন

সোম এবং বৃহস্পতিবার সিয়াম পালনে নবি ﷺ বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন। যেমন আয়িশা ﵂ বলেছেন, 'নবি ﷺ বিশেষভাবে যত্নের সাথে সোম এবং বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করতেন।'[২০৯]

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ সোম এবং বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো দেখি সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করে থাকেন, (এর কারণ কী?) উত্তরে

---

[২০৮] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৪৩৪১

[২০৯] ইমাম আহমাদ, নাসায়ি, ইবনু মাজাহ এবং তিরমিযি ﵏ হুম এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম তিরমিযি ﵀ এ বর্ণনাকে হাসান বলেছেন।

তিনি বললেন,

«إِنَّ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ يَغْفِرُ اللهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ، إِلَّا مُتَهَاجِرَيْنِ، يَقُولُ: دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا»

'পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি ছাড়া সোম এবং বৃহস্পতিবারে সব মুসলিমকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন। (তাদের ব্যাপারে) তিনি (ফেরেশতাদের) বলেন, তারা আপসে নিষ্পত্তি করে নেওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের ছেড়ে দাও।'[২১০]

অধিকাংশ আলিমই সোম এবং বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব বলেছেন।

নবি -এর সিয়াম পালনের মাস

শাবান মাসে নবি ﷺ যতটা সিয়াম পালন করতেন অন্য কোনো মাসে ততটা করতেন না। আয়িশা ؓ বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি রমাদান ছাড়া কোনো সময়ে পুরো মাস সিয়াম পালন করতে দেখিনি। আর শাবান মাসের চেয়ে অন্য কোনো মাসে এত বেশি (নফল) সিয়াম পালন করতে দেখিনি।'[২১১] সহীহ বুখারির আরেক বর্ণনাতে আছে, 'তিনি পুরো শাবান মাসই সিয়াম পালন করতেন।'[২১২]

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনাতে পাওয়া যায়, সামান্য ক'দিন বাদে গোটা শাবান মাস তিনি সিয়াম রাখতেন।'[২১৩] সুনানুন নাসায়ির এক বর্ণনাতে আয়িশা ؓ বলেছেন, 'অন্যান্য মাসের চেয়ে শাবান মাসে সিয়াম পালন করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বেশি পছন্দনীয় ছিল। তিনি (সিয়াম পালনের মাধ্যমে) শাবান মাসকে রমাদানের সাথে মিলিয়ে নিতেন।'[২১৪]

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ؒ-সহ আলিমদের একটি দলের অভিমত হলো, নবি ﷺ পুরো শাবান সিয়াম রাখতেন না। বরং অধিকাংশ দিন সিয়াম পালন করতেন।

ইবনু আব্বাস ؓ থেকে বর্ণিত আছে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাদান ছাড়া অন্য কোনো মাসের পুরোটা জুড়ে সিয়াম রাখেননি।' ইবনু আব্বাস ؓ রমাদান ছাড়া অন্য

[২১০] ইবনু মাজাহ, আসসুনান, হাদীস নং : ১৭৪০

[২১১] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৯৬৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৫৬

[২১২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৯৭০

[২১৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৫৬

[২১৪] নাসায়ি, আসসুনান, হাদীস নং : ২৩৫০

কোনো মাস সম্পূর্ণ সিয়াম পালন করা অপছন্দ করতেন।[২১৫]

একটি প্রশ্ন ও উত্তর

দাঊদ ﷺ-এর মতো একদিন পরপর সিয়াম পালন করাকে নবি ﷺ উত্তম বলেছেন। কিন্তু তিনি নিজে তা করেননি কেন? তিনি তো একনাগাড়ে সিয়াম পালন করতেন, আবার ধারাবাহিকভাবে সিয়াম ছাড়া থাকতেন। আবার সোম এবং বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করতেন। কারও কারও মনে এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে।

এর উত্তর হলো : দাঊদ ﷺ-এর সিয়ামকে শ্রেষ্ঠ বলার কারণ হিসেবে অন্য হাদীসে তিনি নিজেই বলেছেন—তা লাগাতার সিয়ামের একটা অংশ। আর নবি ﷺ-এর সিয়ামগুলো একত্র করলে দেখা যাবে যে, তা লাগাতার সিয়ামের অর্ধেক বা তার চেয়ে বেশি হবে। উল্লিখিত সিয়াম ছাড়াও তিনি আশুরার দিন এবং যুলহিজ্জার ৯ তারিখে সিয়াম পালন করতেন। তাঁর অভ্যাস ছিল—একদিন পরপর সিয়াম পালন না করে বিক্ষিপ্তভাবে রাখা। কেননা, তিনি উত্তম দিনগুলোতে সিয়াম পালনের প্রতি যত্নবান ছিলেন। সিয়ামের চেয়েও উত্তম আমল, যেমন : রিসালাতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া, এর প্রচার-প্রসার ঘটানো, এ লক্ষ্যে মেহনত করা, এর হক আদায়ে সচেষ্ট থাকার জন্য শক্তি সঞ্চয়ের নিয়ত যদি থাকে, তবে দুই সিয়ামের মাঝে একাধিক দিন গ্যাপ দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। নয়তো একদিন পরপর সিয়াম পালনের দুর্বলতা, সেই মহান কর্তব্যের মধ্যে প্রভাব ফেলবে।

এজন্যই নবি ﷺ-এর কাছে দুদিন পরপর সিয়াম পালন করা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন,

«وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ»

‘আমি চাই, আমারও এতটা শক্তি হোক।’[২১৬]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর رضي الله عنهما বৃদ্ধ বয়সে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য একাধারে কিছুদিন নফল সিয়াম থেকে বিরত থাকতেন। এরপর ছুটে যাওয়া সিয়াম-সহ পুনরায় আদায় করা শুরু করতেন। নবিজির নির্দেশিত লাগাতার সিয়ামের একাংশের প্রতি তিনি ছিলেন যত্নবান।

সারকথা হলো, বিক্ষিপ্ত সিয়ামের মাধ্যমে নবি ﷺ লাগাতার সিয়ামের একাংশের

---

[২১৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৫৭; সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৯৭১

[২১৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৬২

সাওয়াব এবং তার চেয়ে বেশি সাওয়াব পেয়েছেন। তেমনি আকাঙ্ক্ষা থাকার কারণে সাওয়াব পেয়েছেন ধারাবাহিক সিয়ামেরও। অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ আমলের জন্যই তিনি ধারাবাহিক সিয়াম থেকে বিরত থাকতেন।

একটি কথার ব্যাখ্যা

'রজব এবং রমাদানের মধ্যবর্তী সময়ে মানুষ কি উদাসীন থাকে?' আসলে এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, লোকমুখে যে স্থান, সময় বা মানুষ শ্রেষ্ঠ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে তার বাইরেও শ্রেষ্ঠত্ব থাকতে পারে। সেই শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে স্বাভাবিকভ কারণে, হতে পারে কোনো বিশেষ কারণে। বিষয়টি অধিকাংশ মানুষের না-জানা থাকার কারণে তারা প্রসিদ্ধ বিষয়টি নিয়ে মজে থাকে। আর অপ্রসিদ্ধ বিষয়টির ফযিলত তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

হাদীসের এ অংশটি মানুষ জানে না। রজব এবং রমাদানের মধ্যবর্তী সময়ে ইবাদাত করা যে মুস্তাহাব, এটি তার দলিল। এমন সময় আমল করা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়। যেমন একদল সালাফ মাগরিব এবং ইশার মধ্যবর্তী সময় সালাতে কাটিয়ে দিতেন। তাদের বক্তব্য ছিল, 'এ সময় মানুষ বেখবর থাকে।' তদ্রুপ মধ্যরাতে সালাত আদায়ের ফযিলত বেশি হওয়ার কারণ এটাও যে, সে-সময় অধিকাংশ মানুষ গাফিলতির চাদর মুড়ি দিয়ে থাকে। আর নবি ﷺ বলেছেন,

«أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ.»

'রাতের শেষভাগে বান্দা তার রবের সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করে থাকে। সে সময়টাতে যদি তুমি আল্লাহর যিকরকারীদের একজন হতে সক্ষম হও, তবে হয়ে যেয়ো।'[২১৭]

এ কারণেই নবি ﷺ ইশার সালাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করতে চাইতেন। তবে মানুষের কষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তা পরিহার করেছেন। একবার ইশার সালাতের জন্য বের হয়ে অপেক্ষমাণ সাহাবিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন,

«مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ»

[২১৭] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৩৫৭৯

'তোমরা ছাড়া পৃথিবীর কেউই এই সালাতের জন্য অপেক্ষা করছে না।'[২১৮]

যে সময় কোনো যিকরকারী পাওয়া যায় না, তখন এককভাবে আল্লাহর যিকর করে ফযিলত লাভের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই হাদীসে।

নির্জনে ইবাদাতের ফায়দা

১. ইবাদাতটি অধিকতর গোপনে হয়। আর নফল আমল যত বেশি গোপনে করা যায়, ততই ভালো। বিশেষত সিয়াম পালন। কারণ এটা আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যকার বিষয়। এজন্য বলা হয়, সিয়ামে রিয়া তথা লৌকিকতার কিছু নেই।

সালাফের মাঝে এমন ব্যক্তি ছিলেন যিনি চল্লিশ বছর ধরে সিয়াম পালন করেছেন, কিন্তু কেউ জানতেও পারেনি। তাঁর দোকান ছিল। প্রতিদিন ঘর থেকে দোকানে যাওয়ার সময় দুটি রুটি নিয়ে বের হতেন এবং পথিমধ্যে সেগুলো সাদাকাহ্ করে দিতেন। ঘরের লোকেরা ভাবত, দোকানে বসে খাওয়ার জন্য তিনি রুটি নিয়ে গিয়েছেন। আর বাজারের লোকেরা ভাবত, তিনি ঘর থেকে খেয়ে এসেছেন। সিয়াম পালনকালীন এমন ভাব প্রকাশ করতেন, যাতে সিয়ামের ব্যাপারটি গোপন থাকে। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ ﵁ বলতেন, 'সিয়াম পালন করলে তেল ব্যবহার করবে।'

কাতাদাহ ﵀ বলেন, 'সিয়ামের ক্লান্তি গোপন করার জন্য রোজাদারের তেল ব্যবহার করা মুস্তাহাব।'

আসলে সত্যনিষ্ঠগণের সত্যতার সুবাস সব গোপনীয়তাকে ছাপিয়ে বেরিয়ে আসে। আর সিয়ামের সুবাস তো মিশক থেকেও উত্তম। লুকিয়ে রাখলেও মুমিনের অন্তর তার ঘ্রাণ টের পেয়ে যায়। এর সুবাস ছড়ায় সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে। আবার কেউ গোপনে আমল করলেও আল্লাহ্ তাআলা এর বিনিময় প্রকাশ্যে দান করবেন।

২. তা নফসের জন্য কষ্টকর। আর নফসের জন্য যে আমল কষ্টকর, তা সর্বোত্তম। কারণ নফসের অভ্যাস এমন যে, সে সমজাতীয়দের অবস্থা দেখে সান্ত্বনা লাভ করে। মানুষের সচেতনতা এবং ইবাদাতের পরিমাণ বেশি হলে অনুসারীদের আধিক্যের কারণে ইবাদাতকারীর সংখ্যাও বেড়ে যায়। ফলে ইবাদাত হয়ে যায় সহজলভ্য। পক্ষান্তরে গাফিলতি এবং উদাসীন লোকের সংখ্যা বেশি হলে

২১৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৬৩৬; সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৫৭০

নফস তখন গাফিলদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে সান্ত্বনা লাভ করে থাকে। ফলে সচেতন ব্যক্তির সংখ্যা কমে যায়। আর তখন ইবাদাত করাটা নফসের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। এ অর্থেই নবি ﷺ বলেছেন,

«لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ»

'ফিতনার সময় যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, সে ব্যক্তি তার মতো পঞ্চাশ জন আমলকারীর সমান সাওয়াব পাবে।'[২১৯]

নবি ﷺ বলেছেন,

«بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»

'ইসলাম শুরুতে অপরিচিত ছিল, অচিরেই তা আবার অপরিচিত হয়ে পড়বে। সুতরাং অপরিচিতদের জন্য মুবারকবাদ।'[২২০]

অপরিচিত কারা জিজ্ঞেস করা হলে নবি ﷺ বললেন,

«الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ»

'যারা বিভ্রান্ত মানুষকে সংশোধন করে থাকে।'[২২১]

মুসনাদু আহমাদ-এ বর্ণিত হয়েছে,

«الْعِبَادَةُ فِي الْفِتْنَةِ كَالْهِجْرَةِ إِلَيَّ»

'ফিতনার সময় ইবাদাত আমার কাছে হিজরত করার সমতুল্য।'[২২২]

ফিতনার সময় মানুষ দ্বীনের দিকে না ফিরে নিজের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং এমন অবস্থায় দ্বীনকে আঁকড়ে ধরা, মানুষ থেকে পৃথক হয়ে আল্লাহর ইবাদাত করা, তাঁর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান এবং অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকাটা জাহিলি যুগে নবিজির প্রতি ঈমান এনে ও তাঁর বিধিনিষেধ মেনে নিয়ে তাঁর কাছে হিজরত করার সমতুল্য।

---

[২১৯] আবূ দাউদ, আসসুনান, হাদীস নং : ৪৩৪১, হাসান; তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং :৩০৫৮

[২২০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৪৫

[২২১] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ১৬৬৯০

[২২২] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ২০৩১১

৩. গুনাহগার এবং উদাসীন ব্যক্তিদের মাঝে থেকে একাকী ইবাদাত করার দ্বারা, অনেক সময় মানুষের ওপর আসতে থাকা বিপদ প্রতিহত হয়। এমন ইবাদাতকারী মানুষকে হেফাজত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

রমাদানের কাযা সিয়ামের মাসআলা

রমাদানের কাযা সিয়াম যদি সামর্থ্যবান কারও জিম্মায় থাকে, তা আদায় করে নেওয়া উচিত। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া পরবর্তী রমাদানের পর পর্যন্ত তা পেছানো জায়েয নেই।

যদি কেউ পিছিয়েই দেয়, কোনো ওজরবশত দুই রমাদানের মাঝামাঝি আদায় করতে চায়, তাহলে দ্বিতীয় রমাদানের পরই তা সেরে নেওয়া ওয়াজিব হবে। তবে কাযার সাথে অন্য কিছু তার ওপর ওয়াজিব হবে না। আর কেউ যদি ওজর ছাড়াই কাযা আদায় না করে পিছিয়ে দিয়ে থাকে, তবে ইমাম মালিক, শাফিয়ি এবং আহমাদ ﷬-এর মতে কাযা করার সাথে সাথে প্রতিদিন একজন মিসকিনকে আহার করাতে হবে। তাদের দলিল হলো এ সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীস।

আর ইমাম আবূ হানীফা ﷬-এর মতে স্রেফ কাযা করবে। মিসকিনকে আহার করাতে হবে না।[২২৩]

দ্বিতীয় পর্ব : অর্ধ-শাবানের আলোচনা

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا»

‘শাবান মাস অর্ধেক হয়ে গেলে তোমরা আর সিয়াম পালন করো না।’[২২৪]

ইমাম তিরমিযি, ইবনু হিব্বান, হাকিম, ত্বহাবি এবং ইবনু আবদিল বার্ ﷬-সহ

[২২৩] আবূ হানীফা ﷬-এর দলিল হলো, সিয়ামের কাযা সম্পর্কে কুরআনে فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (তাহলে অপর দিনগুলোতে তা আদায় করে নেবে) বলা হয়েছে। এখানে স্রেফ অন্য দিনগুলোতে কাযা করার কথা বলা হয়েছে; মিসকিন খাওয়ানোর কথা বলা হয়নি। সুতরাং আয়াতের ব্যাপকতার মাঝে শর্তযুক্ত করা ঠিক হবে না।

[২২৪] আবূ দাউদ, আসসুনান, হাদীস নং : ২৩৩৭; তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৭৩৮

অনেকেই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তবে তাঁদের থেকেও বড় এবং জ্ঞানী যেমন আবদুর রহমান ইবনু মাহদি, ইমাম আহমাদ, আবূ যুরআ এবং আসরাম ﵀-এর মতে হাদীসটি মুনকার।

আহমাদ ﵀ বলেছেন, 'আলা বর্ণিত হাদীসগুলোর মাঝে এ হাদীসটি সর্বাধিক মুনকার।' প্রত্যুত্তরে তিনি নিচের হাদীসটি পেশ করেন, যাতে নবি ﷺ বলেছেন,

لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

'রমাদানের এক বা দুদিন আগে সিয়াম পালন করো না।'

এ থেকে বুঝে আসে, রমাদানের দুদিন বাকি থাকার আগে সিয়াম পালন করা যাবে।

আসরাম ﵀ বলেছেন, 'সমস্ত হাদীসই এ হাদীসের বিপরীত।' এ কথার দ্বারা তিনি নবি ﷺ-এর গোটা শাবান মাস সিয়াম পালন করা, সিয়াম পালনের মাধ্যমে শাবান মাসকে রমাদানের সাথে মিলিয়ে নেওয়া এবং রমাদানের দুদিন আগে সিয়াম পালনের নিষেধাজ্ঞা-সম্বলিত হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ফলে আলা ﵀ বর্ণিত হাদীসটি সহীহ হাদীসগুলোর বিপরীত হওয়ার কারণে 'শায' হয়ে যাবে। ত্বহাবি ﵀-এর মতে হাদীসটি মানসূখ। হাদীসটির ওপর আমল পরিত্যাগ করার ব্যাপারে তিনি ইজমা বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে হাদীসটি আমলযোগ্য নয়।

পনেরো শাবানের সিয়াম

এতক্ষণ আলোচনা হলো অর্ধ শাবানের পরে সিয়াম পালন নিয়ে। কিন্তু পনেরো শাবানে সিয়াম পালন করা নিষেধ নয়। কারণ, তা আইয়ামু বীয এর অন্তর্ভুক্ত। প্রতি মাসের এই দিনগুলোতে সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব। এছাড়াও বিশেষভাবে সেদিন সিয়াম পালনের ব্যাপারে কোনো কোনো বর্ণনাতে আদেশ এসেছে। যেমন সুনানু ইবনু মাজাহ-তে আলি ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবি ﷺ বলেছেন,

«إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.»

'মধ্য শাবানের রাত এলে তাতে তোমরা সালাত আদায় করো এবং দিনে সিয়াম পালন করো। কেননা এদিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর নিকটস্থ আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আছ আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। রিযকপ্রার্থী কেউ আছ কি? আমি তাকে রিযক দান করব। কে আছ রোগগ্রস্ত? আমি তাকে নিরাময় দান করব। কে আছ? কে আছ? ফজরের সময় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (তিনি এভাবে আহ্বান করে চলেন)।'[২২৫]

মধ্য শাবানের রাতের ফযিলত

মধ্য শাবানের রাতের ফযিলত সম্পর্কে ভিন্ন কিছু হাদীস রয়েছে। সেসব হাদীসের হুকুম নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিস সেগুলোকে যয়ীফ বললেও ইবনু হিব্বান ﷺ কিছু হাদীসকে সহীহ বলেছেন এবং সেগুলো তাঁর লিখিত 'সহীহ' এ এনেছেন। যেমন আবূ মূসা আশআরি ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ»

'মধ্য শাবানের রাতে আল্লাহ রহমতের দৃষ্টি দেন। তারপর মুশরিক এবং বিদ্বেষ পোষণকারী ছাড়া সৃষ্টির সবাইকে তিনি ক্ষমা করে দেন।'[২২৬]

খালিদ ইবনু মা'দান, মাকহুল, লুকমান ইবনু আমির ﵏-সহ শামের প্রমুখ তাবিয়িগণ এ রাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। তাঁরা এ রাতে গুরুত্বের সাথে ইবাদাত করতেন। তাঁদের থেকেই সাধারণ লোকেরা এ রাতের ফযিলত এবং গুরুত্ব প্রদানের বিষয় শিখেছে। কথিত আছে, তাঁদের কাছে এ সংক্রান্ত কিছু ইসরাঈলি বর্ণনা এসেছিল। পরে বিষয়টি প্রসিদ্ধ হয়ে গেলে মানুষের মাঝে তা নিয়ে মতাবিরোধের সূত্রপাত হয়। বসরার সূফিরা-সহ অনেকেই এ মত গ্রহণ করে নেন। আতা, ইবনু আবী মুলাইকা ﵏-সহ হিজাযের অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম তা গ্রহণ করেননি। আবদুর রহমান ইবনু যায়িদ ইবনি আসলাম মদীনাবাসী ফকীহদের সম্পর্কে এমনটাই বর্ণনা করেছেন। মালিক ﵀-এর ছাত্রগণ এবং অন্যরা এমনটাই বলেছেন। সবাই এটাকে সম্পূর্ণ বিদআত আখ্যা দিয়েছেন।

[২২৫] সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদীস নং : ১৩৮৮

[২২৬] সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদীস নং : ১৩৯০

এ রাতে করণীয়

এ রাতে ক্ষমা প্রাপ্তি এবং দুআ কবুল হওয়ার প্রতিবন্ধক গুনাহগুলো থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কর্তব্য। এই প্রতিবন্ধকগুলো হলো : শিরক, মানুষ হত্যা এবং ব্যভিচার। এই গুনাহ তিনটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে গুরুতর। যেমনটা আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন,

«أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ»

'কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোনটি? তিনি জবাব দিলেন,

«أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ»

'খাবারে ভাগীদার হবে এ আশঙ্কায় নিজের সন্তানকে হত্যা করা।'

আমি বললাম, এরপর? তিনি বললেন,

«أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»

'প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।'

তখনই নবি ﷺ-এর কথার সমর্থনে নাযিল হলো,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

"এবং তারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে, সে শাস্তি ভোগ করবে।"[২২৭]

---

[২২৭] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৬০০১; আয়াতটি সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৮

আল্লাহর মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, ঘৃণা-বিদ্বেষ। কুপ্রবৃত্তির কারণে কোনো মুসলিমের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। শুধু যে এই সময় তা নয়; এ কাজের মাধ্যমে মাগফিরাত এবং রহমতের অনেক ক্ষণেই মানুষ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। যেমন আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

«تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ
شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا»

'প্রতি সোম এবং বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো উন্মুক্ত করা হয়। এরপর এমন সব বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যারা আল্লাহর সঙ্গে শরিক স্থাপন করে না। তবে সে ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না, যার ভাই এবং তার মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান। তখন (তাদের ব্যাপারে) বলা হয়, এই দুজনকে আপসে রফা করে নেওয়ার জন্য অবকাশ দাও।'[২২৮]

শ্রেষ্ঠতম আমল

অতএব শ্রেষ্ঠতম আমল হচ্ছে অন্তরকে সবধরনের বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখা। এটার সর্বোচ্চ স্তর হলো প্রবৃত্তির অনুসারী এবং সেসব বিদআতিদের প্রতি বিদ্বেষ না রাখা, যারা উম্মাতের পূর্ববর্তীদের সমালোচনা করে, তাঁদেরকে ঘৃণা করে এবং তাঁদের ব্যাপারে কুফরি, বিদআতী কিংবা গোমরাহির আকিদা পোষণ করে। এর পরবর্তী স্তর হলো সাধারণ মুসলমানদের প্রতি কোনোরূপ বিদ্বেষ না রাখা, তাদের কল্যাণ কামনা করা। এবং নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অপরের জন্য তাই পছন্দ করা। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছে বলেছেন :

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং আমাদের ভাইদের ক্ষমা করে দিন যারা ঈমানে আমাদের অগ্রগামী হয়ে গেছে এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো রকম বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো দয়ার্দ্র, পরম করুণাময়।"[২২৯]

---

[২২৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৫৬৫

[২২৯] সূরা হাশর, ৫৯ : ১০

আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, সাহাবিদের উদ্দেশ্যে নবি ﷺ পরপর তিনদিন বলেছিলেন, 'তোমাদের সামনে একজন জান্নাতি লোক আসবে।' ঘটনাচক্রে তিনদিন একই ব্যক্তি এসেছেন। তখন নবি ﷺ-এর কথার উদ্দেশ্য বোঝার জন্য আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁ সে ব্যক্তির আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। তিনি কী এমন আমল করেন সেটা দেখার জন্য তিনদিন তাঁর সাথে রাত কাটান। কিন্তু তাঁকে তেমন কোনো বেশি আমল করতে দেখেননি। তারপর তাঁকে সবকিছু খুলে বললে তিনি জানান, 'আমার আমল তো আপনি যেটা দেখলেন সেটাই। তবে আমি অন্তরে কোনো মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি না।' তখন আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁ বললেন, 'এই আমলের মাধ্যমেই আপনি এই মর্যাদা পেয়েছেন।'[২৩০]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানতে চাওয়া হলো, 'কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম?' তিনি বললেন,

«كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ»

'বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী প্রতিটি সত্যভাষী ব্যক্তি (উত্তম)।' তাঁরা বললেন, 'সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তিকে কীভাবে চিনব?'

নবি ﷺ বললেন,

«هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيَ، وَلَا غِلَّ، وَلَا حَسَدَ»

'সে হলো পূত-পবিত্র ব্যক্তি, যার কোনো গুনাহ নেই, (যার অন্তরে) নেই কোনো জেদ, বিদ্বেষ এবং অহমিকা।'[২৩১]

জনৈক সালাফ বলেছেন, শ্রেষ্ঠতম আমল হলো মনের স্বচ্ছতা, ব্যক্তির উদারতা এবং উম্মাতের প্রতি কল্যাণকমিতা। এই গুণগুলোর মাধ্যমে এমন পর্যায়ে পৌঁছা যায়, যেখানে পৌঁছতে অনেক সাধনার সালাত এবং সিয়াম প্রয়োজন হয়।

অতএব ভাইয়েরা! এমন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকুন যা রহমত, তাওবা এবং ইসতিগফারের মৌসুমেও পরম ক্ষমাশীল মনিবের ক্ষমা থেকে বঞ্চিত করবে।

---

[২৩০] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ১২৬৯৭

[২৩১] সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদীস নং : ৪২১৬

এগুলো হলো :

১. শিরক করা

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾

"কেউ আল্লাহর সাথে শরিক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার আবাস (হবে) জাহান্নাম। আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।"[২৩২]

২. নরহত্যা করা

আকাশ এবং পৃথিবীর সবাই মিলে যদি একজন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে আল্লাহ তাদের সবাইকে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলবেন।

৩. ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া

সাবধান! আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হওয়া থেকে বেঁচে থাকুন। সৃষ্টির সবাই তাঁর বান্দা অথবা বান্দি। আল্লাহর চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন কেউ নেই। তাঁর কোনো বান্দা অথবা বান্দি ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, এটা তিনি মেনে নিতে পারেন না। এজন্য তিনি অশ্লীলতা নিষিদ্ধ করেছেন এবং দৃষ্টি নত রাখার আদেশ দিয়েছেন।

৪. মনে বিদ্বেষ রাখা

মনের মধ্যে অপরের প্রতি মন্দ ধারণা পুষে রাখছেন এবং তার ক্ষতি করবেন ভাবছেন! আল্লাহ কী বলেন, দেখুন।

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَـٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَـٰرُ ﴿٤٢﴾

"যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আপনি কখনো আল্লাহকে উদাসীন মনে করবেন না। আসলে তিনি তো তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ

[২৩২] সূরা মায়িদা, ৫ : ৭২

দিচ্ছেন, যেদিন তাদের চোখ স্থির হয়ে যাবে।"[২৩৩]

সবাইকে যখন তিনি মাফ করে দেবেন, আপনাকে তখন বঞ্চিত করবেন। এটাই এ পাপের সবচেয়ে বড় শাস্তি। সুতরাং বড় বড় মিথ্যা আশার ফাঁদে পা দেবেন না। অন্যায় করে উল্লসিত না হয়ে, মৃত্যুর ব্যাপারে ভীত থাকুন। কারণ, মালাকুল মাউত কার ওপর কখন হামলে পড়বে, সেটা কারও জানা নেই। জনৈক সালাফ বলেছেন, 'কত ভবিষ্যতই তো পূর্ণ হয় না! কত আগামী যে বর্তমান হয় না! মৃত্যু এবং তার ছুটে আসার গতি নিয়ে ভাবলে তুমি মিছে আশার ধোঁকায় পড়তে না।'

তৃতীয় পর্ব : শাবানের শেষে সিয়াম পালন করা

ইমরান ইবনু হুসায়ন ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন,

«يَا أَبَا فُلَانٍ، أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟»

'হে অমুকের পিতা! তুমি কি এ মাসের শেষভাগে সিয়াম পালন করোনি?'

লোকটি উত্তর দিল, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন নবি ﷺ বললেন,

«فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ»

'তাহলে সিয়াম পালন শেষে দুদিন সিয়াম পালন করে নিয়ো।'[২৩৪]

এটা হলো সহীহ বুখারির বর্ণনা। সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনাতে এসেছে, নবি ﷺ বলেছিলেন,

«فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ»

'তাহলে তুমি রমাদানের সিয়াম শেষ করে ওটার পরিবর্তে দুদিন সিয়াম পালন করে নিয়ো।'[২৩৫]

হাদীসে উল্লেখিত سَرَر শব্দের অর্থ কী হবে, তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ

---

[২৩৩] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪২

[২৩৪] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৯৮৩

[২৩৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৬১

মত অনুসারে এর অর্থ হলো, মাসের শেষ ভাগ। তবে অনেক আলিমই এ অর্থের ওপর আপত্তি করেছেন। কারণ আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ»

'তোমরা রমাদানের একদিন বা দুদিন পূর্বে সিয়াম পালন করবে না। হ্যাঁ, যদি কোনো ব্যক্তি এ সময় সিয়াম পালনে অভ্যস্ত থাকে, তবে সে সিয়াম পালন করতে পারে।'[২৩৬]

আবূ উবাইদ ﵀-এর মতো অনেক আলিম, খাত্তাবি ﵀-এর মতো তাঁর অনেক অনুসারী এবং অনেক হাদীসের ব্যাখ্যাকার বলেছেন, যে লোকটিকে নবি ﷺ প্রশ্ন করেছিলেন তার সিয়াম পালনের অভ্যাসের কথা নবিজির জানা ছিল। অথবা এমনও হতে পারে, ব্যক্তিটি সিয়াম পালনের মানত করেছিল। এজন্যই নবি ﷺ তাকে সিয়াম কাযা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আরেক দল আলিম বলেছেন, ইমরান ﵁ বর্ণিত হাদীস থেকে এটা বুঝে আসে, সন্দেহের দিন এবং শাবান মাসের শেষ দিন স্বাভাবিকভাবে সিয়াম পালন করা বৈধ। ব্যক্তির সেটা অভ্যাস থাকুক বা না-থাকুক। তবে আরেক হাদীসে যে নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে মূলত রমাদানের নিয়তে সিয়াম না-রাখার কথা বলা হয়েছে। এটা ইমাম মালিক ﵀-এর মাযহাব। তবে অধিকাংশ আলিমের মতে, রমাদানের আগে সিয়াম পালনের নিষেধাজ্ঞা এসেছে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে কিনা নফল সিয়ামে অভ্যস্ত। হাদীসের বাহ্যিক অবস্থা থেকে এটাই বুঝে আসে। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ আলিম হাদীসটির ব্যাখ্যায় মতপার্থক্যটি উল্লেখ করেননি। ইমাম শাফিয়ি ﵀ তাঁর ব্যাখ্যাতে এই মতটিই গ্রহণ করেছেন। পূর্ববর্তী সম্ভাবনাটি তিনি গ্রহণ করেননি। এই ব্যাখ্যা অনুসারে আবূ হুরায়রা ﵁ বর্ণিত হাদীসটিকে ইমরান ﵁ বর্ণিত হাদীসটির ওপর প্রাধান্য দেওয়া যায়। কারণ আবূ হুরায়রা ﵁ বর্ণিত হাদীসটিতে উম্মাতের জন্য ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা এসেছে। সুতরাং সেটা উম্মাতের জন্য সাধারণ নির্দেশনা হিসেবে আমলযোগ্য।

আর ইমরান ﵁ বর্ণিত হাদীসটি এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফয়সালা। সুতরাং দুটি হাদীস সমন্বয়ের জন্য আগে পালন করতে নিষেধ করা হয়নি এমন সিয়ামের ওপর তা প্রয়োগ করা হবে। তবে হাদীসটি প্রয়োগের সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো : নবিজি ﷺ যে লোকটিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তার ব্যাপারে তিনি জানতেন যে সুন্নাহর সাথে রেখে শাবান মাসের পুরোটাই বা অধিকাংশ সময় সে সিয়াম

[২৩৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১০৮২

পালন করে থাকে। তিনি কিছুদিন সিয়াম পালন করেননি বিধায় নবি ﷺ তাকে সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। মাসের শেষদিকে সে সিয়াম পালন করেনি দেখে তাকে ঈদের পরে এর কাযা করতে বললেন। কারণ শাওয়ালের প্রথম দিনটি সিয়াম পালন করা শাবানের শেষে সিয়াম পালনের মতোই। দুটিই রমাদানের সাথে সম্পৃক্ত। এ হাদীস থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রথমত নফল সিয়াম ছুটে গেলে তা কাযা করা মুস্তাহাব। দ্বিতীয়ত সাদৃশ্যপূর্ণ দিনগুলোতে যে ছুটে যাওয়া সিয়াম পালন করা হবে, তাতেও সাওয়াব পাওয়া যাবে।

মোটকথা অধিকাংশ আলিমের মতে, এ অধ্যায়ের আবূ হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণিত হাদীসটিই আমলযোগ্য। আর অভ্যস্ত নয় এমন ব্যক্তির জন্য রমাদানের এক-দুদিন আগে সিয়াম পালন করা মাকরুহ। তদ্রুপ যে ব্যক্তির আগে সিয়াম ছুটে গেছে, সে ব্যক্তিও শাবানের শেষে রমাদানের সাথে সংযুক্ত করে সেগুলো রাখতে পারবে না।

রমাদানের আগে সিয়ামের নিষেধাজ্ঞার কারণ

রমাদানের আগে সিয়াম পালন করতে নিষেধ করা হয়েছে তিন কারণে।

প্রথম কারণ : রমাদানের সতর্কতা। রমাদানের আগে সিয়াম পালন করতে নিষেধ করার কারণ হচ্ছে, রমাদানের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কিছু যাতে রমাদানের সাথে মিলে না যায়। এজন্যই ঈদের দিন সিয়াম পালন করার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। কারণ কিতাবিরা এমনটাই করত। সিয়ামের সাথে তারা নিজেদের মনগড়া মতামত মিলিয়ে নিত।

এরপরও দেখা যেত, সালাফের অনেকে সতর্কতাবশত রমাদানের আগেই সিয়াম শুরু করতেন। এ হাদীসটি তাদের বিপক্ষে প্রমাণ। কারণ সন্দেহপূর্ণ দিনে সিয়াম পালনে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আম্মার رضي الله عنه বলেছেন, সন্দেহপূর্ণ দিনে যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করল, সে আবুল কাসিম ﷺ-এর অবাধ্যতা করল।

সন্দেহপূর্ণ বলে সে দিনকে বোঝানো হয়েছে যে দিনটিতে রমাদান হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। আর মেঘাচ্ছন্ন দিন হলে অনেক আলিমই সেটাকে সন্দেহপূর্ণ দিন ধরে নিয়ে তাতে সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন।

দ্বিতীয় কারণ : ফরয এবং নফল সিয়ামের পার্থক্য। শারীআ নিজেই ফরয এবং নফলের মাঝে পার্থক্য করেছে। এ কারণেই ঈদের দিন সিয়াম পালন নিষিদ্ধ।

তৃতীয় কারণ : রমাদানের সিয়ামের জন্য শক্তি সঞ্চয়। লাগাতার নফল সিয়ামের কারণে শরীর দুর্বল হয়ে ফরয সিয়াম পালনের শক্তি হারিয়ে যেতে পারে। অতএব এক দুদিন বিরতি দিলে রমাদানের সিয়ামে শক্তি যোগাবে। তবে এ কারণটির ওপর আপত্তি রয়েছে। কেননা, দুদিনের বেশি আগে সিয়াম পালন যেমন নিষিদ্ধ নয়, তেমনি সম্পূর্ণ মাস সিয়াম পালনও অবৈধ নয়। অথচ সেগুলোর কারণেও দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। তবে লাগাতার সিয়ামের কারণে যে ব্যক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সিয়াম ত্যাগ করা তার জন্য উত্তম। যেমন আবদুল্লাহ ইবনু আমর رضي الله عنه-এর আমল ছিল। তিনি একাধারে কয়েকদিন সিয়াম ছাড়া থাকতেন। এভাবে শক্তি সঞ্চয় করে আবার লাগাতার সিয়াম পালন করতেন।

রমাদানের এক-দুদিন আগে সিয়াম পালনের নিষেধাজ্ঞা দেখে কোনো মূর্খ এমন ধারণা করে যে, এটা বুঝি খাওয়া-দাওয়ার মজা নেওয়ার সুযোগ। এজন্য অনেকেই এটাকে 'বিদায়ী ভোজন' বলে থাকে। এটা মূলত গলদ ধারণা। বৈধ চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে অনেকেই এ সময় সীমালঙ্ঘন করে হারাম কাজ করে বসে। যা সুস্পষ্ট ক্ষতি। এমনটা যে করে, জানোয়ারকেও তার থেকে বুদ্ধিমান বলতে হয়। এমন লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ ﴿١٧٩﴾

"আমি তো বহু জিন এবং মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। যাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ রয়েছে তা দ্বারা দেখে না এবং তাদের কান রয়েছে তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা পশুর মতো; বরং এর চেয়েও বেশি বিভ্রান্ত। তারাই গাফিল।"[২৩৭]

এসব নির্বোধরা রমাদানে সালাত ও সিয়ামের মতো ইবাদাত করতে কষ্টবোধ করে। অনেক মূর্খ তো রমাদানে সিয়াম রাখতে না পারলে সালাতও আদায় করে না। আবার অনেকে কেবল রমাদানেই কবীরা গুনাহ পরিত্যাগ করে। রমাদান মাস দীর্ঘ বিধায় গুনাহের প্রতি আসক্তির কারণে তা বর্জন করতে তাদের কষ্ট হয়। ফের গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশায় তারা দিন গুনতে থাকে। জেনেশুনে তারা গুনাহ

---

[২৩৭] সূরা আরাফ, ৭ : ১৭৯

করে চলে। এমন লোকদের বরবাদি সুনিশ্চিত। আবার অনেকে তো ধৈর্যধারণ করতে না পেরে রমাদানেই গুনাহে লিপ্ত হয়।

সুতরাং আল্লাহ যাদের কল্যাণ চেয়েছেন তাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ঈমানকে তাদের জন্যে করেছেন হৃদয়গ্রাহী। আর কুফর, পাপাচার এবং নাফরমানির প্রতি ঘৃণার সঞ্চার করেছেন। বস্তুত তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী। পক্ষান্তরে তিনি যাদের কল্যাণ চাননি, তাদেরকে নিজেদের মতো ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তারা শয়তানের পথ অনুসরণ করে, কুফর, পাপাচার এবং নাফরমানি তাদের কাছে পছন্দনীয়। বস্তুত তারাই বিভ্রান্ত।

সুতরাং নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকুন। সতর্ক থাকুন। এই নাফরমানির কারণে কত-না নিয়ামাত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে! কত শত আযাবের কারণ এই নাফরমানি! কত বাড়িঘর যে বিরান হয়ে গেছে! কত নাফরমান যে আগুনে জ্বলেছে, আজ তাদের নিশানাটুকুও মুছে গেছে।

রমাদান এক মহা নিয়ামাত

রমাদান মাস পাওয়া এবং তাতে সিয়াম পালন করতে পারা অনেক বড় নিয়ামাত। এর প্রমাণ হলো দুই সাহাবির ঘটনা। তাঁরা একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। পরে তাঁরা একইসাথে জিহাদে অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে একজন শহীদ হন এবং দ্বিতীয়জন স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। স্বপ্নে দেখানো হলো, শহীদ সাহাবির চেয়ে পরবর্তী জন বেশি অগ্রগামী হয়ে গেছেন। সাহাবিগণ এ নিয়ে আশ্চর্য বোধ করছিলেন। তখন নবি ﷺ বললেন,

«أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً؟»

‘সাথির মৃত্যুর পরে সে কি এক বছর বেঁচে ছিল না?’

সাহাবিরা বললেন, জি হ্যাঁ।

নবি ﷺ বললেন,

«وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ؟»

‘সে কি রমাদান পায়নি এবং তাতে সিয়াম পালন করেনি?’

তারা বললেন, জি হ্যাঁ।

তিনি বললেন,

«وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سَجْدَةً فِي السَّنَةِ؟»

'সে কি বিগত এক বছর এত এত রাকআত সালাত আদায় করেনি ও সাজদা করেনি?'

তারা বললেন, জি।

নবি ﷺ বললেন,

«فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»

'তাহলে তাদের মধ্যে আসমান ও জমিনের মতো ফারাক হবে।'[২৩৮]

রমাদান মাসে যে বঞ্চিত হয়, সেই প্রকৃত অভাবী। যে রমাদানের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে, সে সত্যিকারের দরিদ্র। আর যে পরকালের জন্য রসদ সংগ্রহ করে না, সে হয় নিন্দিত।

রমাদানের সুসংবাদ

আল্লাহর নবি ﷺ সাহাবিদেরকে রমাদান আগমনী সংবাদ দিতেন। আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, সাহাবিদের সুসংবাদ দিয়ে নবি ﷺ বলেছেন,

«قَدْ جَاءَكُمْ شَهر رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، فِيهِ تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ.»

'তোমাদের কাছে রমাদান মাস এসেছে, এটি একটি বরকতময় মাস। আল্লাহ এ মাসের সিয়াম তোমাদের ওপর ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো করে দেওয়া হয় বন্ধ। এবং আল্লাহর অবাধ্য শয়তানদের বন্দি করা হয়। এ মাসে একটি রাত আছে যা হাজার মাস থেকেও উত্তম। যে ব্যক্তি সেই রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থেকে গেল, সে (সত্যিকার অর্থেই) বঞ্চিত রয়ে গেল।[২৩৯]

[২৩৮] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ১৪০৩, শুআইব আরনাউত رحمه الله হাদীসটিকে হাসান লিগাইরিহি বলেছেন।

[২৩৯] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ৭১৪৮, শুআইব আরনাউত رحمه الله হাদীসটি সহীহ বলেছেন।

কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম বলেছেন, রমাদান মাস উপলক্ষে একে অপরকে অভিনন্দন জানানোর সপক্ষে প্রমাণ এই হাদীসটি।

জান্নাতের দরজাগুলো খোলা হয়েছে, এটা মুমিনের জন্য সুসংবাদের বিষয়। গুনাহগারেরর জন্য সুসংবাদের বিষয় হলো, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শয়তানদের বন্দি করার সংবাদ গাফিলের জন্য সুসংবাদ। এ সময় কি অন্য সময়গুলোর মতো?

যে আমাদের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে তাকে বলছি, সন্ধি করার সময় ঘনিয়ে এসেছে। যে সব সময় লোকসানের শিকার হয় তাকে বলি, লাভজনক ব্যবসার সময় তো এসে গেছে। এই মাসেও যে লাভ করতে পারে না, সে আর কোন সময় লাভবান হবে? এ সময়টাতে যে মনিবের নৈকট্য অর্জন করতে পারে না, তার দূরত্ব কখনোই ঘুচবে না।

'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলে সফলতার দিকে প্রতিনিয়ত আহ্বান করা হচ্ছে। তবুও আপনি ব্যর্থ হয়ে চলেছেন! সংশোধনের দিকে ডাকা হচ্ছে, অথচ আপনি কিনা লিপ্ত আছেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অধ্যাবসায়ে! এই মাসে সিয়াম পালনের ব্যাপারে কত লোক আশাবাদী ছিল। আশা পূর্ণ হওয়ার আগেই আজ তারা অন্ধকার কবরের বাসিন্দা হয়ে গেছে।

উমার ইবনু আবদিল আযীয ﷺ জীবনের শেষ ভাষণে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'আপনাদের উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করা হয়নি। আর না এমনিতেই আপনাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। আপনাদেরকে তো অবশ্যই পুনরুত্থিত হতে হবে। তখন আল্লাহ আপনাদের কৃতকর্মের ফায়সালা করবেন। এমন ব্যক্তিই সেদিন ক্ষতিগ্রস্ত আর ব্যর্থ হবে, যে পার্থিব জীবনের সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী রহমত থেকে সরে আছে। এমন ব্যক্তি আসমান ও জমিনের সমান বিস্তৃত জান্নাত থেকেও বঞ্চিত থাকবে।

লক্ষ করে দেখুন, ধ্বংসশীলদের ঔরসে আপনাদের জন্ম। আপনাদের পরে যারা আপনাদের প্রতিনিধিত্ব করবে, তাদেরও সর্বোত্তম উত্তরাধিকারীর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় এমন লোকদের আপনারা বিদায় দিচ্ছেন, যারা তাদের হায়াত শেষ করে ফেলেছে। তাদেরকে কোনো বিছানা-বালিশ ছাড়াই গর্তে মাটি চাপা দিচ্ছেন। সেখানে তাদের না আছে কোনো উপায়-উপকরণ, আর না আছে

বন্ধুবান্ধব। সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা হিসাব এবং বিচারের মুখোমুখি হয়। পার্থিব জীবনে রেখে যাওয়া সম্পদ তাদের কোনো কাজে লাগে না। কাজে লাগে কেবল পার্থিব জীবনের নেক আমল। আমি এ উপদেশ শুধু আপনাদের দিচ্ছি না। আমি জানি, আমার গুনাহের পরিমাণ আপনাদের থেকে বেশি। সুতরাং আমি আমার এবং আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

এই বলে উমার ইবনু আবদিল আযীয ﵀ তাঁর পরনের চাদরের এক কোণ দিয়ে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তারপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে গেলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি আর ভাষণ দেননি।

সম্মানিত রমাদান মাসে পালনীয়

প্রথম পর্ব : সিয়ামের ফযিলত

আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فِمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.»

'আদম-সন্তানের প্রতিটি কাজই দশ থেকে সাত শ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু সিয়াম ব্যতীত। কেননা তা আমার জন্য, আর আমিই এর প্রতিদান দেবো। সে আমার সন্তুষ্টির জন্য খাহেশাত এবং পানাহার ত্যাগ করে। রোজাদারের জন্য দুটি খুশির সময় রয়েছে। প্রথমটি যখন সে ইফতার করে এবং অপরটি যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে। রোজাদারের মুখে যে গন্ধ হয়, আল্লাহর কাছে তা মিশকের চেয়েও উত্তম।'[২৪০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

«قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي.»

'আদম-সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য; একমাত্র সিয়াম ছাড়া। সিয়াম আমার জন্য।'[২৪১]

---

[২৪০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫১।

[২৪১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০৪।

বুখারির বর্ণনাতে এসেছে,

«لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»

‘প্রত্যেক আমলেরই কাফফারা আছে। সিয়াম আমার জন্য, তাই আমিই এর প্রতিদান দেব।’[২৪২]

সিয়াম এসেছে সবর তথা ধৈর্য থেকে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

‘সবরকারীদেরকে তাদের প্রতিদান কোনো রকম হিসাব ছাড়াই পূর্ণরূপে দেওয়া হবে।’[২৪৩]

সবরের প্রকার

সবর তিন প্রকার :

১. আল্লাহর হুকুম পালনে সবর,

২. আল্লাহর হারামকৃত জিনিস থেকে বিরত থাকার সবর এবং

৩. আল্লাহর ফয়সালাকৃত কষ্টের ব্যাপারে সবর।

সিয়ামের মধ্যে এ তিন ধরনের সবরই পাওয়া যায়। আল্লাহর হুকুম সিয়াম পালনে সবর করতে হয়। সিয়াম পালনকারীকে আল্লাহর নিষিদ্ধ খাহেশাত পূরণ থেকে বিরত থেকে সবর করতে হয়। আরও সবর করতে হয় ক্ষুধা-পিপাসার যন্ত্রণা এবং দৈহিক-মানসিক দুর্বলতার কষ্ট স্বীকার করে। ইবাদাতের কারণে সৃষ্ট এই কষ্টের বিনিময়েও সাওয়াব মিলবে। যেমন মুজাহিদদের কষ্ট প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَٰلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾

‘কারণ আল্লাহর পথে তাদের তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া তাদের স্পর্শ করে আর তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের মনে ক্রোধের

[২৪২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫৩৮।

[২৪৩] সূরা যুমার, ৩৯ : ১০

উদ্রেক করে এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়, তার প্রতিটির পরিবর্তে তাদের জন্য নেক আমল লিখিত হয়। নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল আল্লাহ বিনষ্ট করেন না।'[২৪৪]

আমলের সাওয়াব বেশ কিছু কারণে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। যেমন,

কাজটি সংঘটিত হওয়ার স্থান মর্যাদাময় হওয়া। যেমন, হারাম শরিফের মর্যাদা। এ কারণেই মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুন নববিতে সালাত আদায়ের সাওয়াব অনেক বেশি। এটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। নবি ﷺ বলেছেন

«صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ»

'আমার এ মাসজিদে এক রাকআত সালাত আদায় করা অন্য মাসজিদে এক হাজার রাকআত সালাত আদায়ের চেয়ে উত্তম; তবে মাসজিদুল হারাম ছাড়া।'[২৪৫]

সময়ের মর্যাদার কারণে আমলের সাওয়াব বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। যেমন রমাদান মাস পুরোটা এবং যুলহিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিন।

আল্লাহর কাছে আমলকারীর মর্যাদা, নৈকট্য এবং তাকওয়ার মতো আরও এমন অনেক কারণেই সাওয়াব বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। যেমন এ উম্মাতের সাওয়াব পূর্ববর্তী অন্যান্য উম্মাতের চেয়ে অনেক বেশি। তারা দ্বিগুণ করে সাওয়াব লাভ করে।

সিয়ামকে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করার কারণ

আল্লাহ কেবল সিয়ামকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন; অন্য কোনো আমলের ক্ষেত্রে এমনটা করেননি। এর কারণ হিসেবে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবে দুটি ব্যাখ্যা চমৎকার।

প্রথম ব্যাখ্যা : সিয়ামই একমাত্র ইবাদাত, যাতে নফসের সমস্ত মৌলিক চাহিদাকে স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বর্জন করা হয়। সিয়াম ছাড়া অন্য কোনো ইবাদাতে এমনটা পাওয়া যায় না। ইহরামের মধ্যে স্ত্রী সম্ভোগ-সহ যৌনচাহিদা এবং সুগন্ধি ব্যবহার বর্জন করা হয়। কিন্তু পানাহার বর্জন করা হয় না। ইতিকাফের ক্ষেত্রেও একই কথা। তবে ইতিকাফ সিয়ামের অনুগামী হয়ে থাকে। সালাতের

[২৪৪] সূরা তাওবা, ৯ : ১২০

[২৪৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯৪।

মধ্যে সমস্ত চাহিদা বর্জন করা হয়, তবে সেটার সময়সীমা দীর্ঘ হয় না। এজন্য সালাত আদায়কারী সালাতে পানাহারের শূন্যতা অনুভব করে না। বরং উপস্থিত থাকা খাবারের দিকে মন টানলে খেয়ে চিত্ত প্রশান্ত করে তারপর সালাত আদায় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্যই বলা হয়েছে আগে রাতের খাবার খেতে তারপর সালাত আদায় করতে। আর একদল আলিম তো নফল সালাতে পান করা বৈধ বলেছেন। ইবনুয যুবাইর ﷺ সালাতে এমনটা করতেন। ইমাম আহমাদ ﷺ-ও এক বর্ণনামতে এমনটা বলেছেন। পক্ষান্তরে সিয়াম এর বিপরীত। কারণ তা দিনভর হয়ে থাকে। ফলে মন টানলেও সিয়াম পালনকারী এই চাহিদাগুলোর অনুপস্থিতি অনুভব করে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে দিন বড় হলে এবং ভীষণ গরম পড়লে। এজন্যই বলা হয়েছে, ঈমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো গ্রীষ্মকালে সিয়াম পালন।

সক্ষমতা থাকার সাথে সাথে আগ্রহটাও যদি খুব বেশি হয়, এমতাবস্থায় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এমন জায়গাতেও নিজের চাহিদা দমন করা বিশুদ্ধ ঈমানের প্রমাণ। কারণ সিয়াম পালনকারী জানে যে আল্লাহ তার নির্জনের অবস্থাও জানেন। শাস্তির ভয়ে এবং সাওয়াবের আশায় সে আল্লাহর নিষেধ করা কাজ থেকে বিরত থাকে। এমন সিয়াম পালনকারীকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেন এবং অন্যান্য আমলের মাঝ থেকে এই আমলটিকে নিজের জন্য বিশিষ্ট করে নেন। এজন্যই পরের বাক্যে তিনি বলছেন,

«يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي»

'আমার সন্তুষ্টির জন্য সে মনের খাহেশাত এবং পানাহার ত্যাগ করে।'

জনৈক সালাফ বলেছেন, 'ভবিষ্যতে প্রাপ্তির আশায় যে ব্যক্তি বর্তমানের চাহিদা বিসর্জন দেয়, তাকে অভিনন্দন।'

নিজের চাহিদা বিসর্জন দেওয়ার মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত। এটা জানার পর সিয়াম পালনকারী মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টিকে নিজের কামনা-বাসনার ওপর প্রাধান্য দেয়। আল্লাহর জন্য নিজের খাহেশাতকে ত্যাগ করা এবং নিজের খাহেশাতের ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়ার যেই স্বাদ, সেটা তার কাছে হয়ে ওঠে নির্জনের সবচেয়ে উপভোগ্য বিষয়। কারণ তার এ বিশ্বাস আছে যে, তার সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন এবং সাওয়াব ও সাজা দিতে তিনি সক্ষম।

সিয়ামের কারণে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হওয়া পানাহার এবং স্ত্রী সম্ভোগের ক্ষেত্রে যদি এমনটা হয়, তবে তো সাধারণভাবে নিষিদ্ধ হওয়া বিষয়গুলো আরও জোরদার হওয়া উচিত। যেমন ব্যভিচার, মদপান, অন্যায়ভাবে কারও সম্পদ লুট করা বা সম্মানহানি ঘটানো এবং নিষিদ্ধ রক্তপাত করা। কারণ এগুলো সর্বাবস্থায় প্রত্যেক যুগে এবং প্রতিটি স্থানে আল্লাহ তাআলার ক্রোধের কারণ। মুমিনের ঈমান যখন পূর্ণাঙ্গ হয়, তখন সে এগুলোকে হত্যা এবং মারপিট থেকেও বেশি ঘৃণা করে থাকে। কুফর থেকে আল্লাহ তাআলা মুক্তি দেওয়ার পর পুনরায় সেদিকে ফিরে যাওয়াকে, আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপছন্দ করাটা উচিত। নবিজি এটাকে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করার অন্যতম শর্ত বলেছেন। আর ইউসুফ ﷺ বলেছিলেন,

رَبِّ ٱلسِّجۡنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدۡعُونَنِيٓ إِلَيۡهِۖ وَإِلَّا تَصۡرِفۡ عَنِّي كَيۡدَهُنَّ أَصۡبُ إِلَيۡهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلۡجَٰهِلِينَ ۝٣٣

'হে আমার প্রতিপালক! তারা আমাকে যে দিকে আহ্বান করছে, তার চেয়ে কারাগারই আমার কাছে বেশি প্রিয়। যদি আপনি তাদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'[২৪৬]

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা : সিয়াম একান্তই আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যকার বিষয়। তৃতীয় কেউ তা জানতে পারে না। কেননা, সিয়ামে থাকে সুপ্ত নিয়ত আর গোপনে পূরণ করা সম্ভব এমন চাহিদা বর্জন। এজন্যই বলা হয়, সাওয়াব রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতারাও সিয়ামের সাওয়াব লেখেন না। আবার অনেকে বলেছেন, সিয়ামে কোনো রিয়া বা লৌকিকতা নেই। ইমাম আহমাদ ﷺ-সহ প্রমুখ আলিম এমনটাই বলেছেন।

'সে আমার সন্তুষ্টির জন্য খাহেশাত এবং পানাহার ত্যাগ করে' এ কথা বলে আমাদের ব্যাখ্যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার এটাও বোঝানো হয়েছে যে, সিয়াম পালনকারী পানাহার এবং স্ত্রী সম্ভোগ বর্জন করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে থাকে। আর এগুলো মনের প্রধানতম চাহিদা।

[২৪৬] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৩৩

প্রবৃত্তিকে অবদমন করার ফযিলত

(ক) অধিক পরিমাণে পানাহার ও স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে ব্যক্তি অহঙ্কারী, অবাধ্য এবং উদাসীন হয়ে যায়। প্রবৃত্তিকে অবদমন করলে তা দূর হয়।

(খ) অন্তরকে ভাবনা এবং আল্লাহর যিকরের জন্য খালি করা। কেননা, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করার দ্বারা অন্তর কঠোর এবং অন্ধ হয়ে যায়। অন্তর তখন আল্লাহর যিকর এবং তাঁর সৃষ্টি নিয়ে ভাবনার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে ব্যক্তিকে উদাসীনতায় পেয়ে বসে। বিপরীতে (সিয়ামের মাধ্যমে) পানাহার ত্যাগ করলে অন্তর আলোকিত হয়, মনে নম্রতা আসে, কঠোরতা দূরীভূত হয়ে আল্লাহর যিকর এবং তাঁর সৃষ্টি নিয়ে ভাবনার সুযোগ হয়।

(গ) ধনী ব্যক্তি তার ওপর আল্লাহর নিয়ামাতের পরিমাণ বুঝতে পারে। সে দেখতে পায়, আল্লাহ তাকে গরিবের তুলনায় পানাহার ও বিয়ের সামর্থ্য দিয়েছেন। সিয়ামের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এসব থেকে সে বিরত থাকে। এর মাধ্যমে সে স্মরণ করে তাদের কষ্টের কথা, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা এইসব নিয়ামাত থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। তখন সে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাত 'সচ্ছলতা'র শুকরিয়া আদায় করে। এ কাজ তাকে অভাবী ভাইয়ের প্রতি সাধ্যমতো সহযোগিতা এবং সমবেদনা প্রকাশে উদ্‌বুদ্ধ করে।

(ঘ) শয়তান আদম-সন্তানের রক্তনালী দিয়ে চলাচল করে থাকে। সিয়ামের মাধ্যমে এ পথ সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। ফলে শয়তানের কুমন্ত্রণা বন্ধ হয় এবং মানুষের প্রবৃত্তি এবং ক্রোধের শক্তি খর্ব হয়। নবি ﷺ এ কারণেই সিয়ামকে 'প্রবৃত্তি দমনকারী' বলেছেন। কেননা তা বিবাহের প্রবৃত্তি নিঃশেষ করে দিয়ে থাকে।

মনে রাখার বিষয় হলো, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার জন্য শুধু এসব বৈধ প্রবৃত্তি ত্যাগ করলেই হবে না। বরং সিয়াম পালন ছাড়াও সর্বাবস্থায় মিথ্যা, অনাচার এবং মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুতে সীমালঙ্ঘন করাও পরিত্যাগ করতে হবে। এ কারণেই নবি ﷺ বলেছেন,

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

'যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং সে অনুযায়ী কাজ পরিহার করেনি, তার এ পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।'[২৪৭]

---

[২৪৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৯০৩।

জাবির ﷺ বলেছেন, 'সিয়াম পালনকালে তোমার কান, চোখ এবং জিহ্বাকে মিথ্যা আর হারাম কাজ থেকে সিয়াম পালন করাও (অর্থাৎ বিরত রেখো)। প্রতিবেশিকে কষ্ট দিও না। গাম্ভীর্য এবং প্রশান্তি যেন তোমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সিয়াম পালনের দিন এবং সিয়াম পালনবিহীন দিন তুমি একরকম বানিয়ে ফেলো না।'

নবি ﷺ বলেছেন,

«رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ»

'অনেক সিয়াম পালনকারী সিয়ামের বিনিময়ে কেবল ক্ষুধা ও পিপাসা লাভ করে। আবার অনেক রাত জেগে সালাত আদায়কারী, সালাত থেকে কেবল রাত জাগরণের কষ্টটুকু লাভ করে।'[২৪৮]

সম্ভবত একারণেই রোজাদারের জন্য দিনের বেলা পানাহার নিষিদ্ধ করার আলোচনার পর অন্যায়ভাবে মানুষর সম্পদ ভক্ষণের কথা কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা, এই নিষিদ্ধকরণটা সর্বযুগে এবং সর্বস্থানে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে পানাহার নিষিদ্ধ হওয়াটা সাময়িক। তাই এ ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে রোজাদার দিনের বেলা আল্লাহর নির্দেশ মেনে পানাহার থেকে বিরত থাকবে তার উচিত হবে আল্লাহর নির্দেশমতো অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ করা থেকেও বিরত থাকা। কারণ এটা সর্বাবস্থাতেই নিষিদ্ধ, যা কখনোই বৈধ হওয়ার সুযোগ নেই। আল্লাহই ভালো জানেন।

সিয়াম পালনকারীর আনন্দের ব্যাখ্যা

নবি ﷺ বলেছেন,

«لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ»

'সিয়াম পালনকারীর জন্য আনন্দের বিষয় দুটি। একটি আনন্দ ইফতারের সময়, আরেকটি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়।'[২৪৯]

ইফতারের সময় রোজাদারের আনন্দ। কারণ খাদ্য, পানীয়, সহবাস ইত্যাদি উপযোগী জিনিসের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট থাকে। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এগুলো হারাম

[২৪৮] ইবনু মাজাহ, আসসুনান, হাদীস নং : ১৬৯০; সহীহ ইবনু খুযাইমা, হাদীস নং : ১৯৯৭; সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদীস নং : ৩৪৮১, হাদীসটির সনদ সহীহ।

[২৪৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৯০৪।

থাকার পর যখন তা আবার হালাল হয়ে যায়, তখন মনে আনন্দ আসে। বিশেষত সে জিনিসের প্রয়োজন যদি তীব্র হয়, তাহলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই আনন্দিত হয়ে থাকে। এখন সেই কাজটি যদি আল্লাহর প্রিয় হয়, তবে শারীআর দৃষ্টিতেও তা পছন্দনীয় হবে। সিয়াম পালনকারীর ইফতার এমনই একটি কাজ। দিনের বেলা আল্লাহ বান্দার চাহিদাপূর্ণ কাজগুলো হারাম করেছিলেন। রাতের বেলায় সেগুলো তিনি হালাল করে দিয়েছেন। বরং রাতের প্রথমভাগে ও শেষভাগে সেগুলো তাড়াতাড়ি গ্রহণ করা তাঁর কাছে খুবই পছন্দনীয়। সুতরাং আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় বান্দা সে, যে দ্রুত ইফতার গ্রহণ করে থাকে। আর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাদের দুআ থাকে সেসব বান্দার প্রতি, যারা সাহরি খায়।

আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং তাঁর আনুগত্য করার জন্য সিয়াম পালনকারী দিনে নিজের চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করে। আবার তাঁর সন্তুষ্টি ও আনুগত্যের জন্যই রাতে সেসব চাহিদা দ্রুত পূরণ করে। সুতরাং তার পরিহার করা হয় আল্লাহরই সন্তুষ্টি ও আদেশে। আবার পুনরায় পালন করাও হয় আল্লাহরই আদেশে। সুতরাং উভয় অবস্থাতেই বান্দা তার প্রতিপালকের অনুগত। অতএব আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দ্রুত ইফতার করা এবং পানাহারের পর আল্লাহর প্রশংসা করার মাধ্যমে বান্দার জন্য মাগফিরাত ও সর্বোচ্চ সন্তুষ্টির আশা করা যায়। নবি ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا».

'আল্লাহ অবশ্যই সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, যে খাওয়ার পরে তার জন্য (শুকরিয়াস্বরূপ) আলহামদু-লিল্লাহ বলে এবং পানীয় পান করার পরে সেজন্য আলহামদু-লিল্লাহ বলে।'[২৫০]

সে-সময় তার দুআও কবুল করা হয়ে থাকে। ইবনু মাজাহ মারফূ হাদীসে উল্লেখ করেছেন,

«إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ»

'ইফতারের সময় সিয়াম পালনকারীর দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।'[২৫১]

---

[২৫০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭৩৪

[২৫১] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান : ১৭৫৩

পানাহারের মাধ্যমে বান্দা যদি সালাত আদায় এবং সিয়াম পালনে শক্তি যোগানের নিয়ত করে থাকে, তবে সে সাওয়াব পাবে। রাতে এবং দিনে ঘুমানোর মাধ্যমে আমলের ক্ষেত্রে শক্তি যোগানের নিয়ত করলে, ঘুমও ইবাদাতে পরিণত হয়ে যায়।

হাফসা বিনতু সীরীন বলেছেন, আবুল আলিয়াহ ﵀ বলেছেন, 'সিয়াম পালনকারী গীবত না করা পর্যন্ত ইবাদাতরত থাকে, যদিও সে বিছানায় ঘুমিয়ে থাকে।'

হাফসা আরও বলতেন, 'বিছানায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ইবাদাত করা কত সুখের!'

সুতরাং সিয়াম পালনকারী রাতদিন সব সময়ই ইবাদাতরত থাকে। সিয়ামরত অবস্থায় ও ইফতারির সময় তার দুআ কবুল করা হয়। দিনের বেলায় সে হয় সিয়াম পালনকারী ও ধৈর্যশীল এবং রাতের বেলায় খাবার গ্রহণকারী ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ। সুতরাং আমাদের ইঙ্গিত বুঝতে পারলে সিয়াম পালনকারীর ইফতারের সময়কার আনন্দের অর্থও বুঝে আসবে। কারণ এ পদ্ধতিতে ইফতার করা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া।

আর রবের সাথে সাক্ষাতের সময় আনন্দ হওয়ার কারণ হলো, তখন তার সিয়ামের সঞ্চয়কৃত সাওয়াব আল্লাহর কাছ থেকে বুঝে পাবে। ভীষণ প্রয়োজনের সময়ই সেটা সিয়াম পালনকারী পাবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌۢ ﴿٢٠﴾

'তোমরা যা কিছু কল্যাণ নিজেদের জন্য আগে পাঠাবে, তা আল্লাহর নিকট (সঞ্চিত) পাবে। সেটাই উত্তম এবং পুরস্কার হিসেবে খুব বড়। তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।'[২৫২]

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا

'সেদিন প্রত্যেক আত্মা যা কিছু নেক আমল করেছে এবং যা কিছু বদ আমল করেছে, তা বিদ্যমান পাবে।'[২৫৩]

---

[২৫২] সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩ : ২০

[২৫৩] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ৩০

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾

'কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে।'[২৫৪]

মোটকথা, পার্থিব দিনগুলো হলো মানুষের ভালো-মন্দ দিয়ে ভর্তি গুদাম বিশেষ। কিয়ামাতের দিন প্রত্যেকের গুদাম খোলা হবে। তখন মুত্তাকিরা তাদের গুদামে সম্মান আর মর্যাদা পাবে। পক্ষান্তরে গুনাহগাররা তাদের গুদামে পাবে অনুশোচনা আর আক্ষেপ।

সিয়াম পালনকারীদের স্তরবিন্যাস

সিয়াম পালনকারীরা দুটি স্তরে বিভক্ত।

প্রথম স্তর : সেসব রোজাদার, যারা জান্নাত লাভের আশায় পানাহার এবং খাহেশাত ত্যাগ করেছে। এ স্তরের লোকেরা আল্লাহর সাথে ব্যবসা এবং লেনদেন করেছে। যারা উত্তম কাজ করে, তাদের প্রতিদান আল্লাহ বিনষ্ট করেন না। আর যারা আল্লাহর সাথে লেনদেন করে, তারা কখনো লোকসানের শিকার হয় না। বরং অনেক লাভবান হয়ে থাকে। এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে নবি ﷺ বলেছিলেন,

«إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ»

'আল্লাহকে ভয় করে তুমি যা কিছু তুমি পরিহার করবে, তিনি সেটার চেয়ে উত্তম প্রতিদান তোমাকে দান করবেন।'[২৫৫]

এ স্তরের রোজাদারকে জান্নাতে তাদের ইচ্ছামতো খাবার, পানীয় এবং স্ত্রী দান করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

'(তাদের বলা হবে) পানাহার করো তৃপ্তির সাথে, বিগত দিনগুলোতে তোমরা যা করেছিলে তার বিনিময়ে।'[২৫৬]

---

[২৫৪] সূরা যিলযাল, ৯৯ : ৭

[২৫৫] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ২০৭৩৯, শুআইব আরনাঊত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[২৫৬] সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ২৪

মুজাহিদ ﷺ-সহ অন্যরা বলেছেন, 'এই আয়াতটি রোজাদারদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।'

সহীহ বুখারি এবং মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.»

'জান্নাতে রাইয়ান নামে একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামাতের দিন সিয়াম পালনকারীরা প্রবেশ করবে। তাঁরা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, সিয়াম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ছাড়া অন্য কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তারা প্রবেশের পর দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে, যাতে তা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে না পারে।'[২৫৭]

অন্য বর্ণনাতে আছে,

«مَنْ دَخَلَ مِنْهُ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا.»

'সেই দরজা দিয়ে প্রবেশকারী (ব্যক্তি জান্নাতের পানীয়) পান করবে। (ওই) পানকারী আর কখনোই তৃষ্ণার্ত হবে না।'[২৫৮]

দুনিয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অল্প সময় পানাহার ত্যাগ করলে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে আখিরাতে এমন খাবার এবং পানীয় দান করবেন, যা কখনো নিঃশেষ হবে না। আর এমন সহধর্মিনী দেবেন, যাদের কখনো মৃত্যু হবে না। জান্নাতি হুরদের মোহর হলো দীর্ঘ সময় ধরে আদায়কৃত তাহাজ্জুদের সালাত। যা অন্যান্য মাসের তুলনায় রমাদানে অধিক হারে আদায় করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় স্তর : তারা এমন রোজাদার, যারা আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকেই বিরত থাকে। তারা নিজেদের মস্তিষ্ক এবং চিন্তাশক্তিকে হেফাজত করে। পেট এবং পেটে থাকা সবকিছু রক্ষণাবেক্ষণ করে। মৃত্যু এবং অস্থিমজ্জা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যাওয়াকে ইয়াদ রাখে। আখিরাতের কথা স্মরণ করে দুনিয়ার চাকচিক্য বর্জন করে। এ

[২৫৭] সহীহ বুখারি, হাদীস নং ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৫২

[২৫৮] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ২২৮৪২, শুআইব আরনাউত ﷺ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ধরনের লোকের ঈদ হলো আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিন এবং তাঁর দিদার হলো আনন্দধারা।

দুনিয়াতে যে ব্যক্তি খাহেশাত দমন করবে জান্নাতে তার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। আর যে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে বিরত থাকবে, তার ঈদ হবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার দিন।

مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَءَاتٍۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۝٥

'যে আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে সে জেনে রাখুক, আল্লাহর নির্ধারিত কাল আসবেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'[২৫৯]

হে রোজাদার! আপনাদের প্রবৃত্তি দমন করে সিয়াম পালন করুন, যাতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিনটি ঈদুল ফিতর হিসেবে পেতে পারেন। দীর্ঘ জীবনের কারণে আশা দীর্ঘ করবেন না। সিয়াম পালনের অধিকাংশ সময় চলে গেছে। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ঈদ ঘনিয়ে আসছে।

রোজাদারের মুখের গন্ধ

সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ, আল্লাহর কাছে মিশকের চেয়েও উত্তম।' এখানে অনাহার-জনিত মুখের গন্ধের কথা বলা হচ্ছে। সিয়াম পালন করলে পাকস্থলী শূন্য থাকার কারণে এটা তৈরি হয়। দুনিয়াতে মানুষের কাছে এ গন্ধ অছন্দনীয় হলেও আল্লাহর কাছে তা মিশকের থেকেও বেশি প্রিয়। কারণ, আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের কারণেই এ গন্ধের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন শহীদ সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'কিয়ামাতের দিন সে এমন অবস্থায় আসবে যে, তার রক্ত ঝরতে থাকবে। যার রঙ হবে রক্তের, তবে ঘ্রাণ হবে মিশকের।'

এ গন্ধ আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হওয়ার দুটি অর্থ হতে পারে।

এক. দুনিয়াতে সিয়াম ছিল একান্তই বান্দা এবং আল্লাহর মধ্যকার গোপনীয় বিষয়। কিন্তু আখিরাতে আল্লাহ সেটা প্রকাশ করে দেবেন। যাতে সিয়াম পালনকারীর মর্যাদা স্পষ্ট হয়। দুনিয়াতে তারা সিয়ামের বিষয়টি লুকিয়ে রেখেছিল বলে, আখিরাতে আল্লাহ তাদেরকে মানুষের মাঝে পরিচিত করবেন।

---

[২৫৯] সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৫

দুই. দুনিয়াতে যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত, আনুগত্য এবং আমলের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি তালাশ করে, তার থেকে মানুষের কাছে অপছন্দনীয় কিছু নিদর্শন প্রকাশ পেতেই পারে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তা অপছন্দনীয় থাকে না। বরং তাঁর কাছে সেটি পছন্দনীয় এবং প্রিয় হয়ে যায়। কেননা, তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করতে গিয়েই সেই অপছন্দনীয় জিনিস সৃষ্টি হয়েছে। তাই এ ধরনের আমলকারীদের অন্তরের প্রশান্তির জন্য আল্লাহ পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। যাতে দুনিয়াতে বাহ্যিক অবস্থা দেখে কেউ তাদের অপছন্দ না করে। কোনো জিনিস লোকসমাজে যতই তুচ্ছ এবং অপূর্ণাঙ্গ হোক না কেন, সেটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকলে বাস্তবে তা অমূল্য এবং পূর্ণাঙ্গ।

সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ মিশকের চেয়েও উত্তম। আল্লাহর ঘর যিয়ারত করতে আসা ইহরাম পরা ব্যক্তি চমৎকার পোশাক পরিহিত থেকেও সুন্দর। আল্লাহর ভয়ে গুনাহগার ব্যক্তির বিলাপ, তাসবীহ থেকেও শ্রেষ্ঠ। সত্যিকারের পূর্ণতা হলো আল্লাহর মহত্ত্ব এবং তাঁর বড়ত্বের সামনে বিনয়ী হওয়া। সম্মান হচ্ছে আল্লাহর ক্ষমতার ভয়ে অপমানিত হওয়া। সত্যিকারের জীবন হলো আল্লাহর রাস্তায় নিজের প্রাণ উৎসর্গ করা। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সিয়াম পালন করে ক্ষুধার্ত থাকাই সত্যিকারের পরিতৃপ্তি। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পিপাসার্ত থাকা হলো প্রকৃত তৃষ্ণা নিবারণ। নিজেকে আল্লাহর কাজে নিবেদিত করা প্রকৃত প্রশান্তি।

রমাদান মাসে শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা এবং সিয়ামের মাধ্যমে খাহেশাতের অগ্নি নির্বাপিত করা হলে প্রবৃত্তির ক্ষমতা খর্ব হয়। বিবেক তখন ইনসাফের সাথে শাসন করে। ফলে অপরাধীর আর কোনো অজুহাত থাকে না।

অন্তরের আকাশে জমে থাকা গাফিলতির মেঘ কেটে গিয়ে উদিত হোক তাকওয়া এবং ঈমানের সূর্য। সৎকর্মশীলদের আমলনামাগুলো পূর্ণ হয়ে যাক। সিয়াম পালনকারীদের অন্তরগুলো ভীত হয়ে পড়ুক। কঠোর পরিশ্রমীদের পাগুলো রবের উদ্দেশ্যে রুকু-সাজদা করুক। তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের চোখগুলো যেন ঘুমিয়ে না পড়ে। গুনাহ যেন তাওবাকারীদের কাছে আর ফিরে না আসে। প্রবৃত্তির জমিন যেন (আনুগত্যের) বারি শুষে নেয়, আর নফসের আকাশ যেন (গাফিলতির বর্ষণ থেকে) বিরত থাকে।

দ্বিতীয় পর্ব : রমাদানে দান এবং তিলাওয়াতের ফযিলত

ইবনু আব্বাস ﵄ বলেছেন, 'দানশীলতায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন অগ্রগামী। রমাদানে তাঁর দান আরও বেশি বেড়ে যেত, যখন জিবরীল ﵇ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। রমাদানের প্রতি রাতেই জিবরীল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন পাঠ করতেন। জিবরীলের সাথে সাক্ষাতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হতেন কল্যাণবাহী বাতাস থেকেও বেশি দানশীল।'[২৬০]

الجُوْدُ। শব্দের অর্থ, দানের ব্যাপকতা, তথা অধিক হারে দান করা। আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে এ বিশেষণ যুক্ত করা হয়ে থাকে। কারণ, তিনিই সর্বাধিক দানশীল। রমাদানের মতো বিশেষ সময় তা অনেকগুণে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

'আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, আমি তো কাছেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে, আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।'[২৬১]

নবি ﷺ-এর উদারতা

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিগতভাবেই নবি ﷺ-কে সর্বাধিক পরিপূর্ণ এবং উত্তম গুণ দান করেছিলেন। আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

'সচ্চরিত্রের গুণাবলি পরিপূর্ণ করতে আমি প্রেরিত হয়েছি।'[২৬২]

এ হিসেবে নবি ﷺ ছিলেন সর্বাপেক্ষা উদার। তাঁর উদারতা সবধরনের দানশীলতাকে

---

[২৬০] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৩৮৩

[২৬১] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৬

[২৬২] হাকিম, আল মুসতাদরাক, হাদীস নং : ৪২২১, ইমাম হাকিম ﵀ বলেছেন, হাদীসটি ইমাম মুসলিম ﵀-এর শর্তানুযায়ী সহীহ। ইমাম যাহাবি ﵀-ও এতে সহমত পোষণ করেছেন।

অন্তর্ভুক্ত করে। ইলমের ক্ষেত্রে তাঁর যেমন উদারতা ছিল, তেমনি মালের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। আবার আল্লাহর দ্বীন প্রচার করা, মানুষকে যথাযথ দিক-নির্দেশনা দেওয়া, ক্ষুধার্তকে আহার করানো, অজ্ঞকে উপদেশ দেওয়া, অভাবীর প্রয়োজন পূরণ করা এবং তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো ব্যাপক উপকারও তিনি করতেন।

এই প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি নবি ﷺ-এর মাঝে বরাবরই ছিল। এ কারণেই খাদীজা رضي الله عنها প্রথম ওহির সংবাদ শুনে নবি ﷺ-কে বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনোই অপমানিত করবেন না। কারণ আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন এবং মেহমানের মেহমানদারি করেন। অসহায়ের দায়িত্ব গ্রহণ, নিঃস্বকে সাহায্য করা এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সহায়তা করা তো আপনার বৈশিষ্ট্য।'[২৬৩]

নুবুওয়াত প্রাপ্তির পর নবি ﷺ-এর এসব গুণ আরও বৃদ্ধি পায়। এমনকি তা বহুগুণে বেড়ে যায়। আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه বলেছেন, 'নবি ﷺ ছিলেন সকল মানুষের সেরা, শ্রেষ্ঠ বাহাদুর এবং সবচেয়ে দানশীল।'[২৬৪]

নবি ﷺ-এর দানশীলতা সম্পর্কে আনাস رضي الله عنه বলেছেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর নবি ﷺ-এর কাছে কেউ কিছু চাইলে তিনি অবশ্যই প্রদান করতেন। এক ব্যক্তি নবি ﷺ-এর কাছে এলে তাকে তিনি এত বেশি ছাগল দিলেন, যা দিয়ে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর সে ব্যক্তি নিজের সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে তাদের বলল, 'ভাইসব! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কেননা, মুহাম্মাদ এত বেশি প্রদান করেন যে, তিনি অভাবগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করেন না।'[২৬৫]

অন্য বর্ণনায় আনাস رضي الله عنه বলেছেন, 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পরিমাণ ছাগল চাইলে, তিনি দিয়ে দিলেন। তারপর সেই ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, "ভাইসব! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে নাও। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ এত বেশি দান করেন যে, দরিদ্রতার ভয় করেন না।"'

আনাস رضي الله عنه বলেছেন, 'এমন হতো যে, মানুষ দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করত, কিন্তু ইসলাম কবুলের পর দুনিয়া এবং দুনিয়াতে থাকা সব সম্পদের চেয়ে

[২৬৩] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৬০

[২৬৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৩০৭; সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ২৯০৮

[২৬৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৩১২

ইসলামই তার কাছে বেশি প্রিয় হয়ে যেত।’[২৬৬]

সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া ﵁ বলেছেন, ‘আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অনেক দান করলেন। তিনি আমার দৃষ্টিতে ছিলেন সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি। অথচ আমাকে লাগাতার দিতে দিতে আমার দৃষ্টিতে তিনি সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি হয়ে গেলেন।’ বর্ণনাকারী ইবনু শিহাব ﵀ বলেছেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া ﵁ কে এক শ উট প্রদান করেছিলেন। তারপর আরও এক শ উট, এরপর আরেক শ উট প্রদান করেন।[২৬৭]

জুবাইর ইবনু মুতইম ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, হুনাইন থেকে ফেরার সময় তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে চলছিলেন। সঙ্গে ছিলেন আরও অনেক সাহাবি। পথিমধ্যে কিছু গ্রাম্য লোক এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল এবং কিছু দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করল। এমনকি তারা নবিজিকে একটি গাছের কাছে নিয়ে গেলে তাঁর চাদর (গাছের কাঁটায়) আটকে গেল। নবি ﷺ তখন সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন,

«أَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ العِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا، وَلَا كَذُوبًا، وَلَا جَبَانًا.»

‘আমার চাদরটি ফিরিয়ে দাও। আমার কাছে যদি এই কাঁটাযুক্ত গাছগুলির সমপরিমাণ বকরি থাকত, এর সবই তোমাদের ভাগ করে দিতাম। আর তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ (রূপে) পেতে না।’[২৬৮]

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﵁ বলেছেন, নবি ﷺ দু’হাত একসাথে নিয়ে আমাকে ইশারা করে বলেছিলেন,

«لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»

‘বাহরাইনের সম্পদ এলে আমি তোমাকে এত এত এত পরিমাণ দেব।’

কিন্তু নবি ﷺ-এর ইন্তেকালের আগে বাহরাইনের সম্পদ এসে পৌঁছায়নি। পরে বাহরাইনের সম্পদ পৌঁছালে আবূ বকর ﵁-এর আদেশে ঘোষণা করা হলো। বলা হলো, “কারও অনুকূলে নবি ﷺ-এর ওয়াদা বা ঋণ থাকলে, সে যেন আমার

[২৬৬] প্রাগুক্ত
[২৬৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৩১৩
[২৬৮] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ২৮২১

কাছে আসে।" তখন আমি আবূ বকরের কাছে গিয়ে বললাম, নবি ﷺ আমাকে এমন এমন দেবেন বলেছিলেন। আবূ বকর ﵁ আমাকে এক আঁজলা দিলে আমি তা গণনা করলাম। তাতে পাঁচ শ ছিল। তারপর তিনি বললেন, "এর দ্বিগুণ নিয়ে নাও।"'[২৬৯]

সহীহ বুখারির বর্ণনাতে এসেছে, নবি ﷺ-কে একটি নকশাদার চাদর হাদিয়া দেওয়া হলে তিনি সেটা গ্রহণ করলেন। সে-সময় ওটা তাঁর প্রয়োজন ছিল। এরপর তিনি সেটা পরে সাহাবিদের সামনে তাশরীফ আনেন। তখন এক সাহাবি সেটা চেয়ে বসলে নবি ﷺ তাকে দিয়ে দিলেন। সাহাবিরা এ ব্যাপারে ওই সাহাবিকে তিরস্কার করলে তিনি বললেন, 'আমার চাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, এটা যেন আমার কাফন হয়।' শেষ পর্যন্ত ওই চাদরটিই সে সাহাবির কাফন হয়েছিল।[২৭০]

নবি ﷺ-এর দানশীলতার সবটাই ছিল আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায়। অভাবীর পেছনে কিংবা আল্লাহর রাস্তায় অথবা যার মাধ্যমে ইসলাম শক্তিশালী হবে বলে মনে করতেন, ইসলামের প্রতি তাকে আকৃষ্ট করার জন্য নবিজি সম্পদ ব্যয় করতেন। নিজের এবং পরিবার-পরিজনের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দিতেন। এত অধিক পরিমাণে দান করতেন যে, তৎকালীন পরাশক্তি রোম এবং পারস্যের সম্রাটও তা করতে পারত না। অথচ তিনি নিজে গরিবি হালতে জীবন যাপন করতেন। কখনও মাসের পর মাস এমনভাবে চলে যেত যে, তাঁর ঘরে চুলা জ্বলত না। ক্ষুধার যন্ত্রণায় অনেক সময় তিনি পেটে পাথর পর্যন্ত বাঁধতেন।

একবার তাঁর কাছে কিছু বন্দি এল। তখন ফাতিমা ﵂ ঘরের কাজে কষ্টের কথা তুলে ধরে সহযোগিতার জন্য একজন দাস চাইলেন। কিন্তু নবি ﷺ মেয়েকে ঘুমানোর সময় সুবহানাল্লাহ, আলহামদু-লিল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার পড়তে আদেশ করলেন। আর বললেন,

لَا أُعْطِيكُمْ وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ تَلَوَّى بُطُونُهُمْ مِنَ الْجُوعِ

'সুফফার লোকেরা ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করবে আর আমি তোমাদের সেবক দেবো, এ হতে পারে না।'[২৭১]

---

[২৬৯] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ২২৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৩১৪

[২৭০] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১২৭৭

[২৭১] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ৫৯৬

নবি ﷺ-এর দানশীলতা রমাদান মাসে বৃদ্ধি পেত। আল্লাহ তাআলা নবিজিকে সৃষ্টিগতভাবেই মহান চরিত্রের অধিকারী বানিয়েছিলেন। নুবুওয়াত লাভের আগ থেকেই তিনি এমন ছিলেন। নুবুওয়াত লাভের পরে রমাদান মাসে তাঁর দানশীলতা আগের থেকে বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। রমাদান মাসে জিবরীল ﷺ-এর সাথে তিনি মিলিত হতেন। আর জিবরীল ﷺ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সম্মানিত ফেরেশতা। দুজনে নাযিলকৃত কুরআন একে অপরকে পড়ে শোনাতেন। আর কুরআন হলো সর্বোত্তম কিতাব, যা সদাচার আর উত্তম চরিত্রের প্রতি উৎসাহ দেয় এবং অনুপ্রেরণা যোগায়। এ কিতাবই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র। তাই, এ কিতাবের সন্তুষ্টিতে তিনি ছিলেন সন্তুষ্ট এবং এর অসন্তুষ্টিতে তিনি ছিলেন অসন্তুষ্ট। এই কিতাব সেসব বিষয়ে উৎসাহ দেয়, সেসব কাজে তিনি দ্রুত এগিয়ে যেতেন। আর যা কিছু নিষেধ করে, তা থেকে তিনি বিরত থাকতেন।

হায়াত ঘনিয়ে আসায় জিবরীল ﷺ-এর সাথে আগের তুলনায় বেশি সাক্ষাৎ ঘটছিল। তাঁরা পরস্পরকে মহৎ গুণ এবং উদারতার প্রেরণা দানকারী কুরআন বেশি বেশি শোনাচ্ছিলেন। ফলে এই মাসে নবি ﷺ-এর দানশীলতা এবং অনুগ্রহ বহুগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এটা তো সুনিশ্চিত যে, সংস্পর্শের প্রভাব চরিত্রের মাঝে পড়ে থাকে।

নবিজির দানশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ার কিছু উপকারিতা

১. সময়ের মর্যাদা এবং তাতে আমলের সাওয়াব বৃদ্ধি পাওয়া।

২. রোজাদার, ইবাদাতগুজার এবং আল্লাহর যিকরকারীকে ইবাদাতের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা। তাহলে তাদের অনুরূপ সাওয়াব পাওয়া যাবে। যেমনটা আল্লাহর পথের মুজাহিদকে জিহাদের জন্য তৈরি করে দিলে, জিহাদের সাওয়াব পাওয়া যায়। আবার মুজাহিদের পরিবারের দেখাশোনা করলেও জিহাদের সাওয়াব মেলে। যায়িদ ইবনু খালিদ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا.»

'যে ব্যক্তি কোনো সিয়াম পালনকারীকে ইফতার করায়, তার জন্যও রয়েছে অনুরূপ (সিয়ামের) সাওয়াব। তবে এতে সিয়াম পালনকারীর সাওয়াবে কোনো ঘাটতি হবে না।'[২৭২]

[২৭২] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৮০৭, হাসান সহীহ

৩. রমাদান এমন একটি মাস যাতে আল্লাহ বান্দাকে রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। বিশেষ করে লাইলাতুল কদরে এটা হয়ে থাকে। এ রাতে আল্লাহ তাঁর দয়ালু বান্দাদের ওপর দয়া করে থাকেন। যেমন নবি ﷺ বলেছেন,

«إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ»

'বস্তুত আল্লাহ তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতি দয়া করেন।'[২৭৩]

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর বান্দাদের প্রতি সদয় হবে, আল্লাহও তাকে দান, দয়া এবং অনুগ্রহ করবেন।

৪. সিয়াম এবং সাদাকাহ একসাথে হলে জান্নাত লাভ আবশ্যক হয়ে যায়। যেমন আলি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا»

'জান্নাতে একটি প্রাসাদ রয়েছে, যার ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইরে থেকে ভেতরে দেখা যাবে।'

তখন একজন বেদুইন দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি কার হবে?' নবি ﷺ বললেন,

«لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ».

'যে ভালো কথা বলে, অন্যকে খাবার খাওয়ায়, সর্বদা সিয়াম পালন করে এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন উঠে সালাত আদায় করে, (প্রাসাদটি) তার হবে।'[২৭৪]

এসব বৈশিষ্ট্যের সবগুলোই রমাদান মাসে পাওয়া যায়। কারণ মুমিন এ মাসে সিয়াম ও সালাত আদায় করে, সাদাকাহ করে এবং উত্তম কথাবার্তা বলে। রোজাদাররা এই সময় অনর্থক এবং অশ্লীল কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে। সিয়াম, সালাত এবং সাদাকাহ ব্যক্তিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেয়।

আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বললেন, 'তোমাদের মাঝে আজ কে সিয়াম পালন করছ?' আবূ বকর رضي الله عنه বললেন, 'আমি।' নবি ﷺ

---

[২৭৩] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১২৮৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৯২৩

[২৭৪] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ১৯৮৪,

বললেন, 'তোমাদের কে আজ জানাযার অনুগমন করেছ?' আবূ বকর ﷺ বললেন, 'আমি।' নবি ﷺ আবার বললেন, 'আজ তোমাদের কেউ কি রোগীর সেবা করেছ?' আবূ বকর ﷺ এবারও নিজের কথা বললেন। তখন নবি ﷺ বললেন,

«مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

'যার মধ্যে এই কাজগুলোর সমন্বয় ঘটবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২৭৫]

৫. সিয়াম এবং সাদাকাহ একসাথে হলে, তা গুনাহের কাফফারার জন্য অধিক কার্যকর। এটি জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে এবং তা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়ে থাকে। বিশেষত এর সাথে যদি কিয়ামুল লাইল যুক্ত হয়, তবে তো সোনায় সোহাগা।

৬. সিয়াম পালন করতে গিয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েই থাকে। সিয়াম গুনাহের কাফফারা হওয়ার জন্য শর্ত হলো পরিহারযোগ্য সকল বিষয় থেকে বিরত থাকা। সাধারণত যথাযথভাবে সিয়াম পালন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই সাদাকার দ্বারা সিয়ামের ত্রুটি-বিচ্যুতির কাফফারা হয়। এ কারণেই রমাদানের শেষে সিয়াম পালনকারীকে অশ্লীল ও অনর্থক কথাবার্তা এবং কাজকর্ম থেকে পবিত্র করতে যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব করা হয়েছে।

৭. সিয়াম পালনকারী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পানাহার বর্জন করে থাকে। কেউ নিজের খাবার থেকে রোজাদারকে দিলে তার অবস্থা ওই ব্যক্তির মতো হবে, যে কিনা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রবৃত্তিকে ত্যাগ করেছে এবং সহমর্মিতা দেখিয়েছে। এ কারণেই সিয়াম পালনকারী নিজে ইফতার করার সময় অপর রোজাদারকে ইফতার করানো শারীয়াতসম্মত। কারণ ইফতারের সময় খাবার খাওয়া তার কাছে অনেক প্রিয়। এমতাবস্থায় সহমর্মিতা দেখিয়ে খাবারের প্রতি টান থাকা সত্ত্বেও নিজের সাথে অপরকে খাওয়ানোর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ পানাহার নিষিদ্ধ করার পরে আবার বৈধতা দিয়ে তাকে যে নিয়ামাত দিয়েছেন তার শোকর আদায় করা। কেননা কোনো জিনিস নিষিদ্ধ হওয়ার পরে তার মূল্য বুঝে আসে।

কোনো এক সালাফকে জিজ্ঞাসা করা হলো, শারীয়াতে সিয়ামের বিধান কেন

[২৭৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১০২৮

দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেন, ‘ধনীরা যাতে ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করতে পারে, তাহলে সে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে কখনও ভুলবে না।’

সালাফদের অনেকেই ইফতারের সময় সহমর্মিতা প্রকাশ করে অন্যকে অগ্রাধিকার দিতেন। অসহায় লোকেরা সাথে না থাকলে ইবনু উমার ﷺ ইফতার করতেন না। পরিবারের কেউ তাদের বাধা দিলে, সে রাতে তিনি কিছু খেতেন না।

এক প্রার্থী ইমাম আহমাদ ﷺ-এর কাছে এসে হাত পাতলে তিনি ইফতারের জন্য প্রস্তুত করে রাখা রুটি দুটিই তাকে দিয়ে দিলেন। তারপর নিজে অনাহারে কাটিয়ে পরদিন সিয়াম পালন করলেন।

হাসান ﷺ নফল সিয়াম পালন করে সাথিসঙ্গীকে খাওয়াতেন এবং পাশে বসে তাদের বাতাস করতে থাকতেন। যাতে তারা নির্বিঘ্নে খেতে পারে।

ইবনুল মুবারক ﷺ সফরে থাকাবস্থায় সঙ্গীদের নানারকম মিষ্টান্ন খাওয়াতেন। কিন্তু নিজে সিয়াম পালন করতেন।

পুণ্যবান সেসব মহান ব্যক্তির ওপর আল্লাহ যেন শান্তি এবং অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। তাঁদের এমন বহু ঘটনা এবং কীর্তি রয়েছে।

নিশিতে কুরআন তিলাওয়াত

এ ছাড়াও রমাদান মাসে কুরআন পাঠ করা, এর জন্য একত্র হওয়া, ভালো হাফিযের কাছে কুরআন শোনানো ইত্যাদি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রমাদান মাসে অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করা মুসতাহাব হওয়ার প্রমাণও হাদীসে পাওয়া যায়।

ফাতিমা ﷺ বলেছেন, নবি ﷺ তাঁকে জানিয়েছিলেন, জিবরীল ﷺ প্রতি বছর তাঁকে একবার কুরআন পড়ে শোনাতেন। আর ইন্তেকালের বছর দুবার পড়ে শুনিয়েছিলেন।[২৭৬]

ইবনু আব্বাস ﷺ-এর বর্ণিত হাদীসে এসেছে, জিবরীল ﷺ-এর সাথে নবি ﷺ কুরআন পাঠ করতেন রাতের বেলায়। এ থেকে বুঝে আসে, রমাদানের রাতে কুরআন বেশি বেশি তিলাওয়াত করা মুসতাহাব। কারণ রাতে মানুষ থাকে ঝামেলামুক্ত। তখন কাজে যেমন হিম্মত পাওয়া যায়, তেমনি হৃদয় আর মুখ

[২৭৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৪৫০।

ভাবনার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْـًٔا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝٦

'নিশ্চয়ই রাত্রি জাগরণ আত্মসংযমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট বলার জন্য অধিকতর উপযোগী।'[২৭৭]

আর কুরআনের আছে রমাদান মাসের একান্ত বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ

'রমাদান মাস, এতে মানুষের দিশারি এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।'[২৭৮]

আল্লাহর নবি ﷺ রমাদান মাসের কিয়ামুল লাইলের তিলাওয়াত অন্যান্য মাসের তুলনায় লম্বা করতেন। তেমনি এক রাতে নবি ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করেছিলেন হুযাইফা رضي الله عنه। যাতে নবি ﷺ পর্যায়ক্রমে সূরা বাকারাহ, সূরা নিসা এবং সূরা আলি ইমরান তিলাওয়াত করেন। প্রতিটি ভীতিসংক্রান্ত আয়াতে থেমে থেমে তিনি দুআ করছিলেন।[২৮০]

উমার رضي الله عنه তো উবাই ইবন কা'ব এবং তামীম আদ-দারি رضي الله عنه-কে রমাদান মাসে লোকদের সালাত পড়ানোর জন্য ইমাম নিযুক্ত করেন। তাঁরা এক রাকাআতে দুই শ'র মতো আয়াত তিলাওয়াত করতেন। এমনকি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তাঁরা লাঠিতে ভর দিতেন এবং ভোরে তাঁরা বাড়ি ফিরে যেতেন।

বর্ণিত আছে, উমার رضي الله عنه তিনজন কারীকে একত্র করে নির্দেশ দিলেন, দ্রুত গতিতে তিলাওয়াতকারী লোকদের নিয়ে ত্রিশ আয়াত পড়বে, মধ্যম গতিতে তিলাওয়াতকারী পঁচিশ আয়াত ও ধীরগতির তিলাওয়াতকারী বিশ আয়াত।

তারপর তাবিয়িদের যুগে আট রাকাআতে সূরা বাকারাহ পড়া হতো। বারো রাকাআতে পড়া হলে তাঁরা একটু হালকা বোধ করতেন।

ইবনু মানসূর বলেছেন, ইসহাক ইবনু রাহওয়াইকে জিজ্ঞেস করা হলো, রমাদানের কিয়ামে কতটুকু পড়া হবে? তখন ইসহাক সূরা বাকারাহ'র দশ আয়াতের কম

[২৭৭] সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩ : ৬
[২৭৮] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৫
[২৭৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৭৭২
[২৮০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৭৭২

পড়ার অনুমতি দিলেন না। বলা হলো, লোকেরা তো এটা মানবে না। ইসহাক বললেন, না মানুক; সূরা বাকারাহ'র দশ আয়াতের কম তুমি সালাতের কোনো রাকাআতে পড়াবে না। আর যখন ছোট ছোট আয়াতে যাবে, তখন সূরা বাকারাহ'র দশ আয়াতের সমপরিমাণ আয়াত পড়বে।

তদ্রূপ মালিক ﷺ-ও দশ আয়াতের কম পড়া অপছন্দ করতেন।

ইমাম আহমাদ ﷺ-কে উমার ﷺ-এর নির্ধারণকৃত দ্রুত ও ধীর গতিতে আয়াত পাঠের পরিমাণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'এ পরিমাণ তিলাওয়াত করা মানুষের জন্য কষ্টকর। বিশেষ করে রাত ছোট হলে তো কথাই নেই। আসলে বিষয়টি মানুষের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী।'

ইমাম আহমাদ ﷺ-এর এক ছাত্র রমাদানে সালাতের ইমামতি করতেন। ইমাম সাহেব তাকে বললেন, 'এরা দুর্বল লোক। সুতরাং তাদের নিয়ে পাঁচ বা ছয় বা সাত আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত কোরো।' সে ছাত্র বলেছেন, 'আমি এভাবে তিলাওয়াত করলাম এবং সাতাশতম রাতে কুরআন খতম করলাম।'

হাসান ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, উমার ﷺ যাকে লোকদের সালাত পড়ানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পাঁচ ছয় আয়াত তিলাওয়াত করতেন।

ইমাম আহমাদ ﷺ-এর কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পড়ার ক্ষেত্রে মুক্তাদির অবস্থা লক্ষ রাখতে হবে, যাতে তাদের কষ্ট না হয়। তিনি ছাড়া আবূ হানীফা ﷺ-এর ছাত্র অনেক ফকীহ এ মত ব্যক্ত করেছেন।

আবূ যার ﷺ বলেছেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রমাদান মাসে সিয়াম পালন করেছি। রমাদান মাসের প্রথম দিকে আমাদের নিয়ে তিনি (তারাবী) আদায় করেননি। তারপর সে মাসের সাত রাত বাকি থাকতে তিনি আমাদেরকে নিয়ে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত (তারাবীর) সালাত আদায় করলেন। তারপর ষষ্ঠ রাতে (অর্থাৎ পরের রাতে) আমাদের নিয়ে তিনি সালাত আদায় করেননি। পরে পঞ্চম রাতে আমাদের নিয়ে রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত তিনি সালাত আদায় করেন।'[২৮০]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাতের এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধরাত কিয়ামুল লাইল আদায় করলে সম্পূর্ণ রাত সালাত আদায়ের সাওয়াব পাওয়া যায়। তবে ইমাম সাথে থাকা শর্ত। আহমাদ ﷺ এ হাদীস গ্রহণ করে শেষ পর্যন্ত ইমামের সাথে

[২৮০] আবূ দাউদ, আসসুনান, হাদীস নং : ১৩৭৫, সহীহ

সাথে থাকতেন।

কোনো কোনো সালাফ বলেছেন, অর্ধ রাত পর্যন্ত কিয়ামুল লাইল করা মানেই সারারাত সালাত আদায় করা। আমর ইবনুল আস ﵁-এর পুত্র আবদুল্লাহ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

«مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ القَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ المُقَنْطِرِينَ.»

'যে ব্যক্তি রাতের সালাতে দাঁড়িয়ে দশ আয়াত পড়ে, সে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যে ব্যক্তি রাতে এক শ আয়াত তিলাওয়াত করে, সে অনুগত বান্দাদের দলভুক্ত হবে। এবং যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে অশেষ সাওয়াবপ্রাপ্তদের মধ্যে তালিকাভুক্ত করা হবে।'[২৮১]

আরও বেশি তিলাওয়াত করতে চাইলে এবং দীর্ঘ সময় ধরে সালাত আদায় করতে আগ্রহী হলে, একাকী যত ইচ্ছা দীর্ঘ সালাত আদায় করতে পারবে। যেমনটা নবি ﷺ এক হাদীসে বলেছেন।[২৮২] এমনিভাবে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করলেও তাতে যতটুকু তিলাওয়াত করা হয়, ততটুকুর ওপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

সালাফদের কেউ কেউ রমাদানের প্রতি তিন রাতে সালাতের মধ্যে কুরআন খতম করতেন। কাতাদা'র মতো অনেকে প্রতি সাত রাতে খতম করতেন। আবার আবূ রাজা আল-উতারিদির মতো অনেকে খতম করতেন প্রতি দশ রাতে।

আসওয়াদ ﵀ রমাদানের প্রতি দুই রাতে কুরআন খতম করতেন।

নাখাঈ ﵀ শেষ দশকে কেবল এমনটা করতেন। আর সারা মাস প্রতি তিন দিনে এক খতম দিতেন তিনি।

কাতাদা ﵀ সব সময় প্রত্যেক সাত দিনে খতম ওঠাতেন। আর রমাদানে করতেন প্রতি তিন দিনে। শেষ দশকে এসে প্রতি রাতেই এক খতম দিতেন।

শাফিয়ি ﵀ রমাদানে কেবল সালাতের বাইরেই ষাট খতম করতেন। আবূ হানীফা ﵀ সম্পর্কেও এমনটা বর্ণিত আছে।

[২৮১] আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং : ১৩৯৮

[২৮২] যেমন সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৭০৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৪৬৭

রমাদান এলে যুহরি ﷺ বলতেন, ‘এখন তো কুরআন তিলাওয়াত করা এবং মানুষকে আহার করানোর সময়।’

ইবনু আবদিল হাকাম বলেন, রমাদান এলে মালিক ﷺ হাদীস পাঠ এবং আহলুল ইলমের সাথে ওঠাবসা ছেড়ে দিয়ে কুরআন তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করতেন।

আবদুর রাযযাক বলেন, রমাদান এলে সুফইয়ান সাওরি ﷺ অন্য সব ইবাদাত ছেড়ে দিয়ে কুরআন তিলাওয়াতে নিমগ্ন হতেন।

আয়িশা ﷺ রমাদান মাসে দিনের শুরুতে কুরআন পড়তে বসতেন। ঘুমাতেন সূর্য ওঠার পর।

সুফইয়ান ﷺ বলেন, রমাদান এলে যুবাইদ আল-ইয়ামি কুরআন আনাতেন, আর ছাত্ররা তাঁর কাছে জড়ো হয়ে যেত।

তিনদিনের কমে কুরআন খতম করতে নিষেধাজ্ঞাটি স্বাভাবিক অবস্থার জন্য। তবে রমাদান মাস এবং লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করার মতো বিশেষ সময়গুলিতে অথবা মক্কার বাইরের অধিবাসীর জন্য মক্কার মতো বিশেষ জায়গায় অবস্থানের সময় অধিক হারে তিলাওয়াত করা মুসতাহাব। এটা ইমাম আহমাদ, ইসহাক এবং অন্যান্য ইমামের মত। অন্যদের আমল থেকে এমনটাই প্রমাণিত হয়, যেমনটা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

রমাদানে মুমিনের জিহাদ

মুমিন ব্যক্তি রমাদান মাসে নফসের বিরুদ্ধে দু' ভাবে জিহাদরত থাকে-

১. দিনের বেলায় তার জিহাদ হয় সিয়ামের মাধ্যমে।

২. রাতে তার জিহাদ হয় কিয়াম তথা সালাতের মাধ্যমে।

যথাযথভাবে ধৈর্যের সাথে এই জিহাদ দুটিতে মগ্ন থাকতে পারলে অফুরন্ত প্রতিদান মিলবে। এ আমল দুটি ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশও করবে। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ»، قَالَ: «فَيُشَفَّعَانِ»

> ‘কিয়ামাতের দিন সিয়াম এবং কুরআন বান্দার পক্ষে সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, ইয়া রব! দিনের বেলায় তাকে পানাহার এবং খাহেশাত থেকে আমি বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, ইয়া রব! রাতে তাকে ঘুম থেকে আমি বিরত রেখেছি। সুতরাং আমার সুপারিশ তার ব্যাপারে কবুল করুন। তারপর তাদের উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে।’[২৮৩]

মোটকথা, সিয়াম সেসব ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে, যারা তার কারণে পানাহার এবং সমস্ত হারাম খাহেশাত থেকে বিরত থাকবে। সেই বিরত থাকাটা পানাহার এবং যৌনাচারের মতো সিয়ামের সাথে সরাসরি জড়িত বিষয়ও হতে পারে, আবার অবৈধ কথাবার্তা, দৃষ্টি, রোজগার বা শ্রবণের সিয়ামের সাথে অসম্পৃক্ত বিষয়ও হতে পারে। অতএব, সিয়ামের কারণে এসব নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকলেই সিয়াম কিয়ামাতের দিন আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। সে বলবে, ইয়া রব! তাকে পানাহার এবং খাহেশাত থেকে আমি বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।

তদ্রূপ কুরআনের কারণে যে রাতে ঘুম থেকে বিরত ছিল, তার জন্য কুরআন সুপারিশ করবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআন পড়েছে এবং সে অনুযায়ী আমল করেছে, ওই ব্যক্তিই কুরআনের হক আদায় করেছে। কুরআনের সুপারিশ হবে সে ব্যক্তির জন্য।

আদর্শ কুরআন-পাঠকের পরিচয়

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ কুরআনের পাঠককে চেনার সাতটি উপায় বলেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

১. মানুষ যখন ঘুমায় তখন তার রাত কাটে বিনিদ্র,

২. মানুষ যখন সিয়ামহীন থাকে তখন তার দিন হয় সিয়ামপূর্ণ,

৩. মানুষ যখন হাসাহাসি করে তখন সে কাঁদে,

৪. মানুষ যখন মেলামেশা করে তখন সে নির্জনতা অবলম্বন করে,

৫. মানুষ গল্পগুজব করলে সে থাকে নীরব,

৬. মানুষ অহংকার করলে সে বিনয়ী হয় এবং

---

[২৮৩] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ৬৬২৬; হাকিম, আলমুসতাদরাক : ১/৭৪০, হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ

৭. মানুষের আনন্দ ফুর্তির সময় সে থাকে বিষণ্ণ।

উহাইব ইবনুল ওয়ারদ ﷺ বলেছেন, জনৈক ব্যক্তিকে না-ঘুমানোর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'কুরআনের অলৌকিকত্ব আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে।'

এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সাথে দু'মাস ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে না-ঘুমাতে দেখে প্রথম ব্যক্তিটি বলল, 'আপনাকে ঘুমাতে দেখি না যে?' উত্তরে প্রথম ব্যক্তিটি বলল, 'কুরআনের অলৌকিকত্ব আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। একটি অলৌকিকত্ব দেখে মুগ্ধতার রেশ কাটতে না-কাটতেই আরেকটি নজরে পড়ে।'

আহমাদ ইবনুল হাওয়ারি ﷺ বলেছেন, 'কুরআন পড়লে এবং প্রতিটি আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে আমি দিশেহারা হয়ে যাই। আমার অবাক লাগে, আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করেও হাফিযরা কীভাবে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারে? কীভাবে তারা দুনিয়ার তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকে! তারা যা তিলাওয়াত করে এর মূল্য যদি তারা বুঝত, এর স্বাদ যদি উপভোগ করত এবং তা পড়তে যদি তাদের কাছে মজা লাগত, তাহলে এমন অমূল্য নিয়ামাত প্রাপ্তির খুশিতে তাদের ঘুম উড়ে যেত।'

সুতরাং যার কাছে কুরআনের জ্ঞান আছে, কিন্তু সে রাতেও কিয়াম করে না আর দিনেও তদনুযায়ী আমল করে না, তাহলে কিয়ামাতের দিন কুরআন তার নষ্ট করা হক আদায়ের দাবি নিয়ে ওই ব্যক্তির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যাবে।

ইমাম আহমাদ ﷺ সামুরাহ ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবি ﷺ একবার স্বপ্নে দেখলেন, 'এক লোক চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। দাঁড়ানো লোকটি শুয়ে থাকা লোকটির মাথায় বড় পাথর দিয়ে আঘাত করছে। ফলে শোয়া লোকটির মাথা চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে আর পাথরটি দূরে ছিটকে পড়ছে। তখন দাঁড়ানো লোকটি পাথরটি কুড়িয়ে আনতে গেলে এদিকে শুয়ে থাকা লোকটির মাথা আবার আগের মতো হয়ে যাচ্ছে। তারপর লোকটি পাথরটি নিয়ে এসে আবার আগের মতো কাজ করছে। এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে নবিজি ﷺ জানতে পারলেন, শুয়ে থাকা লোকটিকে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দিয়েছিলেন। কিন্তু সে না রাতে তা নিয়ে কিয়াম করেছে আর না দিনে তদনুযায়ী আমল করেছে। এই ব্যক্তির সাথে কিয়ামাতের দিন এমন আচরণই করা হবে।' ইমাম বুখারি-ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তবে ভিন্ন শব্দে।[২৮৪]

[২৮৪] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ২০১৬৫; সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৩৮৬

সুতরাং যে জীবনভর নাফরমানি করেছে, মাস তো বটেই বছরের পর বছর নষ্ট করেছে সীমালঙ্ঘন করে, যে ব্যক্তির সম্বল কেবল দীর্ঘসূত্রিতা আর সীমালঙ্ঘন। সে তো কুরআন এবং রমাদানকে নিজের প্রতিপক্ষ বানিয়ে নিচ্ছে। প্রতিপক্ষের কাছ থেকে সে সুপারিশের আশা করবে কীভাবে?

অনেক রোজাদার ক্ষুৎ-পিপাসা ছাড়া কিছু পায় না। আবার অনেক তাহাজ্জুদগুজার রাত জাগার কষ্টটুকুই শুধু লাভ করে থাকে। অশ্লীলতা এবং মন্দ কর্ম থেকে বাধা দেয় না এমন সালাত আদায়কারী আল্লাহর থেকে কেবল দূরেই সরে চলে। তদ্রূপ মিথ্যা কথা আর কাজ থেকে যে সিয়াম রক্ষা করতে পারে না, সে সিয়াম পালনকারী হয় আল্লাহর ক্রোধের পাত্র এবং প্রত্যাখ্যাত।

ভাইয়েরা আমার! কোথায় গেল সিয়ামের প্রভাব! কোথায় আজ কিয়ামের ঝলক! এটা তো সেই রমাদান মাস, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে এবং যার শেষাংশে রয়েছে ইবাদাতকারীদের উপভোগ্য। আপনাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করা এবং শোনা হয়ে থাকে। এ তো সেই কুরআন, যা পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করা হলে তা ভয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত। তা সত্ত্বেও আমাদের অন্তর কাঁপে না, আর চোখও অশ্রুসজল হয় না। সিয়াম হারাম থেকে বিরত রাখার উপকারী মাধ্যম হয় না। আর না কিয়াম সঠিকভাবে হয় যে, তা পালনকারীর জন্য সুপারিশ করবে। হৃদয়গুলো তাকওয়াশূন্য হয়ে বিরানভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে। চারিদিক গুনাহের অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। কিছু দেখাও যায় না এবং শোনাও যায় না।

কুরআনের কত আয়াতই তো আমরা শুনি। অথচ আমাদের হৃদয়গুলি পাথরের মতো কিংবা তার চেয়েও অধিক শক্ত হয়ে আছে। কত রমাদানই তো আমরা লাভ করি, তবুও আমরা দুর্ভাগাই রয়ে গেছি। না যুবকদের চাহিদার শেষ আছে এবং না বৃদ্ধদের মন্দ কাজ ছেড়ে দিয়ে ভালো হওয়ার নামগন্ধ আছে।

কোথায় আমরা আর কোথায় তারা? তারা তো আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাক শুনে সাড়া দিয়েছিল। কোথায় তারা, আল্লাহর কালাম শুনলে যারা ভীত হয়ে পড়ে? যারা সিয়াম পালন করলে তাদের মুখ, চোখ এবং কানও সিয়াম পালন করে? তাদের মাঝে কি আমাদের জন্য আদর্শ নেই? তাদের থেকে আমাদের ফারাক কি সাফা-মারওয়ার দূরত্ব থেকেও বেশি? আসলে আমাদের মুখের কথা সুন্দর, কিন্তু কাজ তার চেয়েও বাজে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ...!

তৃতীয় পর্ব : মধ্য-রমাদান এবং শেষার্ধের আলোচনা

আবূ সাঈদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাদানের মধ্য দশকে ইতিকাফ করতেন। এক বছর তিনি এমন ইতিকাফ করলেন। অবশেষে একুশের রাত এল। যে রাতের সকালে তিনি বললেন,

«مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ.»

'যারা আমার সঙ্গে ইতিকাফ করছে, তারা যেন শেষ দশক (অবধি) ইতিকাফ করে। আমাকে এই রাত (অর্থাৎ লাইলাতুল কদর) দেখানো হয়েছিল। পরে আবার (সঠিক তারিখটি) ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আমি দেখতে পেয়েছি, ওই রাতের সকালে আমি কাদাপানির মাঝে সিজদাহ করছি। অতএব তোমরা তা শেষ দশকে এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তালাশ করো।'

বর্ণনাকারী বলেছেন, 'পরে এই রাতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। মাসজিদের ছাদ খেজুর পাতার ছাউনি হওয়ার দরুণ টপটপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। একুশ তারিখ ভোরে আমার চোখ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কপালে কাদাপানির চিহ্ন দেখতে পায়।'[২৮৫]

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, লাইলাতুল কদর তালাশের জন্য নবি ﷺ রমাদানের মধ্য দশকে ইতিকাফ করতেন। বর্ণনাপ্রসঙ্গ থেকে এটা বুঝে আসে যে, নবি ﷺ একাধিকবার এমনটা করেছিলেন।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাদান মাসের প্রথম দশকে ইতিকাফ করলেন। এরপর মাঝের দশকেও একটি ছোট তাঁবুর মধ্যে তিনি ইতিকাফ করলেন। তাঁবুটির দরজায় একটি চাটাই ঝোলানো ছিল। তিনি হাত দিয়ে চাটাইটি তুলে তাঁবুর কোণে রাখলেন। এরপর মাথা বাইরে আনলেন। সাহাবিরা তখন এগিয়ে এলেন তাঁর কাছে। নবি ﷺ বললেন,

«إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ، أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ، ثُمَّ

[২৮৫] সহীহহ বুখারি, হাদীস নং : ২০২৭

«أُتِيتُ، فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ

'এই রাতের সন্ধানে আমি (রমাদানের) প্রথম দশকে ইতিকাফ করলাম। তারপর মাঝের দশকে ইতিকাফ করলাম। এরপর কেউ একজন এসে আমাকে বলল, লাইলাতুল কদর শেষ দশকে আছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইতিকাফ করতে চায়, সে যেন (শেষ পর্যন্ত) ইতিকাফ করে।' তখন সাহাবিরা তাঁর সাথে ইতিকাফ করলেন।[২৮৬]

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, লাইলাতুল কদর যে শেষ দশকে এটা নবিজির জানা ছিল না। জানার পরে শেষ দশকে তিনি ইতিকাফ করলেন। ইন্তেকালের আগেই। আয়িশা এবং আবূ হুরায়রা ﷺ এমনটাই বর্ণনা করেছেন।

রমাদানের শেষার্ধে লাইলাতুল কদর তালাশ করার নির্দেশ এসেছে। এজন্যই সম্ভবত উবাই ইবনু কা'ব ﷺ রমাদানের শেষার্ধে বিতরের সালাতে কুনুত পড়তেন। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ রাত বা দিনের শেষাংশটি প্রথমাংশ অপেক্ষা উত্তম। যেমন আরাফার দিন এবং জুমুআর দিন। আবার স্বতন্ত্রভাবে রাত এবং দিনের শেষাংশ সাধারণত প্রথমাংশ থেকে উত্তম। এজন্যই আস সালাতুল উসতা বলে আসরের সালাত উদ্দেশ্য। বিভিন্ন সহীহ হাদীস এবং সালাফদের আমল থেকে এমনটাই প্রমাণিত হয়। তদ্রূপ যুলহিজ্জাহ মাস এবং মুহাররাম মাসের প্রথম দশকের মধ্যে শেষ দিনটি প্রথম দিনগুলো থেকে উত্তম।

বর্ণিত আছে, রমাদানের ১৭ তারিখ নবি ﷺ-এর নুবুওয়াতের সূচনা হয়েছিল। আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবনু আলি আল-বাকির বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিবরীল ﷺ শনিবার রাতে এবং রোববার রাতে এসেছিলেন। তারপর ১৭ই রমাদান রোজ সোমবার রিসালাত নিয়ে হেরা গুহাতে আগমন করেন।

বদর-যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এ রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির সর্বাধিক বিশুদ্ধ ঘটনা হলো, ১৭ তারিখের রাত ছিল বদরের রাত। কেউ কেউ ১৯ তারিখ বললেও ১৭ তারিখই প্রসিদ্ধ। এ রাতের দিনটি হলো ইয়াওমুল ফুরকান এবং দু'দলের মুখোমুখি হওয়ার দিন। এটিকে ইয়াওমুল ফুরকান বলার কারণ হলো, এ দিনেই আল্লাহ সত্য-মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন। বাতিল ও তার দলের বিরুদ্ধে হক ও হকপন্থিদের জয় দান করেছেন। সমুন্নত করেছেন আল্লাহর কালিমা ও তাওহীদ এবং লাঞ্ছিত করেছেন

[২৮৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৬৭

তাঁর শত্রু মুশরিক ও কিতাবিদের।

মূলত সাহাবিদের বিশেষত মুহাজিরদের প্রয়োজনে নবিজি ﷺ বের হয়েছিলেন। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿٨﴾

'এই সম্পদ অভাবী মুহাজিরদের জন্যে, যাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি এবং সম্পত্তি থেকে উৎখাত করা হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ আর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী।'[২৮৭]

যেসব কাফির মুসলমানদের নিজেদের ঘরবাড়ি এবং সম্পত্তি জবরদখল করে নিয়েছিল, এই কাফেলাতে তাদের অনেক ধনসম্পদ ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তো তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, "আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ।" আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইয়াহূদিদের উপাসনালয় ও মাসজিদসমূহ—যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। যে আল্লাহকে সাহায্য করে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন। আল্লাহ তো শক্তিমান, পরাক্রমশালী।'[২৮৮]

---

[২৮৭] সূরা হাশর, ৫৯ : ৮

[২৮৮] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩৯-৪০

তখন নবি ﷺ মনস্থ করলেন যে, অত্যাচারী এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পদ নিয়ে আল্লাহর বন্ধু এবং তাঁর দলভুক্তদের মধ্যে যারা অত্যাচারের শিকার ও ঘরবাড়ি থেকে বহিস্কৃত, তাদের দিয়ে দেবেন। যাতে আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে নিয়োজিত থাকার জন্য তাদের শক্তি সঞ্চার হয়। এ উম্মাতের জন্য আল্লাহর হালাল করে দেওয়া সম্পদের অন্যতম হলো গানীমাত। পূর্বেকার কোনো উম্মাতের জন্য তা হালাল ছিল না।

সংখ্যায় তারা ছিলেন ৩১০ জনের কিছু বেশি। তাদের সংখ্যা ছিল তালূতের সঙ্গে নদী পাড়ি দেওয়া লোকদের সংখ্যার বরাবর; যার সঙ্গে সেদিন শুধু মুমিনরাই নদী পাড়ি দিয়েছিল। সাহাবিদের নিয়ে নবিজি যখন বের হয়েছিলেন, তখন তাঁদের বাহন এবং পাথেয় ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। কারণ তাঁরা কোনো রকম যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বের হননি। মূল উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক কাফেলার ওপর হামলা করা। তাঁদের সাথে ছিল সত্তরটির মতো উট, যাতে তারা পালাক্রমে আরোহণ করতেন। প্রতি তিনজনের ভাগে একটি উট পড়েছিল। স্বয়ং নবি ﷺ-এর সাথেও দুজন আরোহী ছিলেন। তাঁরা আরোহণ করেছিলেন একটি উটের ওপর। নবিজির সহ-আরোহী দুজন তাঁকে বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আরোহণ করুন। আমরা হেঁটে যাই।’ উত্তরে নবিজি ﷺ বললেন,

«مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّي، وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمْ»

‘তোমরা আমার থেকে বেশি শক্তিশালী নও, আবার আমিও তোমাদের চেয়ে সাওয়াবের প্রতি কম অমুখাপেক্ষী নই।’[২৮৯]

মুসলিমদের কাছে ছিল মাত্র দুটি ঘোড়া। কেউ কেউ তিনটি ঘোড়ার কথা বলেছেন। আবার কারও মতে, মিকদাদ رضي الله عنه-এর একটি ঘোড়া ছিল।

বাণিজ্যিক কাফেলার উদ্দেশ্যে নবি ﷺ-এর বের হওয়ার খবর মুশরিকদের কাছে পৌঁছে গেল। তখন আবূ সুফইয়ান কাফেলা নিয়ে সমুদ্র পাড়ের পথ ধরল। আর কাফেলাকে রক্ষা করার জন্য সাহায্য চেয়ে মক্কায় বার্তা পাঠালে তখন মক্কার নেতৃস্থানীয় এবং অভিজাত লোকেরা বদরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

---

[২৮৯] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, হাদীস নং : ৪২৯৯

নবি ﷺ সাহাবিদের নিয়ে যুদ্ধের ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। তখন মুহাজিররা সমর্থন দিলে তিনি চুপ থাকলেন। আসলে তিনি আনসারদের মতামত জানতে চাচ্ছিলেন। কারণ তিনি ভেবেছিলেন, আনসাররা কেবল নিজেদের এলাকার মধ্যেই তাঁকে সাহায্য করার ব্যাপারে বাইআত গ্রহণ করেছে। তখন সা'দ ইবনু উবাদাহ رضي الله عنه দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনি মনে হয় আমাদের কথা জানতে চাচ্ছেন। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি! আপনি আমাদেরকে ঘোড়া নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বললে আমরা অবশ্যই ঝাঁপ দেবো। আমাদের সাওয়ারি হাঁকিয়ে বারকুল গিমাদ পর্যন্ত পৌঁছার আদেশ দিলে, তা-ই করব।' আর মিকদাদ رضي الله عنه বললেন, 'মূসা عليه السلام-কে বনি ইসরাঈল যেমন বলেছিল, "তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ করো",[২৯০] আমরা তেমনটা বলব না। বরং আপনার ডানে, বামে, সামনে এবং পেছন দিক থেকে আমরা যুদ্ধ করব।'

এ কথা শুনে নবি ﷺ খুশি হয়ে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ১৭ই রমাদানের জুমুআর সেই রাতটি তিনি সালাত আদায়, কান্না এবং শত্রুর বিপক্ষে সাহায্য চেয়ে দুআর মধ্যে কাটিয়ে দিলেন।

আলি رضي الله عنه বলেছেন, 'আমি দেখেছি যে, (বদরের রাতে) আমাদের সবাই ঘুমিয়ে ছিল। শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গাছের নিচে ভোর পর্যন্ত সালাত আদায় এবং রোনাজারি করে কাটিয়ে দিয়েছিলেন।'[২৯১]

অবশেষে আল্লাহ নবি ﷺ এবং মুমিনদের সাহায্য করেছেন ও সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝٩ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝١٠

'স্মরণ করো, তোমরা যখন তোমাদের প্রতিপালকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিলে; তখন তিনি তোমাদের জবাব দিয়েছিলেন, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে, যারা একের পর এক আসবে। আর আল্লাহ তো এটা করলেন শুধু তোমাদের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এবং যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হয়। আর

[২৯০] সূরা মায়িদা, ৫ : ২৪

[২৯১] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ১০২২

জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ»

'আরব ভূখণ্ডে মুসল্লিগণ শয়তানের উপাসনা করবে, এ বিষয়ে শয়তান নিরাশ হয়ে পড়েছে। তবে তাদের একজনকে অন্যের বিরুদ্ধে উসকে দেওয়ার ব্যাপারে (সে নিরাশ হয়নি)।'[২৯৭]

মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রেরণ এবং পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর দাওয়াত পৌঁছে যাওয়া ছিল ইবলীসের কাছে সবচেয়ে বেশি কষ্টের বিষয়। কারণ, এই উম্মাতকে শিরকে আকবারের দিকে ফেরানোর ব্যাপারে সে হতাশ হয়ে গেছে। নবি ﷺ প্রেরিত হওয়ার পর তাঁকে এবং তাঁর উম্মাতের আমল দেখে সে প্রতিনিয়ত দুঃখে কপাল চাপড়াচ্ছে।

আল্লাহ তাঁর বান্দাকে মাফ করছেন এবং জাহান্নাম থেকে রেহাই দিচ্ছেন দেখে ইবলীস ভীষণ কষ্ট পায়। আরাফার দিন ক্রমাগত রহমত নাযিল হচ্ছে এবং বান্দার বড় বড় গুনাহও আল্লাহ ক্ষমা করে দিচ্ছেন দেখে সে ভীষণ অপমানিত হয়। চূড়ান্ত লাঞ্ছিত হয়ে সে অনেক দূরে সরে যায়। এমন দৃশ্য সে কেবল বদরের দিন দেখেছিল। রমাদান মাসে আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদির প্রতি দয়াপরবশ হয়ে শয়তান এবং দুষ্ট জিনদের বন্দি করেন। যাতে তারা গুনাহের কাজ সংঘটিত করাতে না পারে। এ কারণেই রমাদান মাসে উম্মাতের মাঝে গুনাহ কম সংঘটিত হয়ে থাকে। সহীহ বুখারিতে আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

«إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ»

'রমাদান মাস এলে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো করে দেওয়া হয় বন্ধ। আর শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়।'[২৯৮]

মুসলিমে আছে,

«إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ»

---

[২৯৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৮১২

[২৯৮] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৮৯৯

'রমাদান এলে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে করা হয় শিকলবন্দি।'[২৯৯]

ইমাম তিরমিযি এবং ইবনু মাজাহ ﷀ বর্ণনা করেছেন যে, নবি ﷺ বলেছেন,

«إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ»

"রমাদান মাসের প্রথম রাতেই শয়তান এবং দুষ্ট জিনদের শিকলবন্দি করে ফেলা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর একটি দরজাও তখন আর খোলা হয় না। (অপরদিকে) জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। এর একটি দরজাও আর বন্ধ করা হয় না। একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকে, 'হে কল্যাণকামী! সামনে অগ্রসর হও। হে পাপাচারী! থেমে যাও।' আর আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক জাহান্নামীকে মুক্তি দেওয়া হয়। (রমাদানের) প্রত্যেক রাতেই এমনটা চলতে থাকে।"[৩০০]

ইমাম আহমাদ ﷀ আবূ হুরায়রা ﵁-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবি ﷺ বলেছেন,

«أُعْطِيَتْ أُمَّتِي خَمْسَ خِصَالٍ فِي رَمَضَانَ، لَمْ تُعْطَهَا أُمَّةٌ قَبْلَهُمْ: خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، وَيُزَيِّنُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: يُوشِكُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمَئُونَةَ وَالْأَذَى وَيَصِيرُوا إِلَيْكِ، وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، فَلَا يَخْلُصُوا فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ.»

'আমার উম্মাতকে রমাদানে পাঁচটি বিশেষত্ব দেওয়া হয়েছে, যা তাদের পূর্ববর্তী কোনো উম্মাতকে দেওয়া হয়নি। (১) সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিসকের ঘ্রাণ থেকেও প্রিয়। (২) ইফতারের আগ পর্যন্ত ফেরেশতারা রোজাদারের জন্য ইসতিগফার করতে থাকে। (৩)

---

[২৯৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১০৭৯

[৩০০] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৬৮২; ইবনু মাজাহ, আসসুনান, হাদীস নং :১৬৪২, হাকিম ﷀ হাদীসটিকে শায়খাইনের শর্ত অনুসারে সহীহ বলেছেন।

আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন জান্নাতকে সজ্জিত করেন। তারপর বলেন, "আমার নেককার বান্দারা ত্যাগ এবং কষ্ট স্বীকার করে শীঘ্রই তোমার কাছে আসছে।" (৪) দুষ্ট শয়তানগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। ফলে তারা অন্য মাসের মতো এ মাসে মানুষকে গোমরাহির পথে নিতে পারে না। (৫) রমাদানের শেষ রাতে রোজাদারকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।'

সাহাবিরা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ রাতটি কি লাইলাতুল কদর?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

لَا، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ

'না, আসলে শ্রমিককে তো কাজ শেষ করার পরই পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।'[৩০১]

লাইলাতুল কদরে ফেরেশতারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন। তখন শয়তানের কর্তৃত্ব হ্রাস পায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴿٥﴾

'সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (অর্থাৎ জিবরীল) অবতীর্ণ হন, প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে। শান্তিই শান্তি, ভোর পর্যন্ত (তা অব্যাহত থাকে)।'[৩০২]

হে মুসলিমগণ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। জান্নাতের আটটি দরজা এ মাসে আপনাদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। মুমিনের অন্তরে বইতে শুরু করেছে জান্নাতী সমীরণ। জাহান্নামের সবগুলো দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের (ইবাদাতের) সুবিধার্থে শয়তান ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের পায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে শিকল। এ মাসে ইবলীসকে শাস্তি দেওয়ার জন্য পাকড়াও করা হয়। পাপীদের এমনভাবে মুক্তি দেওয়া হয় যে পাপের কোনো চিহ্নই তাদের মধ্যে থাকে না। যারা ছিল শয়তানের পোষ্য, যাদেরকে সে নিজের আস্তানাতে কুপ্রবৃত্তি দিয়ে খোরাক যুগিয়েছিল, আজ তারা সে আস্তানা বর্জন করেছে। তাওবা এবং ইসতিগফারের কুঠার দিয়ে শয়তানের দূর্গগুলো গুঁড়িয়ে দিয়েছে। শয়তানের জেলখানা থেকে বের

[৩০১] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ৭৯১৭

[৩০২] সূরা কাদর, ৯৭ : ৪-৫

হয়ে তাকওয়া এবং ঈমানের কেল্লাতে আশ্রয় নেওয়ার ফলে জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে গেছে তারা। তাওহীদের বাণীর মাধ্যমে তারা ভেঙে দিয়েছে শয়তানের মেরুদণ্ড। এ যন্ত্রণা সে ভোগ করতে থাকে প্রতিটি ফযিলতপূর্ণ সময়ে। এ মাসে আল্লাহর ক্রমাগত রহমত এবং মাগফিরাত নাযিল হতে দেখে, সে মানুষের বরবাদি কামনা করতে থাকে। এ মাসে রহমানের দল বিজয় লাভ করে। শয়তানের দল পালিয়ে বাঁচে। কাফির ছাড়া আর কারও ওপর ইবলীসের ক্ষমতা চলে না। প্রবৃত্তির শাসনকার্যের অবসান ঘটে। চলতে থাকে তাকওয়ার অনুশাসন।

فَٱعْتَبِرُوا۟ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَبْصَٰرِ ۝٢

'অতএব হে জ্ঞানীরা! শিক্ষা গ্রহণ করুন।'[৩০৩]

চতুর্থ পর্ব : রমাদানের শেষ দশকের আলোচনা

আয়িশা ﵂ বলেছেন, 'রমাদানের শেষ দশক আসলে নবি ﷺ শক্ত করে কোমর বাঁধতেন। রাতে নিজে জেগে থাকতেন এবং পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন।'[৩০৪]

আয়িশা ﵂ আরও বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাদানের শেষ দশক (ইবাদাতে) এমনভাবে সচেষ্ট থাকতেন, অন্য সময়ে ততটা থাকতেন না।'[৩০৫]

নবিজির আমল

রমাদানের শেষ দশকে নবি ﷺ অন্যান্য মাসের তুলনায় বেশি বেশি আমল করতেন। এ সময়টাতে যেসব আমল তিনি করতেন,

রাতে জেগে ইবাদাত করা। সম্পূর্ণ রাত জাগরণ করা এবং রাতের অধিকাংশ সময় জাগরণ করা দুটিই সম্ভাবনাই আছে। দ্বিতীয়টির সমর্থনে আয়িশা ﵂ বলেছেন, 'নবি ﷺ ভোর পর্যন্ত রাত জেগে ইবাদাত করেছেন, এমনটা আমি দেখিনি।'[৩০৬]

পরিবারের লোকদের জাগিয়ে দেওয়া। রমাদানের শেষ দশকে নবি ﷺ পরিবারের

[৩০৩] সূরা হাশর, ৫৯ : ২
[৩০৪] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ২০২৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৭৪
[৩০৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৭৫
[৩০৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৭৪৬

লোকদের সালাতের জন্য জাগিয়ে দিতেন। অন্যান্য মাসে তা করতেন না।

সুফইয়ান সাওরি ﷺ বলেছেন, 'রমাদানের শেষ দশকের রাতে অধিক পরিমাণে তাহাজ্জুদ পড়া, এ ব্যাপারে জানপ্রাণ লাগানো, পরিবারকে এবং সম্ভব হলে ছোট সন্তানদের জাগিয়ে দেওয়া আমার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয়।' সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়, নবি ﷺ ফাতিমা ও আলি ﷺ-এর দরজায় কড়া নেড়ে সালাতের জন্য ডাকতেন।[৩০৭]

নবি ﷺ রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ শেষে বিতরের সালাত আদায় করার সময় আয়িশা ﷺ -কে জাগিয়ে দিতেন। হাদীসে স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে সালাতের জন্য ডাকতে গিয়ে চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ পাওয়া যায়।

উমার ﷺ রাতে যতক্ষণ সম্ভব সালাত আদায় করতেন। অর্ধ রাতে তিনি 'সালাত, সালাত' বলতে বলতে পরিবারের লোকদের জাগাতেন। তারপর তিনি তিলাওয়াত করতেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

'আপনার পরিবারের লোকদেরকে আপনি সালাতের আদেশ করুন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন।'[৩০৮]

হাবীব আবূ মুহাম্মাদের স্ত্রী রাতের বেলা স্বামীকে বলতেন, 'রাত তো কেটেই গেছে। আমাদের সামনে কত পথ বাকি, অথচ আমাদের পাথেয় সামান্য। সৎলোকদের কাফেলা এগিয়ে গেছে, আর আমরা পেছনে পড়ে আছি!'

নবি ﷺ শক্ত করে কোমর বাঁধতেন। মুহাদ্দিসগণ এ কথার বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা করেছেন। কারও মতে, এ কথা বলে অধ্যবসায় এবং ইবাদাতে সচেষ্ট হওয়া উদ্দেশ্য। কথায় বলে, 'অমুক কোমর বেঁধে নেমেছে।' তবে এ ব্যাখ্যার ওপর আপত্তি আসে। কারণ সহীহ মুসলিম এর বর্ণনায় আয়িশা ﷺ বলেছেন, '(নবি ﷺ) অধ্যবসায় করতেন এবং কোমর বেঁধে নিতেন।'[৩০৯] এজন্য বিশুদ্ধ মতানুসারে এর অর্থ হলো তিনি স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকতেন। সালাফ এবং পূর্ববর্তী ইমামগণ এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

---

[৩০৭] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৭২১১

[৩০৮] সূরা ত্বা-হা, ২০ : ১৩২

[৩০৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৭৪

নবি ﷺ সাধারণত শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। আর কুরআন, হাদীস এবং ইজমা অনুসারে ইতিকাফকারীর জন্য স্ত্রীসহবাস করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ

'সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ যা কিছু নির্ধারণ করেছেন সেটা তালাশ করো।'[৩১০]

সালাফদের একদলের মতে, এখানে উদ্দেশ্য হলো লাইলাতুল কদর তালাশ করা। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা রমাদানের রাতে স্ত্রীসহবাস বৈধ করার পাশাপাশি লাইলাতুল কদর তালাশ করারও আদেশ দিয়েছেন। এমন যাতে না হয়, মুসলিমরা সারা মাস রাতভর বৈধ সম্ভোগে লিপ্ত হয়ে লাইলাতুল কদর হারিয়ে ফেলেছে। তাই লাইলাতুল কদর অন্বেষণে বিশেষ করে সম্ভাব্য রাতগুলিতে তাহাজ্জুদ আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্যই নবি ﷺ রমাদানের প্রথম বিশদিন পরিবারের সাথে কাটিয়ে, শেষ দশক স্ত্রীদের থেকে পৃথক হয়ে যেতেন। লাইলাতুল কদর অন্বেষণে মনোনিবেশ করতেন।

মাগরিব এবং ইশার সালাতের মাঝে গোসল করা। হাম্মাদ ইবনু সালামা ﷺ বলেছেন, সাবিত আল-বুনানি ﷺ এবং হুমাইদ ﷺ সম্ভাব্য লাইলাতুল কদরে উত্তম পোশাক পরিধান করতেন এবং সুগন্ধি ও ধুনি দিয়ে মাসজিদ সুরভিত করতেন।

সাবিত আল-বুনানি ﷺ বলেছেন, তামীম আদ-দারি ﷺ-এর একটি পোশাক ছিল। ওটা তিনি একহাজার দিরহাম দিয়ে কিনেছিলেন। সম্ভাব্য লাইলাতুল কদরে সে পোশাকটি তিনি পরতেন। এ থেকে বোঝা যায়, ঈদ এবং জুমার সময়ের মতো সম্ভাব্য কদরের রাতেও গোসল করে পরিস্কার হওয়া, নতুন কাপড় পরা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা উত্তম। আর সালাতের সময় উত্তম পোশাক পরিধানের কথা তো আল্লাহই বলেছেন,

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

'হে আদম-সন্তান! প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছেদ গ্রহণ করবে।'[৩১১]

---

[৩১০] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৭

[৩১১] সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩১

ইবনু উমার ﵁ বলেছেন, 'আল্লাহর জন্য সজ্জিত হওয়া অধিকতর কর্তব্য।'

তবে বাহ্যিক সাজসজ্জা পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য। আর অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য অর্জিত হয় আল্লাহর কাছে সমর্পিত হওয়া, তাওবা করা এবং যাবতীয় গুনাহ থেকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে। কারণ, অন্তর বিরান রেখে বাহ্যিক সৌন্দর্য কোনো কাজে আসে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ۝٢٦

'হে আদম-সন্তান, আমি তোমাদেরকে পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়েছি তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য এবং শোভা বর্ধনের জন্য। আর তাকওয়ার পোশাক হচ্ছে সর্বোত্তম। ওটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।'[৩১২]

নির্জনে রাজার সাথে আলাপচারিতার উপযুক্ত তো সে, যার ভেতর-বাহির সজ্জিত এবং পবিত্র। বিশেষত সে রাজা যদি এমন হন যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু জানেন, যিনি বাহ্যিক অবস্থা এবং ধন-সম্পদ বাদ দিয়ে অন্তর এবং আমলের দিকে লক্ষ করেন। সুতরাং তাঁর সামনে সালাতে দাঁড়ানোর সময় বাহ্যিক দিকটা উত্তম পোশাকে এবং অভ্যন্তরীণ দিকটা তাকওয়ার লেবাসে সাজিয়ে নেওয়া উচিত।

ইতিকাফ করা। আয়িশা ﵂ বলেছেন, নবি ﷺ ইন্তেকাল পর্যন্ত রমাদানের শেষ দশকে ইতিকাফ করেছেন।[৩১৩]

আবূ হুরায়রা ﵁ বলেছেন, নবি ﷺ প্রতি রমাদানে দশ দিন ইতিকাফ করতেন। ইন্তেকালের বছর তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করেছেন।[৩১৪]

লাইলাতুল কদর তালাশের জন্য নবিজি রমাদানের শেষ দশ দিন সমস্ত চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে যেতেন। নির্জনে আল্লাহর কাছে মুনাজাত ও যিকরে মগ্ন হওয়ার জন্য ইতিকাফ করতেন। চাটাই দিয়ে মাসজিদের একটি অংশ পৃথক করে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেন। কারও সাথে মিশতেন না বা কোনো কাজে লিপ্ত হতেন না। এজন্যই ইমাম আহমাদ ﵀ বলেছেন, মানুষের সাথে মেলামেশা না-

[৩১২] সূরা আ'রাফ, ৭ : ২৬

[৩১৩] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ২০২৬

[৩১৪] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ২০৪৪

করা ইতিকাফকারীর জন্য মুসতাহাব। এমনকি ইলম ও কুরআন শিক্ষার জন্যও মেলামেশা না করা ভালো। বরং উত্তম হলো একাকী দুআ-মুনাজাত এবং যিকরে মগ্ন থাকা।

মোটকথা, এ উম্মাতের জন্য শারীয়াত অনুমোদিত নির্জনবাস হলো মাসজিদে ইতিকাফ করা। বিশেষভাবে রমাদান মাসে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে রমাদানের শেষ দশকে যা করা যায়। নবি ﷺ যেমনটা করতেন।

স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক করার জন্য সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই ইতিকাফের মর্ম। আল্লাহর পরিচয় লাভ এবং তাঁর সাথে মহব্বত যত দৃঢ় হবে, যে-কোনো অবস্থায় সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর সাথে নিবিষ্ট হওয়া তত বেশি সম্ভব হবে।

ইবাদাতকারীদের জন্য লাইলাতুল কদরের আগমন ঘটুক। ইবাদাতকারীদের পা আল্লাহর উদ্দেশ্যে রুকু সিজদাহ করুক। মুনাজাতকারীদের মুখ সচেষ্ট হয়ে দুআয় মনোনিবেশ করুক।

যে নিজের জীবনকে নিঃশেষ করে দিয়েছে তাকে বলছি, ওঠো। তোমার জীবনে যা কিছু ছুটে গেছে লাইলাতুল কদরে সেগুলো ফিরে পেতে চেষ্টা করো। কারণ, এটাই তোমার জীবনের জন্য যথেষ্ট।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ ۝١ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ ۝٢ لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ ۝٣

'নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে। লাইলাতুল কদর সম্পর্কে আপনি কী জানেন? লাইলাতুল কদর হাজার মাস থেকেও শ্রেষ্ঠ।'[৩১৫]

ইমাম মালিক ﵀ বলেছেন, নবি ﷺ-কে তাঁর পূর্ববর্তী লোকদের মানুষের আয়ু দেখানো হয়। অথবা আল্লাহ যতটুকু চেয়েছেন ততটুকু দেখানো হয়। তখন তিনি তাঁর উম্মাতের আয়ু সংক্ষিপ্ত মনে করলেন, যার কারণে তারা আমলের দিক দিয়ে অন্যান্য উম্মাতের সমকক্ষ হতে পারবে না। তারপর আল্লাহ তাঁকে হাজার মাস থেকে উত্তম লাইলাতুল কদর দান করেন।[৩১৬]

---

[৩১৫] সূরা কাদর, ৯৭ : ১-৩

[৩১৬] মুওয়াত্তা মালিক, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২১

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

'যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদাত করে, তার পেছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।'[৩১৭]

সুতরাং, মাসের অবশিষ্ট সময়ে আমলের গানীমাত গ্রহণে দ্রুত এগিয়ে আসা উচিত। তাহলে আশা করা যায় জীবনের নষ্ট করে ফেলা অংশের খেসারত হয়ে যাবে।

পঞ্চম পর্ব : রমাদানের আখেরি সাত রাত

আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﵄ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবিকে স্বপ্নযোগে রমাদানের শেষ সাত রাতে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

«أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ»

'তোমাদের দেখা তো দেখছি আমার দেখা শেষ সাত রাতের ক্ষেত্রে মিলে গেছে। অতএব যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরের সন্ধান প্রত্যাশী, সে যেন শেষ সাত রাতে সন্ধান করে।'

সহীহ মুসলিমে ইবনু উমার ﵄ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

«الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ، فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي»

'তোমরা রমাদানের শেষ দশদিনে কদরের রাত তালাশ করো। তোমাদের কেউ দুর্বল বা অপারগ হয়ে পড়লে শেষ সাত রাতে যেন অলসতা না করে।'[৩১৮]

[৩১৭] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৯০১
[৩১৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৬৫

আগে আমরা আলোচনা করেছি, নবি ﷺ লাইলাতুল কদর তালাশে রমাদান মাসে কঠোর সাধনা করতেন। একবার এজন্য তিনি প্রথম দশকে ইতিকাফ করেন। তারপর একই উদ্দেশ্যে মধ্য দশকে ইতিকাফ করেন। এমনটা করেছিলেন একাধিকবার। তারপর লাইলাতুল কদর তালাশে নিজেও শেষ দশকে ইতিকাফ করলেন এবং আদেশও দিলেন।

সহীহ বুখারি এবং মুসলিমে আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»

'তোমরা রমাদানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদরে তালাশ করো।'[৩১৯]

এ অর্থে অনেক হাদীস আছে। শেষ দশকের বেজোড় রাতে তিনি লাইলাতুল কদর তালাশের আদেশ করতেন। সহীহ বুখারিতে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِ، فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى»

'তোমরা তা রমাদানের শেষ দশকে তালাশ করো। লাইলাতুল কদর (শেষ দিক থেকে গণনায়) নবম, সপ্তম বা পঞ্চম রাতে থাকে।'[৩২০]

এরপর তিনি শেষ সাত দিনে তালাশ করার নির্দেশ দিলেন।

অধিকাংশ আলিমের মতে, শেষ দশকের রাতগুলিতেই লাইলাতুল কদর হয়ে থাকে। তবে দশ রাতের মধ্যে কোন রাত বেশি সম্ভাবনাময়, এ বিষয়ে তারা একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশ আলিমের মতে, এক রাত অপেক্ষা অপর রাত বেশি সম্ভাবনাময়। আর কারও কারও মতে, সামগ্রিকভাবে বেজোড় রাতগুলিই বেশি সম্ভানাময়। তবে কোন বেজোড় রাত, এ বিষয়ে তারা বিভিন্ন মত দিয়েছেন। ইমাম শাফিয়ি ﵀-এর প্রসিদ্ধ মতানুসারে, তা ২১ তারিখের রাত। ইমাম শাফিয়ি ﵀ থেকে বর্ণিত আরেকটি মত হলো, ২৩ তারিখের রাতটি অধিক সম্ভাবনাময়। একদল আলিম তা ২৭ তারিখের রাত বলে মত ব্যক্ত করেছেন। সুফইয়ান সাওরি ﵀ কুফাবাসীদের থেকে এটা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'উবাই ইবনু কা'ব ﵁ থেকে বর্ণনা পাওয়া যায় বিধায় আমরা তা ২৭ তারিখ মনে করি।'

---

[৩১৯] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ২০২০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৬৯

[৩২০] সহীহ রাখিুব, হাদীস নং : ১২০২

উবাই ইবনু কা'ব ﵁ শপথ করে ২৭ তারিখ লাইলাতুল কদর হওয়ার কথা বলতেন। এ মতাবলম্বী ছিলেন ইবনু হুবাইশ এবং আবদাহ ইবনু আবী লুবাবাহ ﵏। কানান ইবনু আবদিল্লাহ আন-নাহমি বলেছেন, 'আমি ইবনু হুবাইশকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "উমার এবং হুযাইফা ﵄-সহ অনেক সাহাবি ২৭তম রাতে লাইলাতুল কদর হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন।"'

আহমাদ ﵀ এবং ইসহাক ﵀-এর মত এটাই। ২৭ তারিখের মতকে যারা প্রাধান্য দিয়ে থাকেন তারা বলেন, উবাই ﵁ শপথ করে বলেছেন, 'আমি জানি সেটা কোন রাত। নবি ﷺ আমাদের সেই রাতে জেগে ইবাদাত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যে রাতের ভোর হলো ২৭ রমাদান। আর সে রাতের লক্ষণ হলো, এ দিনের সূর্য কিরণের তীব্রতা ছাড়া উদিত হয়।'[৩২১]

ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত আছে, একজন লোক নবি ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর নবি! আমি একজন বৃদ্ধ মানুষ। সালাতে দাঁড়িয়ে থাকা আমার জন্য কষ্টকর। এখন আপনি আমাকে এমন একটি রাতের কথা বলে দিন, যাতে আল্লাহর তাওফীকে আমি লাইলাতুল কদর পাব।' নবিজি ﷺ বললেন,

عَلَيْكَ بِالسَّابِعَةِ

'তুমি ২৭শের রাতে ইবাদাত কোরো।'[৩২২]

লাইলাতুল কদরের আমল

পেছনে আমরা উল্লেখ করেছি, নবি ﷺ বলেছেন,

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

'যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদাত করে, তার পেছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।'[৩২৩]

এখানে কিয়াম বা রাত জেগে ইবাদাত করার অর্থ হলো, তাহাজ্জুদ এবং অন্যান্য সালাত আদায় করা। এছাড়া আয়িশা ﵂-কে নবি ﷺ সে রাতে দুআ করতেও বলেছেন।

[৩২১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৭৬২

[৩২২] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ২১৪৯, হাদীসটি ইমাম বুখারির শর্তানুযায়ী সহীহ

[৩২৩] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৯০১

সুফইয়ান সাওরি ﷺ বলেছেন, 'সে রাতে সালাত আদায়ের চেয়ে দুআ করা আমার কাছে বেশি প্রিয়।'

সুফইয়ান ﷺ-এর উদ্দেশ্য হলো, অধিক পরিমাণে দুআ করা হয় না, এমন সালাত থেকে অধিক পরিমাণে দুআ করা উত্তম। কুরআন তিলাওয়াত এবং দুআ করলে সেটাও ভালো।

রমাদানের রাতগুলিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তারতীলের সাথে এবং সুন্দর কিরাআতে তাহাজ্জুদ পড়তেন। রহমতের কোনো আয়াত পড়লে দুআ করতেন, আযাব-সংক্রান্ত আয়াত পড়লে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন। এককথায়, নবি ﷺ-এর সালাতে কিরাআত, দুআ এবং ফিকিরের সমন্বয় ঘটত। রমাদানের শেষ দশকের রাতগুলি তো বটেই, অন্যান্য সময়ও এটা সর্বোত্তম এবং পূর্ণাঙ্গতর আমল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

গুনাহগারদের আহাজারি, আল্লাহর প্রেমিকদের দীর্ঘশ্বাস এবং তাওবাকারীদের আর্জিতে এ রাতের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। অপরাধীরা এ রাতে ভাঙা পায়ে দাঁড়িয়ে যদি ইউসুফ عليه السلام-এর ভাইদের মতো আর্জি জানায়। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই ইউসুফ عليه السلام-এর চেয়ে বেশি মমতা প্রদর্শন করবেন।

নবিজি ﷺ-কে আয়িশা ﷺ বলেছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি লাইলাতুল কদর পেয়ে যাই, তবে কী দুআ করব?'

নবিজি ﷺ বললেন,

قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

'তুমি বলবে, (অর্থ) "ইয়া আল্লাহ! আপনি তো অত্যন্ত ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে আপনি ভালোবাসেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন।"'[৩২৪]

الْعَفُوُّ। আল্লাহর অন্যতম নাম। যার অর্থ, এমন সত্তা যিনি বান্দার গুনাহ এড়িয়ে যান এবং বান্দার গুনাহের চিহ্ন পর্যন্ত মিটিয়ে দেন। তিনি ক্ষমা পছন্দ করেন। বান্দাকে ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। তিনি চান, বান্দারা যেন একে অপরকে ক্ষমা করে দেয়। বান্দারা যখন একে অন্যকে মাফ করে দেবে, তিনিও তাদের সাথে ক্ষমার আচরণ করবেন। শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে ক্ষমা করে দেওয়াই তাঁর কাছে পছন্দনীয়।

---

[৩২৪] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৩৫১৩, হাসান সহীহ

নবি ﷺ দুআতে বলতেন,

«اَللّٰهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ»

'ইয়া আল্লাহ! আপনার সন্তোষের মাধ্যমে আপনার অসন্তুষ্টি থেকে এবং আপনার ক্ষমার মাধ্যমে আপনার শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[৩২৫]

আল্লাহর পরিচয় যারা লাভ করেছেন, তারা তাঁর মহত্ত্বের কথা জেনে বিনম্র হয়। পাপীরা তাঁর ক্ষমার ঘোষণা শুনে হয় আশাবাদী। পাপীরা যদি তাঁর ক্ষমার ব্যাপারে আশাবাদী না হতো, তাহলে নিরাশার আগুনে তাদের অন্তর জ্বলে যেত। কিন্তু অন্তরগুলি আল্লাহর ক্ষমার কথা শুনে শীতল হয়েছে।

লাইলাতুল কদরে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ

লাইলাতুল কদরে এবং রমাদানের শেষ দশকে ইবাদাতে নিমগ্ন হওয়ার পরও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় যারা লাভ করেছেন, তারা নিজেদের নেক আমল এবং কথাবার্তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করেন না। বরং তারা আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে অপরাধ স্বীকার করেন। গুনাহগারের মতো ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন।

ষষ্ঠ পর্ব : বিদায় মাহে রমাদান

সহীহ বুখারি এবং মুসলিমে আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

'যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদাত করে, তার পেছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমান-সহ এবং সাওয়াবের আশায় রমাদানে সিয়াম পালন করবে, তার অতীতের সব পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'[৩২৬]

---

[৩২৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৪৮৬

[৩২৬] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৯০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৪৮৬

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে অন্য বর্ণনায় এটাও আছে,

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

'যে ব্যক্তি ঈমান-সহ এবং সাওয়াবের আশায় রমাদানে রাত জেগে ইবাদাত করবে, তার অতীতের সব গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।'[৩২৭]

বর্ণিত আছে, ঈদুল ফিতরের দিন রোজাদারদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়। ফিতরের দিনের অপর নাম পুরস্কারের দিন। এ সংক্রান্ত কিছু দুর্বল হাদীস আছে।

সিয়াম পালনকারীদের রমাদানের সিয়াম এবং কিয়াম পূর্ণ করা মানে নিজের ওপর অর্পিত কাজ সমাপ্ত করা। এরপর তাদের পারিশ্রমিক তথা ক্ষমা অবশিষ্ট থেকে যায়। তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয় ঈদুল ফিতরের দিন সালাত আদায়ের জন্য বেরোবার সময়। এরপর তারা পূর্ণ পারিশ্রমিক বুঝে নিয়ে ঘরে ফিরে। নিজের দায়িত্ব যে পূর্ণরূপে সমাধা করে, তার মজুরিও হয় পরিপূর্ণ। আর নিজের কর্তব্য যে পূর্ণরূপে আদায় করে, তার পাওনা নগদ পরিশোধ করে দেওয়া হয়।

সালমান বলেছেন, সালাত হলো নিক্তি-স্বরূপ। যে তা পরিপূর্ণরূপে আদায় করবে, তাকে পরিপূর্ণরূপে বদলা দেওয়া হবে। আর কেউ কমতি করলে শাস্তি কী হবে, সেটা তো তোমাদের জানাই আছে।

সিয়াম-সহ অন্য সব আমল এই পদ্ধতিতে হিসাব হবে। পরিপূর্ণ করলে আল্লাহর উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর কম করলে ওজনে কমতিকারীদের জন্যে বরবাদি তো রয়েছেই।

সালাত-সিয়ামের ক্ষেত্রে কমতি করলে কি লজ্জা হয় না? খবরদার! মানুষের জন্য বরবাদি! নবি ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ أَسْوَأَ النَّاسِ سَرِقَةً، الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ»

'মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট চোর তো সে, যে সালাত চুরি করে।'[৩২৮]

দুনিয়ার ওজনে কম দিলেই যদি বরবাদির সাজা হয়, তাহলে দ্বীনের ওজনে কম দিলে অবস্থা কেমন হবে?

---

[৩২৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৭৫৯; সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ২০০৮

[৩২৮] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ১১৫৩২,

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

'সুতরাং বড় দুর্ভোগ আছে সেই মুসল্লিদের জন্য, যারা তাদের সালাতে গাফিলতি করে।[৩২৯]

সালাফরা আমল করার ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতেন, যেন তা যথাসম্ভব নিখুঁত হয়। তারপর সেটা কবুল হওয়ার প্রতি তারা গুরুত্বারোপ করতেন এবং কবুল না হওয়ার আশঙ্কায় থাকতেন। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন,

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا۟ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ

'তারা যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে।'[৩৩০]

আলি ﷺ বলতেন, 'তোমরা আমল করার পর তা কবুল হওয়ার প্রতিও অত্যন্ত যত্নবান হও। তোমরা কি শোনোনি আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۝

"আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকিদের থেকেই গ্রহণ করে থাকেন।"'[৩৩১]

মালিক ইবনু দিনার ﷺ বলেছেন, 'আমল কবুল না হওয়ার আশঙ্কা করা আমল করা থেকেও কঠিন।'

মাগফিরাত লাভের মাধ্যম

রমাদান মাসে মাগফিরাত লাভের অনেক মাধ্যম আছে। যেমন,

রমাদানের সিয়াম পালন, তারাবীর সালাত আদায় এবং বিশেষত লাইলাতুল কদরে সালাত আদায় করা। এ সম্পর্কিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

- সিয়াম পালনকারীদের ইফতার করানো এবং অধীনস্থদের কাজ কমিয়ে দেওয়া।
- যিকর করা।

---

[৩২৯] সূরা মা-ঊন, ১০৭ : ৪-৫

[৩৩০] সূরা মু'মিনূন, ২৩ : ৬০

[৩৩১] সূরা মায়িদা, ৫ : ২৭

- ইসতিগফার করা। ইসতিগফার মানে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর সিয়াম পালনরত অবস্থায় এবং ইফতারের সময় সিয়াম পালনকারীর দুআ কবুল হয়ে থাকে। এজন্যই ইবনু উমার ﵄ ইফতারের সময় দুআ করতেন, 'ওগো আল্লাহ! ওগো ব্যাপক ক্ষমার অধিকারী! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।'

রমাদান মাসে মাগফিরাত লাভের অনেক মাধ্যম থাকা সত্ত্বেও ভাগ্যে যার মাগফিরাত জুটে না, সে সত্যিই কপালপোড়া।

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ একবার মিম্বারে ওঠার সময় তিনবার আমিন বললেন। সাহাবিরা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তো মিম্বারে ওঠার সময় তিনবার আমিন বলেছেন!' নবি ﷺ বললেন,

«إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَقَالَ: مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبَرَّهُمَا، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ»

'জিবরীল আমার কাছে এসে বললেন, যে রমাদান পেল অথচ তার গুনাহ মাফ হলো না, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিন। আমি বললাম, আমিন। (জিবরীল বললেন,) যে ব্যক্তি তার বাবা-মাকে অথবা তাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল অথচ তাদের সেবাযত্ন করল না, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিন। আমি বললাম, আমিন। (এবার জিবরীল বললেন,) যার কাছে আপনার নাম উল্লেখ করা হলো অথচ সে আপনার ওপর দরুদ পড়ল না, এরপর মৃত্যুবরণ করে জাহান্নামে গেল, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিন। আমি বললাম, আমিন।'[৩৩২]

ইয়াওমুল ফিতর মুসলিম উম্মাহর ঈদের দিন। কারণ, রোজাদারদের মধ্যে যারা কবিরা গুনাহ করেছে, সেদিন তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। গুনাহগাররা তখন নেককারদের সাথে যুক্ত হয়।

তদ্রূপ ইয়াওমুন নাহর হলো মহান ঈদের দিন। কারণ, এর আগের দিনটি হলো আরাফার দিন, যে দিনটিতে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। সুতরাং এই দিন দুটিতে জাহান্নাম থেকে যে মুক্তি পাবে,

[৩৩২] সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদীস নং : ৯০৭

সত্যিকারের ঈদ তো তারই জন্য। পক্ষান্তরে দিন দুটিতে যে মুক্তি না পায়, তার জন্য এটা ধমকির দিন।

ক্ষমা ও মুক্তি রমাদানের সিয়াম ও কিয়াম আদায়ের সাথে সম্পৃক্ত। তাই নির্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ করে নেওয়ার সময় তাকবীর বলা এবং শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

'এবং (তিনি চান,) যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ করো এবং তোমাদেরকে তিনি যে হিদায়াত দিয়েছেন, এ জন্য আল্লাহর তাকবীর পাঠ করো এবং যাতে তোমরা শোকর করো।'[৩৩৩]

যিনি বান্দাদেরকে সিয়াম পালনের তাওফীক দিয়েছেন এবং এর বদলায় তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মর্ম হলো—তাঁর যিকর করা, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা এবং তাঁকে সত্যিকার অর্থে ভয় করা। ইবনু মাসউদ ﷺ বলেছেন, সত্যিকারের ভয় মানে তাঁর আনুগত্য করা, নাফরমানি না করা। তাঁকে স্মরণে রাখা, ভুলে না যাওয়া। এবং কৃতজ্ঞ থাকা, অকৃতজ্ঞ না হওয়া।

সুতরাং কবিরা গোনাহকারীদের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলি মস্ত বড় সুযোগ। অমূল্য এই দিনগুলির কোনো বিকল্প নেই। অনেক অপরাধীকে এই দিনগুলিতে জাহান্নাম হতে মুক্তি দেওয়া হয়। জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া মানেই মহা পুরস্কার এবং বিশাল অনুদান লাভ করা।

যে ব্যক্তিকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন, মুক্ত হওয়ার পরে সে যেন আবার গুনাহের দাসত্বে জড়িয়ে না যায়। মনিব জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার পরে আবারও কি সেটার কাছে যাওয়া ঠিক হবে? পরম অভিভাবক যেখান থেকে রক্ষা করেছেন, সেটাতে আবার পড়তে চাওয়া কি ভুল নয়? সুতরাং তা থেকে পাশ কাটিয়ে চলা উচিত।

আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের জন্য, তবুও অন্যায়কারীরা তা থেকে নিরাশ হয় না। মাগফিরাত যদিও পরহেজগারদের জন্য, তারপরও নিজের প্রতি যুলুমকারীরা বঞ্চিত হয় না।

---

[৩৩৩] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৫

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

'বলুন : হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর সীমালঙ্ঘন করেছ! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। তিনি পরম ক্ষমাশীল, চির দয়ালু।'[৩৩৪]

হে গুনাহগার বান্দা! নিজের বদ আমলের কারণে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যেয়ো না। এই দিনগুলিতে তোমার মতো কতজনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে! সুতরাং নিজের রবের প্রতি সুধারণা রেখে তাঁর কাছে তাওবা করে নাও। আল্লাহর কাছে কেবল সে-ই পাকড়াও হয়, যে নিজে ধ্বংসের পথ বেছে নিয়েছে।

জাহান্নাম থেকে মুক্তির প্রত্যাশীদের উচিত রমাদানে মুক্তির মাধ্যম গ্রহণ করা। এটা করা খুবই সহজ। আবূ কিলাবাহ ﵀ রমাদানের শেষ দিন একটি সুন্দরী দাসীকে সাজিয়ে মুক্ত করে দিতেন। তিনি আশা করতেন, এর বিনিময়ে হয়তো জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবেন।

সহীহ ইবনু খুযাইমাতে সালমান ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ»

'এ মাসে যে ব্যক্তি কোনো সিয়াম পালনকারীকে ইফতার করাবে, সেটা তার জন্য গুনাহ মাফ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় হবে। আর সে রোজাদারের অনুরূপ সাওয়াব পাবে। তবে রোজাদারের প্রতিদানে কোনো কমতি করা হবে না।'[৩৩৫]

হাদীসটিতে আরও আছে,

«وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وَخَصْلَتَيْنِ لَا

---

[৩৩৪] সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৩

[৩৩৫] সহীহ ইবনু খুযাইমাহ, হাদীস নং : ১৮৮৭, যয়ীফ

غِنًى بِكُمْ عَنْهُمَا، فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ: فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنًى بِكُمْ عَنْهُمَا: فَتُسْأَلُونَ اللهَ الْجَنَّةَ، وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ»

'এ মাসে তোমরা চারটি কাজ বেশি বেশি করবে। দুটি কাজ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; আর বাকি দুটি এমন যে, তা করতেই হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কাজ দুটি হলো—(১) আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এই সাক্ষ্য দেওয়া। (২) তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর যে কাজ দুটি তোমাদের করতেই হবে তা হলো—আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করা এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাওয়া।'[৩৩৬]

চারটি কাজ বেশি বেশি করা

এই হাদীসে চারটি কাজের কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি কাজই মাগফিরাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম।

প্রথম কাজ : কালিমায়ে তাওহীদ পড়া। এর মাধ্যমে সমস্ত গুনাহ এমনভাবে মিটে যায় যে, এর পরে আর কোনো গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না। কোনো আমল এর সমতুল্য হতে পারে না। এই কালিমা জাহান্নাম থেকে মুক্তিকে আবশ্যক করে দেয়। এ কালিমা যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় চারবার করে পড়বে, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম মুক্তি দেবেন। আর যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে এটা পড়বে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।

দ্বিতীয় কাজ : ইসতিগফার করা। এটা গুনাহ মাফের সর্বোচ্চ মাধ্যম। কারণ, ইসতিগফার হলো মাগফিরাতের জন্য দুআ করা। আর রোজাদার অবস্থায় এবং ইফতারের সময় সিয়াম পালনকারীর দুআ কবুল হয়ে থাকে। আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'রমাদান মাসে অস্বীকারকারী ছাড়া সবাইকে মাফ করে দেওয়া হয়।' লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'হে আবূ হুরায়রা! অস্বীকারকারী কে?' আবূ হুরায়রা ﵁ বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করে।'

হাসান ﵀ বলেছেন, 'তোমরা বেশি বেশি ইসতিগফার করো। কারণ, রহমত কখন নাযিল হয়, সেটা তো তোমাদের অজানা।'

---

[৩৩৬] প্রাগুক্ত

লুকমান ﷺ তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, 'ছেলে আমার! মুখে সব সময় ইসতিগফার চালু রাখায় অভ্যস্ত হও। কারণ, কিছু সময় এমন আছে যখন আল্লাহ তাআলা কোনো প্রার্থীকে ফিরিয়ে দেন না।'

তাওহীদ এবং ইসতিগফারকে আল্লাহ তাআলা একই আয়াতে উল্লেখ করে বলছেন,

فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ

'সুতরাং জেনে রাখুন, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য।'[৩৩৭]

ইবলীস বলেছিল, 'মানুষকে আমি গুনাহের মাধ্যমে ধ্বংস করি। আর মানুষ আমাকে ধ্বংস করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর মাধ্যমে।'

ইসতিগফার হলো সব নেক কাজের পরিশিষ্ট। এর মাধ্যমে সালাত, হাজ্জ এবং কিয়ামুল লাইল সমাপ্ত করা হয়। এর মাধ্যমে বৈঠক শেষ হয়ে থাকে। যিকরের মজলিস শেষ হলে ইসতিগফার করা চাই। এটা সিলমোহরের কাজ করে। আর অনর্থক কথাবার্তার মজলিস হলে, ইসতিগফার কাফফারা হয়ে যায়। তদ্রূপ রমাদানের সিয়ামও ইসতিগফারের মাধ্যমে সমাপ্ত করা উচিত।

উমার ইবনু আবদিল আযীয ﷺ বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানো ফরমানে বলেছিলেন, রমাদান মাস যেন ইসতিগফার এবং সাদাকাতুল ফিতরের মাধ্যমে সমাপ্ত করা হয়। কারণ, সাদাকাতুল ফিতর হলো রোজাদারের ভুল-ত্রুটি এবং অনর্থক কাজ-কর্মের পবিত্রতা-স্বরূপ। আর ইসতিগফার হলো সিয়ামের মধ্যকার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অনর্থক কথা-কাজের ক্ষতিপূরণ। এজন্যই পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম বলেছেন, সিয়াম পালনকারীর জন্য সাদাকাতুল ফিতর হলো সালাতের সাহু সিজদাহ এর মতো।

সিয়াম জাহান্নাম থেকে রক্ষার ঢাল, যতক্ষণ না সেটাকে ছিঁড়ে ফেলা হয়। মন্দ কথা এ ঢালকে ছিঁড়ে ফেলে। আর ইসতিগফার সেই ছেঁড়া ঢালে জোড়াতালির মতো কাজ করে।

তাহলে আমাদের এই সিয়ামের জন্য কতটা ইস্তিগফার এবং সুপারিশকারী নেক আমল প্রয়োজন! আমরা তো কথাবার্তার মাধ্যমে আমাদের সিয়ামকে ক্ষতিগ্রস্ত

[৩৩৭] সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৯

করি, তারপর আবার জোড়াতালি দিই। এখন তো জোড়াতালির তুলনায় ছেঁড়াখোঁড়া অনেক বেশি হয়ে গেছে। এভাবে গুনাহর মাধ্যমে ছেঁড়াছিঁড়ি করে নেককাজের মাধ্যমে জোড়াতালি দেওয়ার কাজ আর কতকাল চলবে!

সালাতের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য সালাফদের অনেকেই এমনভাবে ইসতিগফার করতে থাকতেন, যেমনটা গুনাহগার ব্যক্তি নিজের পাপের জন্য করে থাকে। নেককারদের অবস্থা যদি এমন হয়, তবে আমাদের মতো বদকারদের কী করা উচিত?

নবি ﷺ আয়িশা ﵂-কে লাইলাতুল কদরে ক্ষমা চাওয়া শিখিয়েছেন। বিষয়টিও এমনই। কারণ, মুমিন বান্দা রমাদানের সিয়াম এবং কিয়ামে পরিশ্রম করে থাকে। অবশেষে রমাদানের শেষ দিকে লাইলাতুল কদর এলে সে অপরাধীর মতো আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকে।

তৃতীয় ও চতুর্থ কাজ : জান্নাত প্রার্থনা করা এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়া। এই ধরনের দুআই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নবি ﷺ বলেছেন, 'আমি জান্নাত প্রার্থনা করি এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই।'[৩৩৮]

সুতরাং সিয়াম পালনকারী দুআ কবুলের ব্যাপারে আশাবাদী থাকবে। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে দুআ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

'যাকে জাহান্নাম থেকে সরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হলো, সে-ই সফলকাম।'[৩৩৯]

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾

'জাহান্নামের বাসিন্দা এবং জান্নাতের অধিবাসীরা সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী, তারাই সফলকাম।'[৩৪০]

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا۟ فَفِى ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ
وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا۟ فَفِى ٱلْجَنَّةِ

[৩৩৮] আবু দাউদ, আস সুনান, হাদীস নং : ৭৯২।
[৩৩৯] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৮৫
[৩৪০] সূরা হাশর, ৫৯ : ২০

خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۖ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾

'সুতরাং যারা দুর্ভাগা হবে, তারা জাহান্নামে যাবে। সেখানে তাদের চিৎকার ও আর্তনাদ শোনা যাবে। তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে, যে পর্যন্ত আসমান ও যমিন স্থায়ী থাকে। তবে যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই তোমার রব যা কিছু চান, তা তিনি পূর্ণরূপে সমাধা করতে সক্ষম। আর যারা সৌভাগ্যবান হবে, তারা থাকবে জান্নাতে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, যে পর্যন্ত আসমান ও যমিন স্থায়ী থাকে। কিন্তু যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে ভিন্ন কথা। এটা হবে এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।'[৩৪১]

হে আল্লাহর বান্দারা! রমাদান মাস তো চলেই যাচ্ছে। অবশিষ্ট আছে আর মাত্র কয়েকটা দিন। যারা রমাদানের হক আদায় করছেন, তারা অবশিষ্ট দিনগুলোও ভালোভাবে পালন করুন। আর যারা এতদিন সাওম রাখেননি, তারা ভালোয় ভালোয় রমাদান শেষ করুন। ব্যক্তির আমল ধর্তব্য হয় শেষ পরিণতি হিসেবে। সুতরাং অবশিষ্ট রাত-দিনগুলোতে আমল করতে সচেষ্ট হোন। তাহলে মহান রাজাধিরাজের সামনে তাদেরকে আপনার পক্ষে সাক্ষী হিসেবে পাবেন! শেষ সময়ে রমাদানকে বিদায় দিন সর্বোত্তম পদ্ধতিতে।

হে রমাদান মাস! একটু ধীরে বয়ে যাও। তোমার বিদায়ে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অশ্রু ঝরছে। তোমার বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় তাদের অন্তর ফেটে যাচ্ছে। আশা করা যায়, বিদায়ের সময় একটু বিরতি দিলে আগ্রহের জ্বলন্ত আগুন স্তিমিত হয়ে যাবে। তাওবা এবং গুনাহ বর্জনের একটু সুযোগ দিলে, সিয়ামের ক্ষতিপূরণ হয়ে যেতে পারে। নেক লোকদের কাফেলা থেকে যারা পিছিয়ে পড়েছে, তারা কাফেলায় যোগ দিতে পারবে। যার ওপর জাহান্নাম আবশ্যক হয়ে গেছে, সে হয়তো সেখান থেকে মুক্তি পাবে। ছাড়া পাওয়ার সুযোগ মিলবে গুনাহের বেড়াজালে বন্দিদের। অবাধ্য দাসদের কপালে জুটতে পারে মনিবের রহমত।

---

[৩৪১] সূরা হূদ, ১১ : ১০৬ - ১০৮

শাওয়াল মাসের পালনীয়

প্রথম পর্ব : শাওয়াল মাসের সিয়াম

আবূ আইয়ূব আনসারি ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»

'যে ব্যক্তি রমাদান মাসে সিয়াম পালন করল, তারপর শাওয়াল মাসের ছয়টি দিন তার অনুগামী করল (অর্থাৎ ৬টি সিয়াম পালন করল), সে যেন সারা বছর সিয়াম পালন করল।'[৩৪২]

ছয়টি সিয়াম পালনের পদ্ধতি

শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম মুসতাহাব। যারা এই মতের পক্ষে, তারা সিয়াম পালনের পদ্ধতি সম্পর্কে তিনটি বক্তব্য দিয়েছেন।

১. মাসের শুরু থেকেই ধারাবাহিকভাবে ছয়টি সিয়াম পালন করা। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﵀ এবং শাফিয়ি ﵀ এ মতের প্রবক্তা।

২. এই সিয়াম পালন করা যাবে পুরো মাসের যে-কোনো সময়। এক সাথেও করা যাবে আবার আলাদাভাবেও করা যাবে। ইমাম ওয়াকি ﵀ এবং ইমাম আহমাদ ﵀ এ মত পোষণ করেছেন।

৩. ইয়াওমুল ফিতরের পরপরই সিয়াম পালন করা যাবে না। কারণ সেগুলো পানাহারের দিন। বরং আইয়ামে বীয-এর সাথে মিলিয়ে, তার আগের তিনদিন অথবা পরের তিনদিন সিয়াম পালন করবে। এটা মা'মার ﵀ এবং

[৩৪২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৬৪

আবদুর রাযযাক ﷺ-এর মত। আতা ﷺ থেকেও এমনটা বর্ণিত হয়েছে।

রমাদানের সিয়াম এবং তার পরে শাওয়াল মাসে ছয়টি সিয়াম পালন সারা বছর সিয়াম পালনের সমতুল্য হওয়ার কারণ হলো, প্রতিটি নেককাজের সাওয়াব দশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সাওবান ﷺ বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ فَذَلِكَ تَمَامُ صِيَامِ السَّنَةِ»

'রমাদানের সিয়াম দশ মাস সিয়ামের সমতুল্য। আর (শাওয়ালের) ছয়দিনের সিয়াম দুই মাস সিয়ামের সমান। সর্বসাকুল্যে হয় গোটা বছরের সিয়াম।'

ইমাম আহমাদ, নাসায়ি এবং ইবনু হিব্বান ﷺ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম আর রাযি ﷺ বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। ইমাম আহমাদ ﷺ বলেছেন, এ সংক্রান্ত হাদীসগুলির মধ্যে এ হাদীসটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

এই সিয়াম পালনের কিছু উপকারীতা

রমাদানের পর শাওয়াল মাসে ছয়দিন সিয়াম পালনের মাধ্যমে পূর্ণ বছর সিয়াম পালনের সাওয়াব হয়। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

শাওয়াল এবং শাবান মাসের সিয়াম হলো ফরয সালাতের আগে-পরে সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার মতো। এর মাধ্যমে ফরযে হয়ে যাওয়া ত্রুটি-বিচ্যুতি পূরণ করা হবে। কিয়ামাতের দিন ফরয আমলের ঘাটতি পূরণ করা হবে নফল আমল দ্বারা। বিভিন্ন হাদীস এটা বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ মানুষেরই ফরয সিয়ামের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে। যার ক্ষতিপূরণের জন্য আমলের প্রয়োজন।

রমাদানে সিয়াম পালনের পর পুনরায় সিয়াম পালন করতে পারাটা রমাদানের সিয়াম কবুল হওয়ার নিদর্শন। আল্লাহর তাআলার নীতি হলো, বান্দার কোনো আমল কবুল করলে তাকে আরেকটি আমল করার তাওফীক দেন। কারও মতে, নেককাজের সাওয়াব হলো এর পরে আরেকটি নেককাজ করতে পারা। অতএব, নেককাজের পরে মন্দ কাজ করা নেককাজটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার লক্ষণ।

রমাদানের সিয়াম পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়, এটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর ইয়াওমুল ফিতরে রোজাদারদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়ে থাকে। ওই দিনটি

পুরস্কারের। পুরস্কার পাওয়ার পর পুনরায় সিয়াম পালন করা হলো এই নিয়ামাতের শুকরিয়া আদায়। কেননা, গুনাহের মাফ হলো সর্বোচ্চ নিয়ামাত।

নবি ﷺ এত বেশি সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পা দুটি ফুলে যেত। তাঁকে বলা হলো, আল্লাহ তো আপনার সমস্ত ত্রুটি মার্জনা করে দিয়েছেন (তবুও আপনি এত ইবাদাত করেন কেন)! তিনি বললেন,

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

'আমি শোকগুজার বান্দা হব না?'[৩৪৩]

রমাদানের সিয়াম এক মহা নিয়ামাত। যিকর-সহ অন্যান্য পদ্ধতিতে বান্দাকে এর কৃতজ্ঞতা আদায়ের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা।[৩৪৪] সুতরাং রমাদানে সিয়াম পালনের তাওফীক দেওয়া, এ ব্যাপারে বান্দাকে সাহায্য করা এবং গুনাহ মাফ করার সামগ্রিক শোকর হলো রমাদানের পর সিয়াম পালন করা।

অনেক সালাফ রাতে কিয়াম করার সুযোগ পেলে, এর শুকরিয়া হিসেবে দিনের বেলা সিয়াম পালন করতেন।

উহাইব ইবনুল ওয়ারদ ﷫-কে তাওয়াফ বা অন্য কোনো ইবাদাতের সাওয়াব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, 'সাওয়াব সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করে, আমলের তাওফীক পাওয়ার কারণে কীভাবে শোকর আদায় করা উচিত, সেটা জিজ্ঞেস করো।'

দ্বীনের হোক বা দুনিয়ার, যে-কোনো নিয়ামাত পেলেই তার জন্য শোকর আদায় করা উচিত। এরপর সেই শোকর আদায়ের তাওফীক পাওয়ার কারণে আবারও শোকর করা, দ্বিতীয় শোকরের তাওফীক পাওয়ায় তৃতীয় বার শোকর...এভাবেই ধারা চলতে থাকবে।

মোটকথা শোকরের স্বরূপ হলো শোকর আদায়ের অক্ষমতার স্বীকারোক্তি দেওয়া। পক্ষান্তরে রমাদানে সিয়ামের তাওফীক পাওয়ার পর গুনাহে জড়িয়ে পড়া মানে, আল্লাহর নিয়ামাতের কদর না-করা। সুতরাং কেউ সিয়ামরত অবস্থায় সিয়ামের পর গুনাহ করতে মনস্থ করলে, তার সিয়াম হবে প্রত্যাখ্যাত। রহমতের দুয়ার তার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হবে।

---

[৩৪৩] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৬৪৭১

[৩৪৪] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৫

কা'ব ﵁ বলছেন, 'রমাদানে সিয়ামরত অবস্থায় কেউ যদি রমাদানের পর গুনাহ না করার মনস্থ করে, (এমতাবস্থায় মৃত্যু হলে) সে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে রমাদানে সিয়ামরত অবস্থায় রমাদানের পরে গুনাহের পরিকল্পনা করলে, তার সিয়াম হবে প্রত্যাখ্যাত।'

মৃত্যু পর্যন্ত মুমিনের আমল করার সুযোগ থাকে। হাসান ﵀ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা মৃত্যু ছাড়া অন্যকিছুকে আমল করার শেষসীমা নির্ধারণ করেননি।' এরপর হাসান ﵀ তিলাওয়াত করলেন,

وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

'আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত করতে থাকো।'[৩৪৫]

রমাদানে সিয়াম এবং ইবাদাত করলে পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তেমনি হাজ্জে গিয়ে কোনো রকম অশ্লীলতা এবং পাপাচারে না জড়ালে, সদ্য ভূমিষ্ঠ নবজাতকের মতো হয়ে (হাজিরা) ফিরে আসে। এভাবে মুমিনের জীবনের প্রতিটি সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবাদাতের দায়িত্ব দেওয়া থাকে। ফলে মুমিন এসব দায়িত্ব পালন করতে থাকে এবং ভয় ও আশা নিয়ে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করে চলে। আল্লাহকে যারা সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে, তারা তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য নফল আমল করতে ক্লান্তি বোধ করে না। তাদের লক্ষ্য থাকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি।

কোনো নেক আমল কবুলের লক্ষণ হলো তা সমাপ্তির পরে অন্য কোনো নেক আমলে জড়িয়ে পড়া। বিপরীতে কোনো নেক আমল কবুল না হওয়ার লক্ষণ হলো সে আমলের পরে কোনো গুনাহে লিপ্ত হওয়া। বদ আমলের পর সেটা মোচনকারী নেক আমল অতি উত্তম। আর ধারাবাহিকভাবে নেক আমল করে যাওয়া হলো সর্বোত্তম। নেক আমলের পর বদ আমল করা অতি নিকৃষ্ট কাজ। সুস্থ হওয়ার পর পুনরায় রোগের সংক্রমণ খুব জটিল বিষয়। এতে মৃত্যুর আশঙ্কাও থাকে। এজন্য মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদাত করার তাওফীক চেয়ে দুআ করা উচিত। অন্তর পরিবর্তন হওয়া এবং (আমল) বৃদ্ধির পর হ্রাস পাওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া দরকার। আনুগত্যের সম্মান প্রাপ্তির পরে অবাধ্যতার লাঞ্ছনা কতই-না নিকৃষ্ট! তৃপ্তি নামক সচ্ছলতার পর, লোভের দারিদ্র কতই-না ঘৃণ্য!

---

[৩৪৫] সূরা হিজর, ১৫ : ৯৯

তাওবাকারীর উচিত হবে না প্রবৃত্তির সঙ্গ ত্যাগ করার পর পুনরায় তাতে লিপ্ত হওয়া। কারণ প্রবৃত্তির অনুসরণ তো কেউ বুঝেশুনে করে না। হ্যাঁ, কাজটি কষ্টকর বটে। তবে কষ্ট করলে তার বিনিময়ে অন্তরে ঈমানের মিষ্টতার স্বাদ অনুভূত হবে। আল্লাহর জন্য কোনো কিছু পরিহার করলে ত্যাগের কষ্ট অনুভূত হয় না। বরং এর তুলনায় উত্তম বদলা পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِى قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

'আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে ভালো কিছু দেখেন, তাহলে তোমাদের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়েছে, তারচেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন। আর তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।'[৩৪৬]

দ্বিতীয় পর্ব : হাজ্জের আলোচনা

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন আমলটি উত্তম? তিনি বললেন,

«إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ»

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা।'

প্রশ্ন করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন,

«الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»

'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।'

প্রশ্ন করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন,

«حَجٌّ مَبْرُورٌ»

'মাকবূল হাজ্জ।'[৩৪৭]

---

[৩৪৬] সূরা আনফাল, ৮ : ৭০

[৩৪৭] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ২৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৮৩

এখানে তিনটি আমলের কথা বলা হলেও বাস্তবে আমল দুটি :

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং

২. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা

অর্থাৎ আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, নবি-রাসূল এবং শেষ-দিবসকে দৃঢ়ভাবে সত্যায়ন করা। জিবরীল ﷺ-এর প্রশ্নের উত্তরে নবি ﷺ ঈমানের এই ব্যাখ্যাই করেছেন। এছাড়াও অনেক হাদীসে বিষয়টা এসেছে। আবার আল্লাহ তাআলাও এই মূলনীতিগুলোর কথা কুরআনের একাধিক স্থানে আলোচনা করেছেন।

২. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা

এ নীতি দুটির কথা আল্লাহ একাধিক স্থানে একসাথে আলোচনা করেছেন। যেমন,

تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ

'হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেবো, যা তোমাদের যন্ত্রণাময় শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং নিজেদের ধনসম্পদ এবং জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।'[৩৪৮]

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

'মুমিন তো তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর কোনো রকম সন্দেহ পোষণ করে না এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।'[৩৪৯]

[৩৪৮] সূরা সফ, ৬১ : ১০-১১

[৩৪৯] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৫

জিহাদের প্রকার

মোটকথা, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা হচ্ছে অন্তর এবং মুখের দায়িত্ব। এরপর তাঁদের অনুগামী হওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ। এই কাজের মধ্যে সর্বোত্তম হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। জিহাদ দুই প্রকার।

প্রথম প্রকার : সর্বোত্তম জিহাদ হলো, দুশমন কাফিরের বিপক্ষে মুমিনের জিহাদ ও আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা। কারণ, ঈমানের ছায়াতলে প্রবেশ করার জন্য কাফিরের প্রতি আহ্বানও এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ

'তোমরা হলে সেই সর্বোত্তম উম্মাত, মানুষের কল্যাণে যাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।'[৩৫০]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবূ হুরায়রা ﵁ বলেছেন, 'তাদের শৃঙ্খলিত করে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।' আর তিনি নবি ﷺ থেকে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন,

«عَجِبَ اللهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ»

'আল্লাহ সেসব লোকের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, যারা শৃঙ্খলে আবদ্ধ অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৩৫১]

কাজেই জিহাদ হলো দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দেওয়া, এরপর মুখ এবং তরবারির মাধ্যমে আহ্বান করার নাম।

জিহাদের মাধ্যমে ঈমানের কালিমা সমুন্নত হয়, ইসলামের ভূখণ্ড হয় বর্ধিত এবং মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এটাই নবি-রাসূল এবং তাঁদের অনুসারীগণের কর্তব্য। এর মাধ্যমে আল্লাহর কালিমা সমুন্নত থাকে। এর উদ্দেশ্য হলো, দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া এবং তাঁর আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করা।

---

[৩৫০] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১১০

[৩৫১] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৩০১০

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ

‘তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতক্ষণ-না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।’[৩৫২]

মুজাহিদ তো সে, যে কিনা একমাত্র আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে।

দ্বিতীয় প্রকার : আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য নফসের মোকাবিলা করা। যেমনটা নবি ﷺ বলেছেন,

«المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ»

‘(প্রকৃত) মুজাহিদ তো সে, যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।’[৩৫৩]

এক সাহাবিকে কেউ যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বললেন, ‘প্রথমে নিজের নফসের সাথে যুদ্ধ করো।’

ইবাদাতের ক্ষেত্রে নফসের বিরুদ্ধে সর্বোত্তম জিহাদ হলো যিকর ও আমলের মাধ্যমে মাসজিদ আবাদ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمۡ يَخۡشَ إِلَّا ٱللَّهَۖ

‘তারাই তো আল্লাহর মাসজিদ আবাদ করে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়িম করেছে সালাত এবং আদায় করেছে যাকাত; আর আল্লাহ ব্যতীত কাউকে তারা ভয় করে না।’[৩৫৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ ٣٦ رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ

---

[৩৫২] সূরা আনফাল, ৮ : ৩৯

[৩৫৩] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ২৩৯৫১; তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ১৬২১, হাসান সহীহ।

[৩৫৪] সূরা তাওবাহ, ৯ : ১৮

'যেসব ঘরকে মর্যাদায় উন্নীত করতে এবং সেগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে তিনি আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। এমন লোকেরা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে যাদেরকে বিরত রাখতে পারে না...'[৩৫৫]

হাজ্জ এবং মাসজিদ আবাদের ফযিলত

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের পর সর্বোত্তম আমল হলো আল্লাহর যিকর ও ইবাদাতের মাধ্যমে মাসজিদ আবাদ করা। সুতরাং সালাত, যিকর, তিলাওয়াত, ইতিকাফ, উপকারী বিষয় শিক্ষাদান এবং শ্রবণ করা মাসজিদ আবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর মধ্যে আবার সর্বোত্তম হলো অপেক্ষাকৃত উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ হলো মাসজিদ আবাদ করা। যেমন তাওয়াফ ও যিয়ারতের মাধ্যমে মাসজিদুল হারাম আবাদ করা। এজন্য কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই মাসজিদের নাম উল্লেখ করেছেন এবং হাজ্জের উদ্দেশ্যে এখানে গমন করা জিহাদের পরে সর্বোত্তম আমল নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

'(সে সময়ের কথা স্মরণ করো,) যখন কাবা ঘরকে আমি পরিণত করেছিলাম মানুষের বারবার ফিরে আসার জায়গা এবং পরিপূর্ণ নিরাপদ স্থানে। তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে নির্ধারণ করো। আমি ইবরাহীম আর ইসমাঈলকে আদেশ করেছিলাম, আমার ঘরকে আপনারা সেসব লোকদের জন্য পবিত্র করুন যারা (এখানে) তাওয়াফ করবে, ইতিকাফ পালন এবং রুকু ও সিজদাহ আদায় করবে।'[৩৫৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَـٰلَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ

[৩৫৫] সূরা নূর, ২৪ : ৩৬-৩৭

[৩৫৬] সূরা বাকারাহ, ২ : ১২৫

'নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা তো বাক্কায় (অবস্থিত), তা বরকময় এবং বিশ্বজগতের দিশারি। তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইবরাহীম। যে লোক সেখানে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ;'[৩৫৭]

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

'(সে সময়কে স্মরণ করুন,) যখন আমি ইবরাহীমকে সেই ঘরের স্থান জানিয়ে দিয়েছিলাম (এবং তাকে বলেছিলাম,) আমার সাথে কাউকে শরিক করবেন না এবং আমার ঘর সেসব লোকের জন্য পবিত্র রাখুন যারা (এখানে) তাওয়াফ করে, সালাতে দাঁড়ায় এবং রকু-সিজদাহ আদায় করে। এবং মানুষের মধ্যে হাজ্জের ঘোষণা দিন। তারা আপনার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রমকারী উটের পিঠে সওয়ার হয়ে (দীর্ঘ সফরের কারণে) যেগুলো রোগা হয়ে গেছে।'[৩৫৮]

সুতরাং মাসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য সব মাসজিদ আবাদ করা এবং ইবাদাতের জন্য সেখানে গমন করা 'রিবাত ফী সাবিলিল্লাহ'র অন্যতম। যেমন কষ্টকর পরিস্থিতিতে ওযু করা, বেশি বেশি কদম ফেলে মাসজিদে যাওয়া এবং এক সালাতের পর পরবর্তী সালাতের জন্য অপেক্ষা করা সম্পর্কে নবি ﷺ 'রিবাত' আখ্যা দিয়েছেন। আর বিশেষভাবে মাসজিদুল হারামে গমন করা এবং তাওয়াফের মাধ্যমে আবাদ করাকে আল্লাহ এক প্রকার জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সহীহ বুখারিতে আছে, নবি ﷺ-কে আয়িশা رضي الله عنها বলেছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদ তো শ্রেষ্ঠ আমল। তবে কি আমরা জিহাদে অংশগ্রহণ করব না?' উত্তরে নবি ﷺ বলেছেন,

«لَا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ»

'না, বরং (তোমাদের জন্য) সর্বোত্তম জিহাদ হলো হাজ্জে মাবরূর।'[৩৫৯]

---

[৩৫৭] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ৯৬-৯৭

[৩৫৮] সূরা হাজ্জ, ২২ : ২৬-২৭

[৩৫৯] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৫২০

হাজ্জ এবং উমরাতে আর্থিক, মানসিক এবং দৈহিক কষ্ট করতে হয় বলে এ দুটিকে জিহাদ বলা হয়েছে। আবুশ শা'সা বলেছেন, 'নেককাজ নিয়ে চিন্তা করে দেখলাম, সালাতে দৈহিক কষ্ট আছে; আর্থিক কষ্ট নেই। সিয়ামও এমনই। তবে হাজ্জে দুটোই আছে দেখে সেটাকেই আমার কাছে সর্বোত্তম মনে হচ্ছে।'

তাউস, আবুশ শা'সা এবং হাসান বসরি ﷀ-এর মতে, হাজ্জ উত্তম। ইবরাহীম নাখাঈ ﷀ বলেছেন, সাদাকাহ উত্তম। কারও কারও মতে, নফল হাজ্জে আগ্রহী ব্যক্তির অভাবী আত্মীয়স্বজন থাকলে অথবা দুর্ভিক্ষের সময় হলে, তখন সাদাকাহ করা উত্তম। অন্যথায় হাজ্জ। ইমাম আহমাদ ﷀ-এর বক্তব্য এটাই। হাসান ﷀ থেকেও এই মর্ম বর্ণিত হয়েছে। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং অভাবীকে সাহায্য করা নফল হাজ্জ পালন থেকে উত্তম।

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«الحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ»

'হাজ্জে মাবরূরের প্রতিদান কেবল জান্নাত।'[৩৬০]

মুসনাদু আহমাদ-এ আছে, নবি ﷺ-এর কাছে সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন,

«إِيمَانٌ بِاللهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا»

'এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, তারপর জিহাদ করা, তারপর হাজ্জে মাবরূর—পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে থাকা সমস্ত কাজের মধ্যে সর্বোত্তম।'[৩৬১]

এছাড়া নবি ﷺ এ-ও বলেছেন,

«مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হাজ্জ করল এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত থাকল, সে ওইদিনের মতো (নিষ্পাপ) হয়ে ফিরবে, যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।'[৩৬২]

---

[৩৬০] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৭৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৩৪৯

[৩৬১] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ১৯০১০, হাইসামি ﷀ হাদীসটির সনদ সহীহ বলেছেন।

[৩৬২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৫২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৩৫০

মোটকথা গুনাহ মাফ হওয়া এবং জান্নাতে প্রবেশ করা হাজ্জটি মাবরূর হওয়ার ওপর নির্ভর করে। আর হাজ্জে মাবরূরের দুটি নিদর্শন।

প্রথমত, হাজ্জের মধ্যে নেক কাজ সম্পাদন করা।

দ্বিতীয়ত, অশালীন ও গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা।

হাজ্জে মাবরূরের প্রথম নিদর্শন

হাজ্জের মধ্যে নেক কাজ সম্পাদন করা। মূলত দু ধরনের কাজ এর অন্তর্ভুক্ত।

এক. মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করা,

দুই. যাবতীয় সাওয়াবের কাজ।

এক. মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করা

মানুষের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা। এর বিপরীত হলো সম্পর্ক ছিন্ন করা। সহীহ মুসলিমে আছে, নবি ﷺ-কে নেক কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন,

«الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ»

'নেক কাজ হলো সচ্চরিত্র।'[৩৬৩]

ইবনু উমার ﵁ বলতেন, 'নেক কাজ তো সহজ জিনিস; সহাস্য চেহারা এবং নম্র কথা।'

হাজ্জের সময় এ জিনিসটি খুব প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ মানুষের সাথে ভালো কথা বলা এবং উত্তম আচরণ করা।

কারও কারও মতে, সফর মানুষের চরিত্র প্রকাশ করে দেয় বলে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

সাঈদ ইবনু জুবাইর ﵀-এর কাছে সর্বোত্তম হাজির পরিচয় জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, 'যিনি মানুষকে খাবার খাওয়ান এবং নিজের জিহ্বা সংযত রাখেন।'

সুফইয়ান সাওরি ﵀ বলেছেন, 'আমি শুনেছি যে, এটাই হাজ্জের নেক কাজ।'

এ গুণ তিনটি এমন যে, সব সফরেই তার প্রয়োজন পড়ে। বিশেষত হাজ্জের

---

[৩৬৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৫৫৩

সফরে। এই বৈশিষ্ট্য তিনটি যার মধ্যে পরিপূর্ণরূপে থাকবে তাঁর হাজ্জ হবে পরিপূর্ণ এবং মাকবূল। নবি ﷺ একবার আবূ জুরাই আল-হুজামি رضي الله عنه-কে একটি মৌলিক গুণ অর্জনের উপদেশ দিয়েছিলেন। একজন হাজ্জ পালনকারীর মাঝে সে গুণটি থাকা প্রয়োজন। নবি ﷺ বলেছিলেন,

«لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تُعْطِيَ صِلَةَ الْحَبْلِ، وَلَوْ أَنْ تُعْطِيَ شِسْعَ النَّعْلِ، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَلَوْ أَنْ تُنَحِّيَ الشَّيْءَ مِنْ طَرِيقِ النَّاسِ يُؤْذِيهِمْ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ، وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْطَلِقٌ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنْ تُؤْنِسَ الْوَحْشَانَ فِي الْأَرْضِ»

'কোনো সৎ কাজকে ছোট মনে কোরো না, যদিও সেটা রশির ছেঁড়া টুকরো দিয়ে হয়। হতে পারে জুতার ফিতার মতো সাধারণ জিনিস প্রদান করা, নিজের বালতি থেকে প্রার্থীর পাত্রে পানি ঢেলে দেওয়া। হতে পারে কষ্টদায়ক কোনো কিছু পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া, হাসিমুখে অপর ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করা। হতে পারে সাক্ষাতের সময় অপর ভাইকে সালাম দেওয়া, আবার কারও একাকিত্ব দূর করা।'

মোটকথা উত্তম মানুষ তিনিই, যিনি মানুষের উপকার করেন এবং মানুষের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করেন। মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন এভাবে,

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

'যারা সচ্ছল এবং অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহর জন্য অর্থ) ব্যয় করে, যারা নিজেদের ক্রোধ হজম করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে, আসলে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।'[৩৬৪]

হাজ্জ পালনকারীকে মানুষের সাথে মেলামেশা করতে হয়। যে মুমিন মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, সে এমন মুমিন থেকে উত্তম, যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে না এবং মানুষের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে না।

---

[৩৬৪] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৩৪

রবীয়া বলেছেন, সফরে মানবিকতা হলো পাথেয় ব্যয়, সাথিদের সাথে দ্বিমত কম করা এবং আল্লাহ নারাজ না-হন এমনভাবে হাসি-মজা করা।

সফরসঙ্গীদের সাথে ভালো আচরণ করা, নফল ইবাদাত থেকেও উত্তম। বিশেষ করে ইবাদাতকারী যদি সঙ্গীদের সেবার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে, (তবে তো কথাই নেই)। নবি ﷺ একবার ভীষণ গরমের মধ্যে সফর করেন। তাঁর সঙ্গীদের অনেকেই সিয়াম পালন করেছিলেন আবার অনেকে করেননি। পথিমধ্যে যাত্রাবিরতি দিলে, রোজাদাররা সেখানেই বসে পড়েন। আর যারা সিয়াম রাখেননি, তারা তাঁবু খাটান এবং পশুর জন্য দানাপানির ব্যবস্থা করেন। এ অবস্থা দেখে নবি ﷺ বললেন,

«ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ»

'যারা সিয়াম পালন করেনি তারাই আজ বেশি সাওয়াব হাসিল করে নিল।'[৩৬৫]

মুজাহিদ ﵀ বলেছেন, 'আমি খিদমাতের জন্য ইবনু উমার ﵄-এর সফরসঙ্গী হলাম। কিন্তু দেখা গেল, তিনিই আমার খিদমাত করতেন।'

আমির ইবনু কাইস এবং আমর ইবনু উতবা ﵀-এর মতো সালাফেরা সফরে সঙ্গী গ্রহণ করতেন এ শর্তে যে, সাওয়াব লাভের আশায় তারা সঙ্গীদের খিদমাত করবেন। সহযাত্রীদের খিদমাত তো তাঁরা করতেন-ই, আবার ব্যক্তিগত ইবাদাতও জারি রাখতেন। তদ্রূপ ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﵀ সাথিদের এই শর্ত দিতেন যে, সফরে তিনিই খিদমাত করবেন এবং আযান দেবেন।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﵀ সফরে থাকাকালীন সহযাত্রীদের ভালো ভালো খাবার খাওয়াতেন; কিন্তু নিজে থাকতেন সিয়ামরত। মারভ ﵀ হাজ্জে যেতে চাইলে ছাত্রদের একত্র করে জেনে নিতেন—কে কে হাজ্জে যেতে ইচ্ছুক। তাদের খরচপাতি নিজের জিম্মায় নিয়ে একটি সিন্দুকে তালাবদ্ধ করে রাখতেন। তারপর সফরে বেরিয়ে পড়তেন তাদেরকে নিয়ে। সফরে তাদের পেছনে দেধারছে খরচ করতেন। ভালো ভালো খাবার খাওয়াতেন। এমনকি তাদের পছন্দমতো হাদিয়া কিনে দিতেন মক্কা থেকে। অবশেষে দেশে ফিরে তাদের জন্য খানাপিনার আয়োজন করতেন। সে অনুষ্ঠানে তাদের হাতে তুলে দিতেন সিন্দুকে রাখা সেই টাকা।

---

[৩৬৫] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ২৮৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৭০০

দুই. যাবতীয় সাওয়াবের কাজ

এর বিপরীত শব্দ হলো গুনাহ। নেক কাজের ব্যাখ্যায় কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

‘বরং নেক কাজ হলো, যে ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি, শেষ দিনের, ফেরেশতাদের এবং নবিগণের প্রতি। আর আল্লাহর ভালোবাসায় নিজের সম্পদ ব্যয় করে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন, মুসাফির ও সওয়ালকারীদের এবং দাসমুক্তির জন্যে। যারা সালাত কায়িম করে, যাকাত দেয়, কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূরণে যত্নবান থাকে এবং সঙ্কটে, কষ্টে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ এবং তারাই মুত্তাকি।’[৩৬৬]

এ আয়াতে ছয় ধরনের নেক কাজ উল্লেখ করা হয়েছে। এই ছয় ধরনের কাজ করলে ব্যক্তিকে নেককার বলে ধরা হবে। কাজগুলো হলো,

১. ঈমানের পঞ্চ ভিত্তির ওপর ঈমান আনা।
২. আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন, মুসাফির, সওয়ালকারীকে দান করা এবং দাসমুক্ত করার কাজে প্রিয় সম্পদ ব্যয় করা।
৩. সালাত আদায় করা।
৪. যাকাত দেওয়া।
৫. প্রতিশ্রুতি পূরণে যত্নবান থাকা।
৬. সঙ্কটে, কষ্টে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করা।

হাজির মধ্যে প্রতিটি গুণই দরকার। কারণ, ঈমান না থাকলে তো হাজ্জই হবে না। হাজ্জ মাকবূল হওয়ার জন্য প্রয়োজন সালাত কায়িম এবং যাকাত প্রদান। কারণ, ইসলামের একটি ভিত্তির সাথে অপরটি সম্পৃক্ত। সবগুলো না থাকলে ইসলাম

[৩৬৬] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৭৭

ও ঈমান অপূর্ণাঙ্গ রয়ে যাবে। আর হাজ্জের সফরে সম্মিলিত কাজের প্রয়োজনে ওয়াদা রক্ষায় যত্নবান হওয়া এবং আল্লাহর পছন্দনীয় খাতে নিজের প্রিয় সম্পদ ব্যয় করা—হাজ্জ পূর্ণ হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। সেই সাথে সফরকালীন কষ্টেও ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। হাজ্জের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো,

সালাতের প্রতি যত্নবান থাকা : ফরয তো বটেই, নফল হাজ্জেও সালাতের প্রতি যত্নবান থাকা চাই। নয়তো এক টাকা লাভের আশায় হাজার টাকা পুঁজি খুইয়ে ফেলতে হবে। সালাফরা হাজ্জের সফরেও নফল সালাতের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। এটাই ছিল তাঁদের অভ্যাস। নবি ﷺ সব সফরেই বাহনের ওপর কিয়ামুল লাইল এবং বিতর আদায় করতেন। মাসরূক ﵀ হাজ্জের সফরে কেবল সিজদাহর হালতেই ঘুমাতেন। মুগীরা ইবনুল হাকাম সানআনি ﵀ ইয়ামান থেকে হাজ্জ করতেন পায়ে হেঁটে। প্রতি রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করা ছিল তাঁর অভ্যাস। এজন্য রাতে যাত্রা থামিয়ে তিনি সালাতে নির্ধারিত ওযীফা পাঠ করতেন। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় কাফেলার সাথে মিলিত হতেন। কখনও কখনও তো কাফেলার সাথে যুক্ত হতে পুরো দিন লেগে যেত। আল্লাহ তাআলা শান্তি এবং অনুগ্রহ বর্ষণ করুন এই পুণ্যবান ব্যক্তিদের প্রতি।

আল্লাহর যিকর করা : হাজ্জের সবচেয়ে বড় নেক কাজ। হাজ্জের আমলগুলো আদায় করার সময় আল্লাহ তাআলা বারবার যিকর করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষত ইহরাম পরিহিত অবস্থায় তালবিয়া এবং তাকবির বেশি বেশি পড়া। নবি ﷺ-এর কাছে উত্তম হাজ্জ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন,

«العَجُّ وَالثَّجُّ»

‘(যাতে) উচ্চস্বরে তালবিয়া ও তাকবীর পাঠ এবং কুরবানি (দেওয়া হয়)।’[৩৬৭]

কুরবানি : হাজ্জের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আমল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ

‘আর উটকে আমি করেছি আল্লাহর নিদর্শনগুলির অন্যতম, যাতে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে।’[৩৬৮]

---

[৩৬৭] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৮২৭, হাকিম ﵀ আলমুসতাদরাক এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৩৬৮] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩৬

ذَٰلِكَۖ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ۝٣٢

‘এটাই আল্লাহর বিধান। কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে সম্মান করলে, এটা তো তার অন্তরের তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ।’[৩৬৯]

বিদায় হাজ্জে নবি ﷺ এক শ’টি উট কুরবানি করেছিলেন। মদীনায় থাকাকালীন মিনাতে কুরবানির পশু পাঠিয়ে দিতেন, যা তাঁর পক্ষ থেকে সেখানে জবাই করা হতো।

হাজ্জে মাবরূরের দ্বিতীয় নিদর্শন

দ্বিতীয় যে আমলের মাধ্যমে হাজ্জের নেক কাজ পূর্ণ হয় তা হলো, অশালীন ও গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰۚ

‘সুতরাং হাজ্জের সময় কোনো অশালীন কাজ করবে না। না গুনাহ করবে, আর না ঝগড়াঝাঁটি করবে। আর তোমরা যা কিছু কল্যাণকর কাজ করো, আল্লাহ সেটা জানেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে করে নিয়ে নিয়ো। নিশ্চয় সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়।’[৩৭০]

নবি ﷺ এ-ও বলেছেন,

«مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

‘যে ব্যক্তি এই (কাবা) ঘরে (হাজ্জের উদ্দেশ্যে) এসে অশালীন আচরণ এবং গুনাহ না করে, তাহলে তার মা যেদিন তাকে জন্ম দিয়েছেন সেদিনের মতো (নিষ্পাপ) হয়ে সে ফিরে যায়।’[৩৭১]

হাজি যেসব পাথেয় সাথে নেয়, এর মধ্যে তাকওয়াই সবচেয়ে উত্তম। আর হাজ্জে গমনকারীকে বিদায় দেওয়ার সময় তাকওয়ার দুআ করাই সবচেয়ে ভালো। হাজ্জ পালনকারীর জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হলো হারাম থেকে বেঁচে থাকা।

---

[৩৬৯] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩২

[৩৭০] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৯৭

[৩৭১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৩৫০; সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৫২১

হাজ্জের জন্য যেন হারাম কামাই থেকে খরচ করা না হয়। পাশাপাশি হাজ্জের মাধ্যমে যশ, খ্যাতি, গর্ব এবং লৌকিকতা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। হাজ্জ করতে হবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কাজেই, হাজি সাহেব বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করবেন। আল্লাহর কাছে মিনতি করবেন এবং তাঁর ভয়ে ভীত থাকবেন।

সেই সত্তা কতই-না সুমহান, যিনি তাঁর সম্মানিত ঘরকে পুনর্মিলনের স্থান এবং পরিপূর্ণ নিরাপদ জায়গা বানিয়েছেন। মানুষ সেখান থেকে চলে গিয়ে আবার ফিরে আসে, তবুও শখ মিটে না। এ ঘরের সম্পর্ক আল্লাহ নিজের দিকে যুক্ত করেছেন। তাই আল্লাহপ্রেমীর হৃদয়ের সাথে এ ঘর যুক্ত হয়ে গেছে। এ ঘরের আলোচনা করলে তারা ব্যাকুল হয়ে পড়েন। আর দূরত্বের কথা শুনলে ছটফট করতে থাকেন।

হাজিদের রওনা হতে দেখে জনৈক বুজুর্গ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'হায় আমার অক্ষমতা! এরপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ঘরে যেতে না পারার দুঃখেই যদি এমন আফসোস হয়, তাহলে ঘরের মালিকের কাছে যেতে না-পারার দুঃখে কেমন করা উচিত?'

অবশ্য ওজরের কারণে পিছিয়ে পড়া লোকেরা অগ্রগামী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় নবি ﷺ বলেছিলেন,

«إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ»

'মদীনাতে কিছু লোক আমাদের পেছনে রয়ে গেছে। আমরা যে যে ঘাঁটি বা উপত্যকা পাড়ি দিয়েছি, তারাও এতে আমাদের সঙ্গেই আছে। আসলে ওজরই তাদের বাধা দিয়েছে।'[৩৭২]

তৃতীয় পর্ব : ওজরের কারণে বদলি হাজ্জ ও উমরাহ

আবূ হুরায়রা ﵁ বলেছেন, দরিদ্র লোকেরা নবি ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'বিত্তবান লোকেরা তো সম্পদের মাধ্যমে উঁচু মর্যাদা এবং স্থায়ী নিয়ামাত লাভ করছেন। তারা আমাদের মতো সালাত আদায় করছেন এবং সিয়াম পালন করছেন। আবার বাড়তি অর্থের মাধ্যমে হাজ্জ, উমরাহ, জিহাদ এবং সাদাকাহ করে থাকেন,

[৩৭২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ২৮৯৩

(যা আমরা পারি না)।' এ কথা শুনে নবি ﷺ বললেন,

«أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ»

'আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলব, যা করলে নেক কাজে যারা তোমাদের অগ্রগামী হয়ে গেছে তাদের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে এবং পরবর্তীরা তোমাদের স্তরে পৌঁছতে পারবে না? (এটা করলে) নিজেদের মধ্যে তোমরাই সেরা থাকবে, তবে এ ধরনের আমল যারা করবে তাদের কথা ভিন্ন। তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর ৩৩ বার করে সুবহানাল্লাহ, আলহামদু-লিল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার পড়বে।'[৩৭৩]

ইসলামে সম্পদের বিধান

আল্লাহর আনুগত্য এবং নৈকট্য অর্জনের কাজে সম্পদ ব্যয় করলে, সেটা আল্লাহর কাছে পৌঁছার মাধ্যম হয়। পক্ষান্তরে হারাম উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং নাফরমানির পথে খরচ করলে, সেটা হয়ে যায় আল্লাহ থেকে দূরে সরার মাধ্যম। আবূ সুলায়মান দারানি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'দুনিয়া আল্লাহ এবং তাঁর শত্রুদের মধ্যকার পর্দা। আর আল্লাহর বন্ধুদের জন্য তাঁর কাছে পৌঁছার মাধ্যম। সুমহান তিনি, যিনি একই জিনিসকে তাঁর নৈকট্যের এবং দূরত্বের মাধ্যম বানিয়েছেন।'

কুরআনে আল্লাহ উভয় শ্রেণির কথাই বলেছেন। প্রথম শ্রেণির প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা বলেন,

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

'যারা নিজেদের সম্পদ রাতে এবং দিনে, গোপনে এবং প্রকাশ্যে খরচ করে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে তাদের সাওয়াব আছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।'[৩৭৪]

---

[৩৭৩] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৮৪৩

[৩৭৪] সূরা বাকারাহ, ২ : ২৭৪

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَـٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَـٰرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

'যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়িম করে এবং আমি যা রিযক দিয়েছি তা থেকে গোপনে আর প্রকাশ্যে খরচ করে, তারাই তো এমন ব্যবসার আশা করে যাতে কখনও লোকসান হবে না। এজন্য আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে দেবেন আরও বেশি। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।'[৩৭৫]

এ সংক্রান্ত অনেক আয়াত আছে। অপর শ্রেণির সমালোচনায় আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَـٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿١٠﴾

'হে মুমিনগণ! তোমাদের সম্পদ এবং সন্তানসন্ততি আল্লাহর স্মরণ থেকে তোমাদের যেন গাফিল না করে। যাদেরকে উদাসীন করে দেয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছি, মৃত্যু আসার আগেই তা থেকে খরচ করো। নাহয় (মৃত্যু এসে গেলে) বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকাহ করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!'[৩৭৬]

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, 'সম্পদের যাকাত আদায় করে না এমন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে।' এরপর তিনি (প্রমাণস্বরূপ) উপর্যুক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

[৩৭৫] সূরা ফাতির, ৩৫ : ২৯-৩০

[৩৭৬] সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ : ৯-১০

যাদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে, তারা বলতে থাকবে :

مَآ أَغۡنَىٰ عَنِّي مَالِيَهۡۜ ۝٢٨ هَلَكَ عَنِّي سُلۡطَٰنِيَهۡ ۝٢٩

'আমার সম্পদ আমার কোনো কাজে এল না। আমার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে গেছে।'[৩৭৭]

সৎপথে খরচ করার প্রশংসা এবং আল্লাহর হক আদায় না করার সমালোচনাও অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নবি ﷺ বলেছেন,

«نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ»

'উত্তম লোকের জন্য উত্তম সম্পদ।'[৩৭৮]

এ থেকে বুঝে আসে, মুমিন ব্যক্তি সৎপথে কামাই করে এবং খরচ করে থাকে। এর সব নেকিও সে পায়। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খরচ করলেই সাদাকার সাওয়াব মেলে। সেটা নিজে খেলেও, আবার সন্তানসন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে খাওয়ালেও। অধীনস্থ ভৃত্যকে খাওয়ালেও সাওয়াবের কমতি হয় না। সম্পদশালী সাহাবিরা ছিলেন এই প্রকারভুক্ত।

সাহাবিদের দান করার নমুনা

এই উম্মাতের মাঝে আল্লাহর রাস্তায় সবচেয়ে বেশি খরচ করেছেন আবূ বকর ؓ। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلۡأَتۡقَى ۝١٧ ٱلَّذِي يُؤۡتِي مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ ۝١٨ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعۡمَةٖ تُجۡزَىٰٓ
۝١٩ إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ ٱلۡأَعۡلَىٰ ۝٢٠ وَلَسَوۡفَ يَرۡضَىٰ ۝٢١

'এ (জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে। আত্মশুদ্ধির জন্যে যে ব্যক্তি তার সম্পদ দান করে, তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদান নয়, কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়; সে তো অচিরেই সন্তুষ্টি লাভ করবে।'[৩৭৯]

---

[৩৭৭] সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ২৮-২৯

[৩৭৮] আহমাদ, আলমামুসনাদ, হাদীস নং : ১৭৭৬৩; বুখারি, আলআদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং : ২৯৯, সহীহ।

[৩৭৯] সূরা লাইল, ৯২ : ১৭-২১

আবূ বকর ﵁-এর পিতা একবার তাঁকে বললেন, 'তুমি তো দেখছি দুর্বল ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দিচ্ছ। মুক্ত যদি করতেই হয়, তবে শক্তিশালী ক্রীতদাসদের করো। তাহলে বিপদে-আপদে তোমার সাহায্যে তারা এগিয়ে আসবে।' আবূ বকর ﵁ উত্তরে বললেন, 'আব্বাজান! আমি তো এ উদ্দেশ্যে তাদের মুক্ত করি না।'

বর্ণনাকারী বলেছেন, এরপরই সূরা লাইলের ৫ নং আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়েছিল।[৩৮০]

উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ বলেছেন, 'একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দান করতে নির্দেশ দেন। ঘটনাক্রমে সেদিন আমার কাছে সম্পদ ছিল। আমি (মনে মনে) বললাম, কোনো দিন না পারলেও আজ আমি আবু বকর ﵁-এর চেয়ে বেশি দান করব। তাই আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে এলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "পরিবার-পরিজনদের জন্য কী রেখে এসেছ?" আমি বললাম, "এর সমপরিমাণ সম্পদ।"'

উমার ﵁ বলেছেন, 'তখন আবূ বকর ﵁ আনলেন তাঁর সমস্ত সম্পদ। তিনি পরিবার-পরিজনদের জন্য কী রেখে এসেছেন, নবিজি সেটা জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে আবূ বকর বললেন, "তাদের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।"'

উমার ﵁ বলেন, 'তখন আমি ঠিক করলাম, ভবিষ্যতে তাঁর সাথে আর কোনো দিন (নেক আমলের ব্যাপারে) প্রতিযোগিতা করব না।'[৩৮১]

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, আবূ বকর ﵁ সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন,

«مَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ»

'কারও সম্পদ আমাকে ততটা উপকৃত করেনি, আবূ বকরের সম্পদ যতটা করেছে।'[৩৮২]

আল্লাহর রাস্তায় খরচকারী সাহাবিদের অন্যতম ছিলেন, উসমান ইবনু আফফান ﵁। আবদুর রহমান ইবনু খাব্বাব ﵁ বলেছেন, নবি ﷺ সবাইকে তাবুকের

[৩৮০] হাকিম, আলমুসতাদরাক, হাদীস নং : ৩৯৪২, হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

[৩৮১] আবূ দাউদ, আসসুনান, হাদীস নং : ১৬৭৮, হাসান।

[৩৮২] হাদীসটি বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে হাদীসটি একাধিকবার আলোচিত হওয়ায় আমরা তা পুনরায় উল্লেখ করছি না। (-অনুবাদক)

সামরিক অভিযানে আর্থিক সহায়তা প্রদানে উৎসাহিত করেছিলেন। আমি সেখানে হাজির ছিলাম। উসমান ﵁ দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! গদি-পালান-সহ এক শ উট আল্লাহর রাস্তায় প্রদান করার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম।' তারপর নবি ﷺ আবার যুদ্ধের (জন্য দান করতে) উৎসাহিত করলেন। উসমান ﵁ (পুনরায়) দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! গদি-পালান-সহ দুই শ উট আল্লাহর রাস্তায় দান করার দায়িত্ব আমি নিলাম।' এরপর নবি ﷺ আবারও উৎসাহিত করলেন। উসমান ﵁ তখন দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! গদি-পালানসহ তিন শ উট আল্লাহর রাস্তায় দান করার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি।' বর্ণনাকারী বলেছেন, আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বার থেকে নামতে নামতে বলছেন,

«مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ، مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ»

'আজকের পর থেকে উসমান যা-ই করুক, সেজন্য তাঁকে কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না। আজকের পর থেকে উসমান যা-ই করুক, সেজন্য তাকে কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না।'[৩৮৩]

আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ ﵁ বলেছেন, তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় উসমান ﵁ নবি ﷺ-এর কাছে আসলেন। এসে একহাজার স্বর্ণমুদ্রা তাঁর কোলে ঢেলে দিলেন। নবি ﷺ কোলের মধ্যে থাকা সেই মুদ্রাগুলো ওলট-পালট করতে করতে বললেন,

«مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ»

'আজকের পর উসমান যা-ই করুক না কেন, এতে তার কোনো ক্ষতি হবে না।'[৩৮৪]

এমন আরেক সাহাবি ছিলেন আবদুর রহমান ইবনু আউফ ﵁। তাঁর ছেলে আবূ সালামাহ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (উম্মুল মুমিনিনদের) বলতেন,

«إِنَّ أَمْرَكُنَّ لَمِمَّا يُهِمُّنِي بَعْدِي، وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ»

'আমার (মৃত্যুর) পরে তোমাদের পরিস্থিতি (অর্থাৎ ভরণপোষণের ব্যবস্থা) নিয়ে আমার চিন্তা হয়। সবরকারী ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ তোমাদের খবর নেবে না।'

---

[৩৮৩] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৩৭০০

[৩৮৪] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৩৭০১

আবূ সালামাহ ﵁ বলেছেন, 'পরবর্তী সময়ে আয়িশা ﵂ (আমাকে) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা যেন তোমার বাবাকে জান্নাতের সালসাবীল ঝরনার পানি পান করান। কারণ, নবি ﷺ-এর সহধর্মিণীদের সেবায় তিনি একটি বাগান বিনিয়োগ করেছিলেন। ওটা চল্লিশ হাজার (দিনারে) বিক্রয় করা হয়েছিল।'[৩৮৫]

উম্মু বকর বিনতুল মিসওয়ার বলেছেন, আবদুর রহমান ইবনু আউফ ﵁ ৪০ হাজার দিনারে একটি জমি বিক্রি করে সেটার মূল্য নিজ গোত্র বনু যুহরার দরিদ্র লোক, মুহাজির এবং উম্মুল মুমিনীনদের মাঝে বণ্টন করে দেন। আয়িশা ﵂-এর কাছে তাঁর অংশ পাঠানো হলে তিনি বললেন, 'নবি ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি,

«لَا يَحْنُو عَلَيْكُنَّ مِنْ بَعْدِي إِلَّا الصَّابِرُونَ، سَقَى اللهُ ابْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ»

"একমাত্র ধৈর্যশীলরাই আমার পরে তোমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে।" আল্লাহ যেন ইবনু আউফকে সালসাবীল ঝরনার পানি পান করান।'[৩৮৬]

সাহাবিদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন, যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের সম্পদ খরচ করতেন। সবার কথা এখানে উল্লেখ করলে, আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

অসচ্ছল সাহাবিদের দুঃখবোধ

সম্পদশালী সাহাবিরা হাজ্জ, উমরাহ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, দাসমুক্তি, সাদাকাহ, নেক কাজ, সম্পর্ক রক্ষা-সহ নানা ধরনের সাওয়াব এবং আল্লাহর পছন্দনীয় কাজে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করছেন। এটা দেখে দরিদ্র সাহাবিরা এসব মহৎ কাজে অংশ নিতে না পারার আক্ষেপ করছিলেন। তাঁদের অবস্থার কথা আল্লাহ তাআলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন এভাবে,

لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا۟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩١﴾ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا۟ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا۟ مَا يُنفِقُونَ ﴿٩٢﴾

[৩৮৫] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৩৭৪৯

[৩৮৬] হাকিম, আলমুস্তদরাক, হাদীস নং : ৫৩৫৬

> 'দুর্বল, অসুস্থ, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের কোনো অপরাধ নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়। সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার কোনো সুযোগ নেই। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাদেরও কোনো অপরাধ নেই যারা আপনার কাছে বাহনের জন্য এলে আপনি বলেছিলেন, "আমি তো তোমাদের জন্য কোনো বাহন পাচ্ছি না।" তখন তারা ফিরে গেল, আর সে-সময় তাদের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল এ দুঃখে যে, ব্যয় বহন করার মতো কোনো কিছু তাদের ছিল না।'[৩৮৭]

এই আয়াত সেসব দরিদ্র সাহাবি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করার সময় নবিজির কাছে এসেছিলেন। নবি ﷺ-এর কাছে তাঁরা বাহনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। নবিজি বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের জন্য কোনো বাহনের ব্যবস্থা করতে পারছি না।'

আল্লাহর নবির সাথে জিহাদে অংশ নিতে পারছেন না দেখে, সে সাহাবিরা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গিয়েছিলেন। কোনো কোনো আলিম বলেছেন, আল্লাহর কসম! এটাই হলো পুরুষের কান্না। বাহনে চড়ে মৃত্যুর সামনে গিয়ে আল্লাহর রাস্তায় রক্ত ঝরানো এবং তরবারির আঘাতে নিজেদের মাথা শরীর বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনো ব্যবস্থা করতে পারছেন না দেখে, তাঁরা কান্নাকাটি করেছেন। পক্ষান্তরে দুনিয়া এবং নিজেদের খাহেশাত পূরণ হওয়ার জন্য যারা কান্না করে, সেটা মূলত আবদার পূরণ করার জন্য নারী-শিশুদের কান্নার মতো।

আসলে কান্না ও আফসোস তখনই সুন্দর হয়, যখন সেটার পেছনে থাকে উচ্চ মর্যাদা এবং চিরস্থায়ী নিয়ামাত হাতছাড়া হওয়ার কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ

'তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করো।'[৩৮৮]

وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ

'তোমরা ছুটে চলো—তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে।'[৩৮৯]

---

[৩৮৭] সূরা তাওবাহ, ৯ : ৯১-৯২

[৩৮৮] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৪৮ এবং সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৪৮

[৩৮৯] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৩৩

সাহাবায়ে কেরাম বুঝেছিলেন, সম্মান এবং উচ্চ মর্যাদার দিকে প্রতিযোগিতা করে ছুটে যাওয়ার নির্দেশ তাঁদেরকে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের কেউ ওজরবশত কোনো আমল করতে না পারলে তিনি ভাবতেন—আমলটি যিনি করেছেন তিনি আমার চেয়ে এগিয়ে গেছেন। ফলে প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ার বেদনায় তিনি মুষড়ে পড়তেন। মোটকথা, তাঁদের প্রতিযোগিতা ছিল আখিরাতের মর্যাদা-কেন্দ্রিক। যেমনটা আল্লাহ বলেছেন,

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۝٢٦

'এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা যেন প্রতিযোগিতা করে।'[৩৯০]

কিন্তু পরবর্তীদের কাছে বিষয়টি উল্টো হয়ে গেছে। তাদের প্রতিযোগিতা হয় তুচ্ছ দুনিয়া এবং তার ক্ষণস্থায়ী বিষয়কে কেন্দ্র করে।

হাসান ﷺ বলেছেন, 'কাউকে যদি তোমার সাথে দুনিয়াবি বিষয়ে প্রতিযোগিতা করতে দেখো, তবে তার সাথে আখিরাতের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করো।'

উহাইব ইবনুল ওয়ারদ ﷺ বলেছেন, 'সম্ভব হলে আল্লাহর দিকে এমনভাবে ধাবিত হও, যাতে কেউ তোমাকে পিছে ফেলতে না পারে।'

এই উম্মাতের মাঝে সৎকাজে সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন আবূ বকর ﷺ। উমার ﷺ বলেছেন, 'আমরা যেসব কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করতাম, আবূ বকর তাতে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যেতেন। সৎকাজে তিনি ছিলেন সবার আগে।'

আবূ বকর ﷺ-এর পরে দ্বিতীয় ছিলেন উমার ﷺ। আসলে উচ্চ মনোবল এবং উন্নত মানসিকতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যক্তি ধ্বংস মেনে নেয় না। তার লক্ষ্য থাকে স্থায়ী এবং পবিত্র মর্যাদার। কাঙ্ক্ষিত বস্তু অন্বেষণে সে ক্লান্ত হয়ে গেলেও কখনও রণে ভঙ্গ দেয় না।

আল্লাহর ব্যাপারে যে ক্লান্তি বোধ করে, আল্লাহ তাকে মদদ দেন। ইবাদাতে অধ্যবসায়ী একজনকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'শরীরটাকে এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি তো তার মর্যাদা চাইছি।'

উমার ইবনু আবদিল আযীয ﷺ বলেছেন, 'আমার নফস খুব লোভী। যা-ই পায় তার চেয়ে উত্তম জিনিস সে কামনা করে। খিলাফাতের দায়িত্ব তো দুনিয়ার সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয়। তাই সে দুনিয়ার ঊর্ধ্বে আখিরাতের মর্যাদা কামনা করছে।'

---

[৩৯০] সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ : ২৬

প্রতিটি মানুষের মূল্য তা-ই, যা সে কামনা করে। সুতরাং দুনিয়াকামী মানুষের মূল্য সর্বনিম্ন। কারণ দুনিয়া অতি তুচ্ছ। আর যে তা কামনা করে, সে আরও তুচ্ছ। দুনিয়া অতি নিকৃষ্ট। আর যে তা চায় সে আরও নিকৃষ্ট।

জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, 'অন্তর সব সময় ঘোরাঘুরি করে। কোনো অন্তর আল্লাহর আরশ পরিভ্রমণ করে, আবার কোনো অন্তর নোংরা স্থানে ঘুরে।'

গোটা দুনিয়াই একটি নোংরা স্থান। এখানে থাকা খাবারদাবার সব মল-মূত্র হয়ে যায়। আর শরীর ও কাপড় বিলীন হয়ে যায় মাটিতে। মাটির ওপর থাকা সবকিছুই তো মাটি।

উচ্চ মনোবলসম্পন্ন ব্যক্তি কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণে অধ্যবসায় করে। প্রিয়জনের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সে সর্বস্ব ব্যয় করে। পক্ষান্তরে যার মনোবল কম, সে চেষ্টায় থাকে খাহেশাত পূরণ করতে। সে কেবল আল্লাহর ক্ষমার আশায় বসে থাকে। ক্ষমা কপালে জুটলেও, অগ্রগামী নৈকট্যপ্রাপ্তদের স্তর তো তার কপালে জুটবে না।

জনৈক সালাফ বলেছেন, 'মেনে নিলাম, গুনাহগারকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কিন্তু তাতে কি সৎকর্মপরায়ণদের সাওয়াব তার কপালে জুটবে?'

প্রতিযোগীরা মর্যাদা লাভের প্রতিযোগিতা করার সময় নেক আমল নিয়ে একে অপরের প্রতি ঈর্ষা বোধ করে থাকে। নবি ﷺ বলেছেন,

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ،
وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ

'দু' ব্যক্তির ব্যাপারে ছাড়া ঈর্ষা করা যায় না। এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন, আর সে দিবানিশি তা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এবং এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ ধনসম্পদ দিয়েছেন, আর সে দিনরাত তা ব্যয় করতে থাকে।'[৩৯১]

অন্য বর্ণনাতে আছে, নবি ﷺ বলেছেন,

لَا تَحَاسُدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، يَقُولُ:
لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ

[৩৯১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৮১৫; সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৫০২৫।

فَيَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ

‘দুজন ব্যক্তির ব্যাপারেই কেবল ঈর্ষা করা যায়। প্রথমত এমন ব্যক্তি, আল্লাহ যাকে কুরআন দান করেছেন। সে দিনরাত তা তিলাওয়াত করে। (যা দেখে শ্রোতাদের কেউ) বলে, “একে যা দান করা হয়েছে, আমাকেও যদি তা দান করা হতো! তাহলে সে যেমনটা করছে, আমিও তেমন করতাম।” দ্বিতীয়ত এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন। আর সে ন্যায়সঙ্গতভাবে তা খরচ করে। (এটা দেখে কেউ) বলে, “তাকে যা প্রদান করা হয়েছে তা যদি আমাকেও প্রদান করা হতো! তাহলে সে যা করে, আমিও তা করতাম।”’[৩৯২]

ইমাম তিরমিযি ﷀ-সহ অনেকেই বর্ণনা করেছেন, নবি ﷺ বলেছেন,

«مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ، رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ، يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ عِلْمًا، وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللهُ عِلْمًا، وَلَا مَالًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا، عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ»

‘এ উম্মাতের উদাহরণ চার ব্যক্তির মতো। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ এবং জ্ঞান দান করেছেন। সে ইলম অনুযায়ী সম্পদ ব্যবহার করে এবং হক পথে তা খরচ করে থাকে। অপর ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন, কিন্তু কোনো সম্পদ দেননি। সে বলে, “এ ব্যক্তির মতো আমার (সম্পদ) থাকলে আমিও তার মতো ব্যবহার করতাম।”’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘উভয় ব্যক্তি প্রতিদানের ক্ষেত্রে সমান। আরেক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু কোনো জ্ঞান দান করেননি। ফলে সম্পদ নিয়ে সে মূর্খতাসুলভ আচরণ করে। আর না-হক পথে তা খরচ করে। অন্য ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ না দিয়েছেন সম্পদ, আর না দিয়েছেন জ্ঞান। সে বলে, “এ ব্যক্তির মতো আমার সম্পদ থাকলে আমিও তার মতোই সেটা ব্যবহার করতাম।”’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘দুজন ব্যক্তিই পাপের ক্ষেত্রে সমান।’[৩৯৩]

---

[৩৯২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৭২৩২

[৩৯৩] ইবনু মাজাহ, আসসুনান, হাদীস নং : ৪২২৮

এক অনন্য নিয়ামাত

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য ধনী সাহাবিরা নানারকম আমল করতেন। এটা দেখে অপারগতার কারণে দরিদ্র সাহাবিদের আফসোস করা এবং মুষড়ে পড়ায় নবি ﷺ তাঁদেরকে উজ্জীবিত করেন। তাঁদের জন্য একটি সহজ আমল বাতলে দেন। যার মাধ্যমে তাঁরা অগ্রগামী সাহাবিদের নাগাল পাবেন এবং পরবর্তীদের থেকে অগ্রগামী হয়ে যেতে পারবেন। পাশাপাশি সমকালীনদের মাঝে তাঁরা শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবেন। তাঁদের মতো আমল যিনি করবেন, তিনিই সেই মর্যাদা লাভ করবেন। আমলটি হলো ফরয সালাতের পরে যিকর করা। আবুদ দারদা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত একটি হাদীস থেকেও এমনটা জানা যায়। একবার নবি ﷺ সাহাবিদের বললেন,

«اَلَا أُنَبِّئُكُم بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا أَعْنَاقَكُمْ؟»

‘তোমাদের কি আমি সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে অবহিত করব না, যে আমল হবে তোমাদের মালিকের কাছে সবচেয়ে পরিশুদ্ধ, যা তোমাদের মর্যাদা সমুচ্চ করবে, যেটা তোমাদের জন্য আল্লাহর পথে সোনা-রূপা ব্যয় করার চেয়েও কল্যাণকর? (এমনকি) শত্রুর সম্মুখীন হয়ে তাদের গর্দানে তোমরা আঘাত করবে আর তোমাদের গর্দানে তারা আঘাত করবে—এর চেয়েও তা মঙ্গলজনক হবে?’

উত্তরে সাহাবিগণ বললেন, অবশ্যই বলে দিন। নবি ﷺ তখন বললেন,

«ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى»

‘সেটা হলো আল্লাহর যিকর।’[৩৯৪]

এক ব্যক্তি এক শ’টি ক্রীতদাস মুক্ত করেছিল। এই সংবাদ আবুদ দারদা رضي الله عنه-কে জানানো হলে তিনি বললেন, ‘একজন লোকের জন্য এক শ’টি ক্রীতদাস তো অনেক সম্পদ। তবে তার চেয়েও উত্তম হলো রাতে-দিনে ঈমানের সাথে থাকা এবং তোমাদের প্রত্যেকের জিহ্বা সব সময় আল্লাহ যিকরে সিক্ত থাকা।

[৩৯৪] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৩৩৭৭; ইমাম মালিক رحمه الله ও হাদীসটি মাওকূফভাবে বর্ণনা করেছেন।

বর্ণিত আছে, আবুদ দারদা ﵁ বলতেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার এক শ'বার বলা আমার কাছে এক শ দিনার সাদাকাহ করা অপেক্ষা বেশি পছন্দনীয়।

মারফূ এবং মাওকূফ একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে, 'যদি কেউ রাতে ইবাদাত করতে না পারে, সম্পদ খরচ করতে কৃপণতা করে এবং ভয়ের কারণে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে না নামে, তাহলে সে যেন বেশি বেশি সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি পাঠ করে। কারণ, এই কালিমা পাঠ করা আল্লাহর কাছে তাঁর রাস্তায় স্বর্ণ-রূপার পাহাড় সাদাকাহ করার চেয়েও বেশি প্রিয়।

অপরাগতার কারণে কল্যাণকর কাজে অংশ নিতে না পারলে, আফসোস করার পাশাপাশি কাজটি করার আকাঙ্ক্ষা লালন করতে হবে। এর মাধ্যমে কাজ সম্পাদনকারীর মতো সাওয়াব হাসিল হবে। তবে যারা উচ্চ মনোবল-সম্পন্ন ব্যক্তিরা নিছক এই ভাগীদার হতে পেরেই খুশী হন না। বরং তারা এমন আমল করতে চান, যা অপারগ হওয়া আমলের সমতুল্য হয়। যাতে সেসব আমলের সমতুল্য সাওয়াব তারা লাভ করেন। এবং সেসব আমলকারীর মতো তাদের সাওয়াবও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে তারা সমানে-সমান হয়ে যান।

সে যুগে এমনও হতো। জিহাদে অংশগ্রহণ করতে না-পারা মহিলা এবং দুর্বল লোকেরা নবিজির কাছে আসত। তাঁরা জিহাদের সমপর্যায়ের আমল কী আছে, তা জানতে চাইত। জনৈক মহিলা নবি ﷺ-এর সাথে হাজ্জ করতে পারেননি। নবি ﷺ ফিরলে, হাজ্জের সমপর্যায়ের কোনো আমল আছে কি না, তিনি জানতে চাইলেন। উত্তরে নবি ﷺ বললেন,

«فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ»

'আচ্ছা, রমাদানে উমরাহ করে নিয়ো। কারণ, রমাদানের একটি উমরাহ একটি হাজ্জের সমতুল্য।'[৩৯৫]

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনাতে আছে, নবি ﷺ বলেছিলেন,

«فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي»

'কারণ রমাদান মাসে উমরাহ পালন করা আমার সঙ্গে একটি হাজ্জ করার সমান।'[৩৯৬]

---

[৩৯৫] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৭৮২

[৩৯৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১২৫৬

আয়িশা ﷺ রাসূল ﷺ-এর কাছে জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি বললেন,

«جِهَادُكُنَّ الحَجُّ»

'তোমাদের জন্য জিহাদ হলো হাজ্জ।'

একবার জনৈক ধনী লোক মোটা অঙ্কের সম্পদ সাদাকাহ্ করলেন। এ খবর একদল বুযুর্গের কাছে পৌঁছল। তখন তারা একসাথে বসে হিসাব করলেন, ধনী লোকটির সাদাকাহ্ এর পরিমাণ কত। তারপর প্রতিটি দিরহামের বিনিময়ে তারা আদায় করলেন এক-এক রাকাআত সালাত। কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা তো এমনই হওয়া দরকার।

সুমহান তো সেই সত্তা, যিনি এ উম্মাতকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তাদের নবির হাত দিয়ে সীমাহীন কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। কেউ গুরুত্বপূর্ণ আমল করে আবার কেউ অপারগ হলে, তিনি তাকেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ আমল করার সুযোগ দেন। ফলে উম্মাতের সবাই আমলের সক্ষমতার ক্ষেত্রে সমতা লাভ করে। উদাহরস্বরূপ বলা যায় জিহাদের কথা। জিহাদ শ্রেষ্ঠ আমল হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ তা করতে পারে না। তাই সর্বক্ষণ বেশি বেশি যিকর করাকে জিহাদের সমতুল্য এবং তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার যুলহিজ্জাহ্ মাসের দশদিনের আমলকে, জান-মাল নিয়ে জিহাদে বেরিয়ে পড়া ব্যক্তির আমলের সমতুল্য বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হাজ্জের সমতুল্য নেক আমল

হাজ্জ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত। প্রত্যেকের মনেই আল্লাহর ঘরের প্রতি আগ্রহ আছে। সবাই সেদিকে আকর্ষণ অনুভব করে। অথচ বেশির ভাগ মানুষ হাজ্জ পালনে অক্ষম। বিশেষত প্রতি বছরে তো বটেই। তাই আল্লাহ্ এমন এক বিধান দিয়েছেন, যার সাওয়াব হাজ্জের বরাবর। এর মাধ্যমে নফল হাজ্জ পালনে অপারগ ব্যক্তিরা সাওয়াব পেয়ে থাকে। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ»

'যে ব্যক্তি জামাআতের সাথে ফজরের সালাত আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানে বসে আল্লাহর যিকর করবে এবং এরপর দু'রাকাআত সালাত আদায় করবে, তার জন্য একটি হাজ্জ ও উমরাহ্ পালনের সাওয়াব হবে।'

আনাস ﷺ বলেছেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

«تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ»

'পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (সাওয়াব হবে)।'[৩৯৭]

ফরয বিধিবিধান পালন করা, নফল হাজ্জ, উমরাহ এবং অন্যান্য নফল ইবাদাত থেকে উত্তম। কারণ বান্দা যেসব আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে, তার মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় হলো ফরয হুকুম পালন করা। অনেক মানুষই নফল হাজ্জ এবং সাদাকাহ গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেও, ঋণ পরিশোধ এবং যুলুম প্রতিহত করার মতো কাজ তাদের কাছে গুরুত্ব রাখে না। আবার দেখা যায় হারাম এবং সন্দেহপূর্ণ কামাই থেকে বেঁচে থাকা তাদের কাছে কঠিন মনে হলেও, হাজ্জ এবং সাদাকাতে অর্থ খরচ করতে তারা মোটেও কার্পণ্য করে না। নফল হাজ্জ-সহ অন্যান্য নফল আমলের চেয়ে হারাম থেকে বেঁচে চলা উত্তম। নফসের জন্য এটাই বেশি কষ্টসাধ্য বিষয়। ফুযাইল ইবনু ইয়ায ﷺ বলেছেন, 'হাজ্জ, শয়তানের মোকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ এমনকি জিহাদ থেকেও বেশি কষ্টসাধ্য কাজ হলো জিহ্বা সংযত রাখা। জিহ্বাকে সংযত রাখতে যদি তোমার কষ্ট হয়, তবে এটা ভীষণ চিন্তার বিষয়।'

ভাইয়েরা! হাজ্জ পালনে বাধাপ্রাপ্ত হলে ভেঙে না পড়ে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদে লেগে যাবেন। হাজ্জের বিধান পালন করতে বাধার সম্মুখীন হলে, পিছিয়ে থাকার কারণে সাধ্যমতো অশ্রু বিসর্জন দিন। কারণ হাজ্জে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির তো পশু জবাই করে ফেলা বাধ্যতামূলক। আল্লাহর নির্ধারিত সম্মানিত এলাকা থেকে দূরে থাকলেও, গুনাহের মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর রহমত থকে দূরে সরিয়ে দেবেন না। যে তাওবা এবং ইসতিগফার করে, আল্লাহর রহমত তার নিকটবর্তী হয়। আল্লাহর ঘর দূরে হওয়ায় যে হাজ্জ পালন করতে পারে না, তার উচিত আল্লাহর অভিমুখী হওয়া। কারণ যে তাঁকে ডাকে এবং তাঁর কাছে আশা করে, তার ঘাড়ের ধমনীর চেয়েও কাছে থাকেন তিনি।

[৩৯৭] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং ৫৮৬

যুল-ক্বা'দাহ মাসে পালনীয়

ইমাম আহমাদ ﷺ বর্ণনা করেছেন, বাহিলা গোত্রের এক ব্যক্তি বলেছেন, আমি কোনো প্রয়োজনে নবি ﷺ-এর কাছে এলাম। তিনি বললেন, 'তুমি কে?' আমি বললাম, আপনি কি আমাকে চিনতে পারেননি? তিনি আবার বললেন, 'তুমি কে?' আমি বললাম, আমি বাহিলা গোত্র থেকে আপনার কাছে প্রথম বছর এসেছিলাম। তিনি বললেন, 'তুমি যখন এসেছিলে তখন তো তোমার দেহের রঙ এবং আকৃতি সুন্দর ছিল। এখন তোমার এ দশা কেন?'

আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আপনার কাছ থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি কেবল রাতে আহার করেছি। (অর্থাৎ সিয়াম পালন করেছি।) তিনি বললেন, 'কে তোমাকে বলেছে নিজেকে (এভাবে) কষ্ট দিতে?' একথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, 'সবরের মাসে (অর্থাৎ রমাদানে) সিয়াম পালন করবে।'

আমি বললাম, আমি শক্তি রাখি। আপনি আরও বাড়িয়ে দিন। তিনি বললেন, 'মাসে একদিন সিয়াম পালন করবে।' আমি বললাম, আমি শক্তি রাখি। আপনি আরও বাড়িয়ে দিন। তিনি বললেন, তাহলে মাসে দুদিন সিয়াম পালন করবে। আমি বললাম, আমি শক্তি রাখি। আপনি আরও বাড়িয়ে দিন। তিনি বললেন, 'তাহলে মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করবে।' আমি আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলেও তিনি চারদিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করে বললেন, 'ঠিক আছে, সম্মানিত মাসগুলির কিছু অংশ সিয়াম পালন করো এবং ছাড়ো।'[৩৯৮]

ইমাম আবূ দাউদ, নাসায়ি এবং ইবনু মাজাহ ﷺ ও এ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনাতে শব্দ কমবেশি আছে।

---

[৩৯৮] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ২০৩২৩

ইবাদাতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন

এ হাদীস থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমনভাবে নিজেকে কষ্ট দিয়ে ইবাদাত করতে শারীয়াত আদেশ করেনি। এজন্যই সাহাবিকে নবি ﷺ বলেছিলেন, 'কে তোমাকে বলেছে নিজেকে কষ্ট দিতে?' একথাটি নবিজি ﷺ তিনবার বলেছিলেন।

এমনই আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল। নবিজি ﷺ এক বৃদ্ধ সাহাবিকে তার ছেলেদের কাঁধে ভর দিয়ে চলতে দেখে ব্যাপার কী জানতে চাইলেন। জানানো হলো, তিনি পায়ে হেঁটে হাজ্জ করবেন বলে মান্নত করেছেন। নবি ﷺ সাহাবিকে বাহনে আরোহণের নির্দেশ দিয়ে বললেন,

«إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ»

'লোকটি নিজেকে কষ্ট দিক আল্লাহর তো এর কোনো প্রয়োজন নেই।'[৩৯৯]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর رضي الله عنه দিনে সিয়াম রাখতেন এবং রাতে পরিবারের সাথে না থেকে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। প্রতি রাতেই এক খতম কুরআন পড়তেন। এ কথা জানতে পেরে নবি ﷺ তাঁকে আদেশ করেন সিয়াম রাখতে এবং ছাড়তে। এবং প্রতি সাত রাতে এক খতম কুরআন পড়তে।[৪০০]

এর কারণ হলো আদম-সন্তানকে তার শরীরের যা কিছু প্রয়োজন তা দিয়েই আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। যেমন খাবার, পানীয়, বিবাহ এবং পোশাক। সেই সাথে উত্তম ও হালাল বস্তুসমূহ তাঁর জন্য বৈধ করে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে নফস হয় শক্তিশালী এবং শরীর থাকে সুস্থ। এ দুটি জিনিস মানুষকে আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে। পাশাপাশি ক্ষতিকর এবং নিকৃষ্ট বস্তু তার জন্য হারাম করে দিয়েছেন, যা নফসকে বানিয়ে দেয় স্বেচ্ছাচারী, অন্ধ, কঠোর, উদাসীন, জেদি এবং দাম্ভিক।

সুতরাং নফসের আনুগত্য করে কেউ যদি নিজের ইচ্ছামতো হারাম বস্তু গ্রহণ করে, তাহলে এটা হবে সীমালঙ্ঘন, স্বেচ্ছাচারিতা এবং নিজের প্রতি যুলুম। আবার বৈধ জিনিস থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হলে, সেটাও হবে নিজের প্রতি যুলুম। এর কারণে যদি সে দুর্বল হয়ে আল্লাহর হক এবং বান্দার হকের মতো ফরয

---

[৩৯৯] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৮৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৪৬১

[৪০০] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৯৭৪-১৯৮০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৫৯

হুকুম পালনে অসমর্থ হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে গুনাহগার হতে হবে। আর নফল কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়লে, সে হবে অবহেলাকারী, উদাসীন এবং ক্ষতিগ্রস্ত। একারণেই নবি ﷺ কঠোরতা করতে নিষেধ করতেন। সহজ করতে বলতেন। তাঁর আনীত দ্বীনও সহজ।

নবি ﷺ এবং বিশিষ্ট সাহাবিদের আমল হরদম সালাত আদায় ও সিয়াম রাখা ছিল না। বরং তাঁদের অন্তর ছিল স্বচ্ছ, পবিত্র এবং গুনাহ থেকে নিরাপদ। আল্লাহর সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিল শক্তিশালী। তাঁরা আল্লাহকে ভালোবাসার পাশাপাশি তাঁকে ভয় এবং সম্মান করতেন। তাঁরা ছিলেন আল্লাহর কাছে থাকা প্রতিদানের প্রতি আগ্রহী এবং ধ্বংসশীল দুনিয়ার প্রতি বিরাগী।

এজন্যই উপকারী ইলম অর্জন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে নফল ইবাদাত করা থেকে উত্তম। যে ইলম আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, আল্লাহভীতি এবং ভালোবাসা সৃষ্টি করে, তাঁর পছন্দের প্রতি আগ্রহী হতে এবং অপছন্দকে এড়িয়ে চলতে শেখায়, (সেটাই উপকারী ইলম)। বিশেষত যখন মূর্খতা এবং মূর্খতাপ্রসূত ইবাদাতের প্রচলন অনেক বেশি থাকে।

নবি ﷺ-এর শেখানো পথ ও পন্থায় পরিমিত ইবাদাত করলে ভিন্ন পথ ও পন্থার অধ্যবসায় থেকেও অধিক অগ্রসর হওয়া যায়।

সিয়ামের কারণে বাহিলি গোত্রের এই সাহাবি শুকিয়ে গেছেন, তাঁর আকৃতি পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তা দেখে নবি ﷺ প্রথমত তাঁকে রমাদান মাসে সিয়াম পালন করতে বললেন। কারণ, এ মাসে সিয়াম পালন করা আল্লাহ তাআলা ফরয করেছেন। এই মাসের সিয়ামই সারা বছর সিয়াম পালনের জন্য যথেষ্ট। রমাদানের সিয়াম সগীরা গুনাহের জন্য কাফফারাস্বরূপ, যদি দুই রমাদানের মধ্যবর্তী সময়টা কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয়।

তখন সাহাবি আগ্রহ প্রকাশ করলেন, নবিজি ﷺ যেন তাঁকে আরও বেশি সিয়াম পালনের সুযোগ দেন। নফল সিয়ামের আদেশ করেন। নবিজি ﷺ তখন প্রতি মাসে একদিন সিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন। তিনি আরও বেশি আবেদন করলেন। অবশেষে নবিজি ﷺ তাঁকে মাসে তিনদিন সিয়াম পালনের আদেশ করলেন। সাহাবি এর চেয়ে বেশি আবেদন জানালেও নবিজি অনুমোদন দেননি। অর্থাৎ মাসে মাত্র তিনদিন সিয়াম পালনের অনুমোদন দিয়েছেন।

মাসে একদিন সিয়াম পালনের দ্বারা সারা মাস সিয়াম রাখার সাওয়াব হবে, তেমনি

দুদিন সিয়াম পালনের দ্বারাও একই সাওয়াব মিলবে। এর কারণ হলো, সিয়ামের সাওয়াব যতটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়, অন্য কোনো আমলের সাওয়াব ততটা বাড়িয়ে দেওয়া হয় না। পিছনে এ ব্যাপারে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। নবি ﷺ বলেছেন,

«كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي»

'আদমসন্তানের প্রতিটি আমল দশ থেকে সাত শ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, তবে সিয়াম এর ব্যতিক্রম; কারণ তা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব। কেননা, সে আমার জন্যই তার খাহেশাত এবং পানাহার বর্জন করে।'[৪০১]

সুতরাং সিয়ামের সাওয়াব কত গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তার হিসাব আল্লাহই জানেন। ইখলাস, গোপনীয়তা এবং হারাম ও মাকরূহ কাজ থেকে যত বেশি বেঁচে থাকা হবে, সিয়ামের সাওয়াব তত বেশি বেড়ে যাবে। তাই মাসে একদিন সিয়াম রাখলে তার সাওয়াব যে পুরো মাস সিয়াম রাখার সমতুল্য করা যাবে, এটা অস্বীকার করার জো নেই। তেমনি মাসে দুদিন সিয়ামের সাওয়াবও সারা মাসের সমতুল্য হতে পারে। আর তিনদিন সিয়ামের বিষয়টি তো স্পষ্ট। কারণ একটি নেক কাজের সাওয়াব দশগুণ হয়ে থাকে।

সহীহ বুখারি এবং মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনু আমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ তাঁকে বলেছিলেন,

«صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ»

'তুমি প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম রাখো। কারণ প্রতিটি নেক কাজের বিনিময়ে তার দশগুণ সাওয়াব মিলে। আর এটা পূর্ণ বছর সিয়াম রাখার সমতুল্য।'[৪০২]

এ ছাড়া আবূ হুরায়রা, আবূ দারদা এবং আবূ যার رضي الله عنهم-এর মতো অনেককেই নবি ﷺ প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করতে বলেছিলেন।

---

[৪০১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৫১

[৪০২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৯৭৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৫৯

বাহিলি সাহাবি আরও বেশি সিয়ামের আবদন করলে নবি ﷺ বলেছিলেন,

«فَمِنَ الْحُرُمِ وَأَفْطِرْ»

'সম্মানিত মাসগুলির কিছু অংশ সিয়াম পালন করো এবং ছাড়ো।'

বর্ণনাভেদে এ শব্দগুলিতে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও মূল বক্তব্য একই। আল্লাহ তাআলা যে চারটি মাসকে সম্মানিত বলেছেন, তাতে সিয়াম পালন করার গুরুত্ব এই হাদীস থেকে বুঝে আসে। আয়াতে কোন চারটি মাস উদ্দেশ্য, তা নবি ﷺ ব্যাখ্যা করেছেন। এটা আমরা 'রজব মাস'-এর অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত আছে, 'এই সম্মানিত মাসগুলিতে নেক আমল করা অধিক ফযিলতপূর্ণ।'

'মুহাররম মাস করণীয়'তে আমরা উল্লেখ করেছি, নবি ﷺ বলেছেন,

«أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ»

'রমাদানের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সিয়াম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের সিয়াম। এবং ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে তাহাজ্জুদের সালাত।'[৪০৩]

সামনে আমরা যুলহিজ্জাহ মাসের প্রথম দশকে সিয়াম পালনের ফযিলত নিয়ে আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ। যুলকাদা যে সম্মানিত মাস, এতে কোনো দ্বিমত নেই। পাশাপাশি এ মাসটি হাজ্জের মাসগুলির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ

'হাজ্জের নির্ধারিত কয়েকটি মাস আছে।'

কথিত আছে, জাহিলি যুগে যুলকাদাকে সম্মানিত মাস নির্ধারণ করার কারণ ছিল, এ মাসে হাজ্জের জন্য সফর করা হয়। আর যুলকাদাহ শব্দের অর্থ হলো, বসে থাকার মাস। তারা লড়াই থেকে নিবৃত্ত হয়ে বসে থাকত বলে এ মাসের নাম যুলকাদাহ দেওয়া হয়েছে।

---

[৪০৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৬৩

যুল-কাদাহ মাসের বৈশিষ্ট্য

নবি ﷺ হাজ্জের সাথে যে উমরাহ পালন করেছিলেন, সেটা বাদে প্রতিটি উমরাহ-ই তিনি যুলকাদাহ মাসে আদায় করেন। অবশ্য সে উমরাহটির ইহরামও যুলকাদাহতেই বেঁধেছিলেন। তবে তা পালন করেন যুলহিজ্জাহ মাসে হাজ্জের সাথে।

নবি ﷺ সর্বমোট চারবার উমরাহ পালন করেন :

১. হুদায়বিয়ার উমরা। এটা তিনি পূর্ণ করতে না পেরে হালাল হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

২. হুদায়বিয়া-পরবর্তী বছর কাযা উমরাহ।

৩. জি-রানাহর উমরাহ। এটা তিনি করেছিলেন মক্কাবিজয়ের বছর। হুনাইনের গানীমাত বণ্টনের সময়। কেউ কেউ শাওয়াল মাসের শেষদিকের কথা বললেও, প্রসিদ্ধ মত হলো যুলকাদাহ মাস। অধিকাংশ আলিমের মত এটাই।

৪. বিদায় হাজ্জের সাথে। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে এটা জানা যায় এবং অধিকাংশ আলিমও এ ব্যাপারে একমত।

ইবনু উমার رضي الله عنه, আয়িশা رضي الله عنها এবং আতা رحمه الله-এর মতো সালাফদের একদল মনে করেন, রমাদানে উমরাহ পালন করার পরিবর্তে শাওয়াল এবং যুলকাদাহ মাসে উমরাহ করা উত্তম। কারণ নবি ﷺ যুলকাদাহ মাসে উমরাহ করেছিলেন।

প্রিয় ভাই! মাসটা সম্মানিত হোক কিংবা সাধারণ, তুমি কি হারাম থেকে বিরত থাকবে না? তুমি কি সাওয়াবের কাজে পিছিয়ে থাকবে? গুনাহের কাজে এগিয়ে যাবে? প্রতিটি দিন আগের দিনের তুলনায় খারাপভাবে কাটাবে? কখন ভাঙবে এ ঘুম? কখন করবে তাওবা?

ওহে বৃদ্ধ! বার্ধক্য যাকে মৃত্যুর ব্যাপারে সতর্ক করছে! কেন তুমি গুনাহে লিপ্ত! কুরআন এবং ইসলামের পাশাপাশি বার্ধক্যের উপদেশ কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? বেঁচে থাকার চেয়ে শান্তির মৃত্যুই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

যুল-হিজ্জাহ মাসে করণীয়

প্রথম পর্ব : প্রথম দশকের গুরুত্ব

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ»

'এমন কোনো দিন নেই যাতে আমল করা আল্লাহর কাছে যুলহিজ্জাহ মাসের এই দশ দিনের নেক আমল থেকে বেশি প্রিয়।'

সাহাবিরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর পথে জিহাদ করা কি এর থেকে প্রিয় নয়? নবি ﷺ বললেন,

«وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ»

'না, আল্লাহর পথে জিহাদও এর থেকে প্রিয় নয়। তবে কোনো ব্যক্তি যদি জান-মাল নিয়ে আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়ে এবং দুটির কিছু নিয়ে আর ফিরে না-আসে, তবে ভিন্ন কথা।'[৪০৪]

প্রথম পরিচ্ছেদ : এ দশকের আমলের ফযিলত

উপর্যুক্ত হাদীসটি থেকে এটা বোঝা যায়, অন্য যে-কোনো দিনের চেয়ে এ দশদিনের আমল আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়। আর আল্লাহর কাছে যেটা প্রিয়, সেটা শ্রেষ্ঠ। এটাই স্বাভাবিক। অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনাতে أَحَبُّ (বেশি প্রিয়) এর পরিবর্তে أَفْضَل (উত্তম) এসেছে। আবার শব্দ দুটির কোনটি সঠিক, এ নিয়ে সন্দেহযুক্ত

[৪০৪] তিরমিজি, আসসুনান, হাদীস নং : ৭৫৭; আবূ দাউদ, আসসুনান, হাদীস নং : ২৪৩৮

বর্ণনাও এসেছে।

এই দশকের আমল আল্লাহর কাছে সারা বছরের অন্যান্য দিনের আমল থেকে প্রিয় এবং উত্তম। কাজেই এই দিনগুলির সাধারণ আমলও অন্যান্য দিনের বিশেষ আমল থেকে উত্তম হবে, এটাই বুঝে আসে। এজন্যই সাহাবিগণ জানতে চেয়েছিলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা কি এর থেকে প্রিয় নয়? উত্তরে নবি ﷺ বলে দিলেন, 'না। জিহাদও এর থেকে প্রিয় নয়।'

এরপর নবি ﷺ-কেবল এক প্রকার জিহাদকে ব্যতিক্রম করলেন। সেটা হলো সর্বোত্তম জিহাদ। কোন জিহাদ সর্বোত্তম, সেটা জানতে চাওয়া হলে নবি ﷺ বলেছিলেন,

«مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ، وَأُهْرِيقَ دَمُهُ»

'যে অশ্বারোহীর ঘোড়ার পা কেটে দেওয়া হয় এবং সে নিজেও শহীদ হয়ে যায়।'[৪০৫]

এমন জিহাদকারী আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান। একবার নবি ﷺ শুনতে পেলেন এক ব্যক্তি এ দুআ করছে, 'ইয়া আল্লাহ! আমাকে সেই শ্রেষ্ঠ বস্তু দান করুন, যা আপনি আপনার প্রিয় বান্দাদের দিয়ে থাকেন।' তখন নবি ﷺ বললেন,

«إِذًا يُعْقَرُ جَوَادُكَ، وَتُسْتَشْهَدُ فِي سَبِيلِ اللهِ»

'তাহলে তোমার ঘোড়ার পা কেটে দেওয়া হবে এবং তুমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাবে।'[৪০৬]

বিশেষভাবে কেবল এই জিহাদ যুলহিজ্জাহর প্রথম দশকের আমল থেকে উত্তম। আর জিহাদের অন্যান্য প্রকার এবং সব আমল থেকে এই দশদিনের আমল উত্তম এবং বেশি প্রিয়। এ থেকে বুঝে আসে, সাধারণ আমলও বিশেষ সময়ে হলে বিশেষ মর্যাদা পায়। তখন তার সাওয়াব এবং বিনিময় অনেকগুণ বেড়ে যায়। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসের একটি বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে যে,

«وَالْعَمَلَ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ»

---

[৪০৫] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ১৪২৩৩

[৪০৬] হাকিম, আলমুসতাদরাক, হাদীস নং : ৭৪৮, ইমাম যাহাবি রহিমাহুল্লাহ-এর মতে হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

'এই দিনগুলিতে আমলের সাওয়াব সাত শ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়।'[৪০৭]

মোটকথা, ইবনু আব্বাস ﷺ বর্ণিত হাদীস থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, এই দশ দিন সব ধরনের নেক আমলের সাওয়াব বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

এই দশকের কিছু আমল

সিয়াম পালন করা : উম্মুল মুমিনীন হাফসা ﷺ বলেছেন, 'নবি ﷺ চারটি আমল কখনও ছাড়েননি।

(ক) আশূরার সিয়াম,

(খ) যুলহিজ্জাহর দশ দিনের সিয়াম,

(গ) প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম এবং

(ঘ) ফজরের আগে দু' রাকাআত।'[৪০৮]

অন্য এক হাদীসে আছে, 'নবি ﷺ (নফল) সিয়াম পালন করতেন যুল-হিজ্জাহর ৯ তারিখ, আশূরার দিন, প্রতি মাসে তিনদিন এবং মাসের প্রথম সোম এবং বৃহস্পতিবার।'[৪০৯]

এই দশকে রাত জেগে ইবাদাত করা মুসতাহাব। ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে এ দশকের ফযিলতসংক্রান্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনু জুবাইর ﷺ। যুলহিজ্জাহ শুরু হলে (ইবাদাতের ক্ষেত্রে) তিনি একরকম সাধ্যাতীত অধ্যবসায় করতেন। বর্ণিত আছে, ইবাদাত পছন্দ করার কারণে এ রাতগুলিতে তিনি পরিবারের লোকদের বাতি নেভাতে নিষেধ করতেন।[৪১০]

বেশি বেশি যিকর : দিনগুলোতে বেশি বেশি যিকির করা মুসতাহাব। এর প্রমাণ হলো আল্লাহর বাণী,

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ

---

[৪০৭] বায়হাকি, শুআবুল ঈমান, হাদীস নং : ৩৪৮১, যয়ীফ

[৪০৮] নাসায়ি, আসসুনান, হাদীস নং : ২৪১৬, এই হাদীসটি একেক সনদে একেকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

[৪০৯] আবূ দাউদ, আসসুনান, হাদীস নং : ২৪৩৭

[৪১০] বাতি নেভাতে নিষেধ করা বলে রাত জেগে ইবাদাত করার তাকীদ প্রদান করা উদ্দেশ্য হতে পারে। (-অনুবাদক)

'এবং নির্দিষ্ট দিনগুলিতে তারা যেন আল্লাহর নাম স্মরণ করে।'[৪১১]

অধিকাংশ আলিমের এ আয়াতে যুলহিজ্জাহর দশ দিন উদ্দেশ্য। আল্লাহ চাহেন তা সামনে এ ব্যাপারে আলোচনা আসবে।

ইবনু উমার ﵄ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّحْمِيدِ»

'অন্যান্য দিনের তুলনায় এই দশটি দিন আল্লাহর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই দিনগুলিতে আমল করা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয়। সুতরাং এই দিনগুলিতে তোমরা তাহলীল (অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (অর্থাৎ আল্লাহু আকবার) এবং তাহমীদ (তথা আলহামদু-লিল্লাহ) বেশি বেশি পড়ো।'[৪১২]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : এই দশকের ফযিলত

পূর্বোল্লিখিত ইবনু উমার ﵄ বর্ণিত মারফূ হাদীসটি এই দশকের ফযিলত সম্পর্কিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢

'শপথ দশ রাতের।'[৪১৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মাসরূক ﵀ বলেছেন, 'এই দশ রাত বছরের শ্রেষ্ঠতম দিন।'

এই দশ দিনের মধ্যে আরাফার দিন আছে। জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, আরাফার দিন হলো দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম দিন। পূর্ববর্তী আলিমদের কেউ কেউ এই দশকের রাতগুলো থেকে রমাদানের শেষ দশকের রাতগুলোকে উত্তম বলেছেন। কারণ, তাতে লাইলাতুল কদর রয়েছে। তবে এ মতটি ঠিক নয়।

---

[৪১১] সূরা হাজ্জ, ২২ : ২৮

[৪১২] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ৬৪৪৫

[৪১৩] সূরা ফাজর, ৮৯ : ২

পরবর্তী বিশিষ্ট আলিমদের মত হলো গবেষণামূলক বক্তব্য। তাদের মতে, সামষ্টিকভাবে এই দশক রমাদানের দশকের সমষ্টি থেকে উত্তম। তবে রমাদানের দশকের একটি রাত অপরাপর সব রাত থেকে শ্রেষ্ঠ।

শ্রেষ্ঠত্বের কারণ

এই দশকের একটি শ্রেষ্ঠত্ব হলো, আল্লাহ তাআলা সামষ্টিকভাবে এই দশকের এবং বিশেষভাবে এর বিভিন্ন অংশের শপথ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَٱلْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢

'শপথ ফজরের। শপথ দশ রাতের।'[৪১৪]

বিশুদ্ধ মতানুসারে এখানে দশ রাত বলে যুলহিজ্জাহর দশরাত উদ্দেশ্য। সালাফদের অধিকাংশ মুফাসসির-সহ অন্যান্যদের মত এটাই।

আরেকটি শ্রেষ্ঠত্ব হলো, এই দশক হাজ্জের নির্দিষ্ট মাসগুলোর শেষাংশ। যে সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ

'হাজ্জের নির্ধারিত কয়েকটি মাস আছে।'[৪১৫]

উমার, ইবনু উমার, ইবনু মাসঊদ, ইবনু আব্বাস, ইবনুয যুবাইর ﷺ প্রমুখ সাহাবির মতে, এই নির্ধারিত মাসগুলি হলো শাওয়াল, যুলকাদা এবং যুলহিজ্জাহর দশ দিন। অধিকাংশ তাবিয়ি এই মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম শাফিয়ি, আহমাদ, আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ এবং আবূ সাওর ﷺ প্রমুখ ফকীহর মাযহাব এটাই।

এই দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠত্ব হলো, এ দিনগুলিতেই আল্লাহ তাআলা তাঁর নামে চতুষ্পদ প্রাণী জবাই করতে আদেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝٢٧ لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ

[৪১৪] সূরা ফাজর, ৮৯ : ১-২

[৪১৫] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৯৭

'এবং মানুষের মধ্যে হাজ্জের ঘোষণা দিন। আপনার কাছে তারা আসবে পায়ে হেঁটে এবং দূর-দূরান্ত থেকে ক্ষীণকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে। যাতে তারা নিজেদের কল্যাণময় স্থানে উপস্থিত হয় এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর দেওয়া চতুষ্পদ জন্তু জবাই করার সময় তাঁর নাম স্মরণ করতে পারে।'[৪১৬]

ইবনু আব্বাস, ইবনু উমার, হাসান, আতা, মুজাহিদ, ইকরিমাহ, কাতাদা এবং নাখায়ির ﵏-সহ অধিকাংশ আলিমের মতে এই দিনগুলি হলো যুলহিজ্জাহর প্রথম দশক। ইমাম আবূ হানীফা, শাফিয়ি এবং প্রসিদ্ধ মতানুসারে আহামাদ ﵏-ও এ মত ব্যক্ত করেছেন।

হাজিদের সাথে যুলহিজ্জাহর দশককে সম্পৃক্ত করার কারণ হলো, এ সময়টাতে তারা কুরবানির পশু নিয়ে যান, যা তাদের হাজ্জের শ্রেষ্ঠত্ব পূর্ণ করে। এই দশকের শেষ দিনটিতে তারা কুরবানির গোশত আহার করে থাকেন। মীকাত থেকে কু-রবানির জন্য উত্তম পশু সাথে নিয়ে যাওয়া, ইহরাম অবস্থায় সেগুলিকে শারী-য়াত-নির্ধারিত উপায়ে চিহ্নিত করে রাখা এবং সেই সাথে তালবিয়া পড়তে থাকা—এসব হলো নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর যিকর করার অন্যতম পদ্ধতি।

নবি ﷺ সর্বোত্তম হাজ্জের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে,

«العَجُّ وَالثَّجُّ»

'(যাতে) উচ্চস্বরে তালবিয়া ও তাকবীর পাঠ করা এবং কুরবানি দেওয়া (হয়)।'[৪১৭]

এই দশদিন বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করা মানে নিয়ামাতের শুকরিয়া আদায়। এই নিয়ামাত তো হাজির দ্বীন এবং দুনিয়া উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত। আর শ্রেষ্ঠতম আমল সেটাই, যাতে বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করা হয়। বিশেষত সেটা যদি হাজ্জ হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা হাজ্জের সময়টাতে তাঁকে বেশি বেশি স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَـٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ

[৪১৬] সূরা হাজ্জ, ২২ : ২৭-২৮

[৪১৭] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৮২৭, হাকিম ﵀ আলমুসতাদরাক এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

﴿ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

'যখন তোমরা আরাফাত থেকে ফিরবে, তখন মাশআরুল হারামের কাছে গিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাকে তাঁকে স্মরণ করবে। যদিও ইতিপূর্বে তোমরা অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। তারপর লোকেরা যেখান থেকে ফেরে, সেখান থেকে তোমরা ফিরবে। আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৪১৮]

এই যিকর হবে যুলহিজ্জাহর দশ দিনের মধ্যে। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَٰسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ

'এরপর যখন তোমরা হাজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা নিজেদের পূর্বপুরুষকে স্মরণ করতে। অথবা তার চেয়েও বেশি মনোযোগ দিয়ে স্মরণ করবে।'[৪১৯]

এখানে ইয়াওমুন নাহরের কথা বলা হয়েছে, যা এই দশকের শেষ দিন। এই দশকের পরবর্তী কয়েকটি দিনে যিকর করতে বলা হয়েছে। সেগুলো হলো তাশরীকের দিন।

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ»

'বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা মারওয়ার সায়ি এবং কঙ্কর নিক্ষেপ ব্যবস্থা তো মূলত আল্লাহর যিকর প্রতিষ্ঠার জন্য করা হয়েছে।'[৪২০]

এগুলো হাজ্জ পালনকারীদের সাথে সম্পৃক্ত। পক্ষান্তরে সাধারণ ব্যক্তিরা যুলহিজ্জাহর দশদিনে যিকর এবং কুরবানির মাধ্যমে হাজিদের সাথে শরিক হবে। হাজিরা যেমন কুরবানির পশু সাথে নিয়ে যায়, সাধারণ লোকেরাও তেমনি কুরবানির পশুর ব্যবস্থা করে থাকে। আবার ইহরামের সাথে সম্পৃক্ত কিছু কিছু নিষিদ্ধ বিষয়ও তারা মেনে চলেন। যেমন কুরবানির ইচ্ছা-পোষণকারী ব্যক্তি যুলহিজ্জাহর দশকে চুল, গোঁফ বা নখ কাটা থেকে বিরত থাকেন। উম্মু সালামাহ

[৪১৮] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৯৮-১৯৯

[৪১৯] সূরা বাকারাহ, ২ : ২০০

[৪২০] আবূ দাউদ, আসসুনান, হাদীস নং : ১৮৮৮; তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৯০২

ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»

'যখন (যুলহিজ্জাহ মাসের) প্রথম দশক শুরু হয়, আর তোমাদের কেউ কুরবানি করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন চুল এবং নখের কিছু স্পর্শ না করে (অর্থাৎ না কাটে)।'[৪২১]

ইমাম শাফিয়ি এবং আহমাদ ﷺ-সহ ফকীহ মুহাদ্দিসগণ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। তবে ইমাম আবূ হানীফা এবং মালিক ﷺ-সহ অনেক ফকীহ এ ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাদের মতে, কুরবানির ইচ্ছাকারী এমন কিছু করতে বাধ্য নয়।

নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর যিকর করার ক্ষেত্রে হাজিদের পাশাপাশি সাধারণ লোকেরা অংশগ্রহণ করে। কেননা, এই দশকের প্রতিদিনই বিশেষ করে দশম দিন বেশি বেশি যিকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, 'ইবনু উমার ও আবূ হুরায়রা ﷺ (যুলহিজ্জাহর) দশ দিন তাকবীর বলতে বলতে বাজারে যেতেন। তাদের তাকবীর শুনে লোকেরাও তাকবীর দিত।'[৪২২]

জাফর আল-ফিরইয়াবি ﷺ *'কিতাবুল ঈদাইন'* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদ ইবনু আবি যিয়াদ ﷺ বলেছেন, সাঈদ ইবনু জুবাইর, মুজাহিদ এবং আবদুর রহমান ইবনু আবী লাইলা ﷺ-কে অথবা তাঁদের দুজনকে এবং ফকীহদের আমি দেখেছি, যুলহিজ্জাহর দশ দিন তারা তাকবীরে তাশরীক বলতেন।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অন্তরে তাঁর সম্মানিত ঘর দেখার আগ্রহ দান করেছেন। কিন্তু প্রতি বছর তা প্রত্যক্ষ করা তো সবার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সামর্থ্যবানদের ওপর তিনি জীবনে একবার হাজ্জ পালন ফরয করেছেন। পাশাপাশি হাজ্জে গমনকারী এবং অক্ষম সবাইকেই যুলহিজ্জাহর প্রথম দশকের ভাগীদার বানিয়েছেন। যাতে করে প্রতি বছর হাজ্জে যাওয়া সম্ভব না হলেও ঘরে বসে এমন আমল করা যায়, যা হাজ্জ তো বটেই জিহাদ হতেও শ্রেষ্ঠ।

নাফরমানির কারণে দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং বিতাড়িত হতে হয়। বিপরীতে আল্লাহর কথা মেনে চললে তাঁর নৈকট্য এবং ভালোবাসা লাভ হয়। এ দিনগুলিতে আমাদের ভাইয়েরা ইহরাম বেঁধে বাইতুল্লাহর পানে যাত্রা করেছে। সেখানকার

---

[৪২১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৯৭৭

[৪২২] সহীহ বুখারি : ২/২০

আকাশ-বাতাস তালবিয়াহ, তাকবীর, তাহলীল, তাহমীদ এবং আল্লাহর বড়ত্বের আলোচনায় মুখরিত। তারা এগিয়ে গেছেন, আমরা বসে আছি। তাঁরা নৈকট্য লাভ করছেন, আমরা রয়ে গেছি দূরে। তাদের একাংশও আমাদের ভাগ্যে জুটলে তো আমরা ভাগ্যবান।

সুবর্ণ সুযোগ! এই দিনগুলিকে কাজে লাগানোর অপূর্ব সুযোগ! যার কোনো বিনিময় বা মূল্য হয় না। জলদি জলদি আমল করুন। মৃত্যু আসার আগেই আমল করে নিন। আমল করুন কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়ার আগেই। এমন দিন আসার আগেই আমল করে নিন, যেদিন ফিরে গিয়ে নেক আমল করার সুযোগ মিলবে না। আমল করুন সেদিনের আগেই, যেদিন মৃত্যু অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। যেদিন মানুষ কবরে শুয়ে ভোগ করবে কৃতকর্মের ফল।

চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট কিংবা সত্তরোর্ধ ব্যক্তি! মৃত্যু তো আপনার দোরগোড়ায়।

ওহে গুনাহে জর্জরিত ব্যক্তি! আপনি কি সম্মানিত ফেরেশতাদের লজ্জাবোধ করেন না? নাকি অস্বীকার করেন প্রতিফল দিবসকে?

ওহে এমন ব্যক্তি, যার অন্তর আঁধার-রাতের মতো নিকষ-কালো হয়ে গেছে! এখনও কি তোমার অন্তর আলোকিত বা নরম হওয়ার সময় হয়নি? এই দশকে তোমার মনিবের দান অন্বেষণ করো। কারণ আল্লাহর কিছু বিশেষ দান রয়েছে, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকেন। যে ওটা পায়, তার জীবন ষোলো আনা সুখের হয়।

দ্বিতীয় পর্ব : আরাফাহ এবং কুরবানির দিনের ফযিলত

সহীহ বুখারি এবং মুসলিমে উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, এক ইয়াহূদি তাঁকে বলল, আমীরুল মুমিনীন! আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে যা আপনারা পাঠ করে থাকেন। সেটা আমাদের ইয়াহূদি জাতির ওপর অবতীর্ণ হলে আমরা অবশ্যই সে দিনকে উৎসবের দিন হিসেবে পালন করতাম। উমার ﵁ বললেন, কোন আয়াতটি? সে বলল,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًاۚ

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামাত পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।'[৪২৩]

উমার ﵁ বললেন, আমি ভালো করেই জানি, এ আয়াতটি কোন দিন এবং কোন স্থানে রাসূল ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। সেদিন তিনি আরাফায় অবস্থান করছিলেন এবং দিনটি ছিল জুমুআর দিন।[৪২৪]

সুনানুত তিরমিযিতে ইবনু আব্বাস ﵄ থেকেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন, 'এটি তো এমন দিনে নাযিল হয়েছে, যেদিন আমাদের দুটি ঈদ ছিল—জুমুআর দিন এবং আরাফার দিন।'[৪২৫]

ঈদ হলো খুশি এবং আনন্দের দিন। দুনিয়াতে মুমিনের খুশির দিন হয় তার মনিবের ক্ষমাপ্রাপ্তির কারণে। যখন তারা ইবাদাত পূর্ণ করে এবং রবের অনুগ্রহ ও ক্ষমার মাধ্যমে আমলের প্রতিদান লাভ করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

'বলুন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ এবং দয়ায়; সুতরাং এতে তারা আনন্দিত হোক। তারা যা সঞ্চয় করে, তা থেকে এটা উত্তম।'[৪২৬]

মুসলমানদের ঈদ

মদীনাতে আসার পর নবি ﷺ দেখলেন, দুটি দিন লোকেরা খেলাধুলা করে থাকে। তখন তিনি বললেন,

إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ

'আল্লাহ এর পরিবর্তে উত্তম দুটি দিন তোমাদের দিয়েছেন—ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা।'[৪২৭]

খেলাধুলার দুটি দিনের পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা এই উম্মাতকে যিকর, শোকর, ক্ষমা এবং মার্জনার দুটি দিন দিয়েছেন।

---

[৪২৩] সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৩

[৪২৪] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৩০১৭

[৪২৫] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ৩০৪৪

[৪২৬] সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৮

[৪২৭] আহমাদ, মুসনাদ, হাদীস নং : ১২০০৬

এই দুনিয়াতে মুমিনদের ঈদ তিনটি। একটি ঈদ প্রতি সপ্তাহে আসে। আর দুটি ঈদ বছরে একবার একবার করে আসে। যে ঈদটি বারবার আসে সেটি হলো জুমুআর দিন। এটি সাপ্তাহিক ঈদ। এটি ফরয সালাতের পূর্ণতার ওপর নির্ভরশীল। কারণ, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ওপর দিনেরাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। আর দুনিয়ার দিনগুলি আবর্তিত হয়ে থাকে সাত দিনের ওপর ভিত্তি করে। অতএব, যখন এক সপ্তাহ আবর্তিত হয় এবং মুসলমানরা তাদের নির্ধারিত সালাত পূর্ণ করে, সেই পূর্ণতার দিনটিতে তাদেরকে একটি বিশেষ বিধান দেওয়া হয়।

এ দিনটিতে সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ হয়েছিল। এ দিনেই আদম ﷺ-কে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। আবার এ দিনেই তাঁকে দুনিয়াতে নামিয়ে দেওয়া হয়। এ দিনেই দুনিয়ার মেয়াদ পূর্ণ হয়ে কিয়ামাত সংঘটিত হবে। জুমুআর দিনকে এ নাম দেওয়ার কারণ হলো, এ দিনে যিকর, উপদেশ এবং জুমুআর সালাতের জন্য লোকেরা জমায়েত হয়ে থাকে। এজন্যই দিনটিকে ঈদের দিন বানিয়ে, শুধু এ দিনটিতে সিয়াম পালন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

জুমুআতে উপস্থিতির সাথে হাজ্জের মিল রয়েছে। আগে আগে যাওয়াতে কুরবানি করার সাওয়াব পাওয়া যায়। প্রথমদিকে গমনকারী পায় উট কুরবানির সাওয়াব, তারপর গমনকারী পায় গরু কুরবানির, এরপর দুম্বা কুরবানির, এরপর মুরগি সাদাকাহ করার নেকি এবং সর্বশেষ গমনকারী পায় ডিম সাদাকার সাওয়াব।

জুমুআয় উপস্থিত হওয়া দুই জুমুআর মধ্যবর্তী গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো, এ সময়টাতে কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। তদ্রূপ হাজ্জে মাবরূরও দুই হাজ্জের মধ্যবর্তী গুনাহগুলোর জন্য কাফফারা হয়ে যায়।

আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ خَيْرٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ»

‘জুমুআর দিন থেকে উত্তম দিনে সূর্য উদিত এবং অস্তমিত হয় না।’[৪২৮]

এই সাপ্তাহিক ঈদ হলো ঈমানের পর ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোকন। এটি ফরয সালাত পূর্ণ করার সাথে সম্পৃক্ত। পক্ষান্তরে যে ঈদ দুটি বছরে একবার করে আসে তার প্রথমটি হলো ঈদুল ফিতর। যা ইসলামের তৃতীয় রোকন ও রমাদানের সিয়াম পূর্ণ করার সাথে সম্পৃক্ত। মুসলমানরা রমাদানের ফরয সিয়াম পালনের

[৪২৮] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ১০৭২২

পর আল্লাহর পক্ষ থেকে মাগফিরাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপযুক্ত হয়। রমাদানের সিয়াম বান্দার অতীত জীবনের গুনাহ মাফ করে দেয়। এমন জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়, গুনাহের কারণে যা তার ওপর আবশ্যক হয়ে গিয়েছিল। তাই সিয়াম পূর্ণ করার পরে তার জন্য আল্লাহ একটি ঈদের বিধান দিয়েছেন। যেখানে বান্দারা যিকর ও শোকর আদায় করতে একত্র হবে। ঈদের দিন সালাত এবং সাদাকার বিধানও তিনি দিয়েছেন। এ ঈদে রোজাদারকে সিয়ামের প্রতিদান পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হয় এবং ক্ষমা নিয়ে তারা প্রত্যাবর্তন করবে।

দ্বিতীয় ঈদটি হলো কুরবানির ঈদ। ঈদ দুটির মাঝে এটিই বড় এবং উত্তম। এই ঈদটি ইসলামের চতুর্থ রোকন ও হাজ্জ পূর্ণ করার সাথে সম্পৃক্ত। হাজ্জ পূর্ণ করার পর মুসলমানদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর হাজ্জ পূর্ণ হয় আরাফার দিনে। আরাফায় অবস্থান করার মাধ্যমে। এটাই হাজ্জের সবচেয়ে বড় রোকন। নবি ﷺ বলেছেন,

«الحَجُّ عَرَفَةُ»

‘হাজ্জ হলো আরাফায় অবস্থানের নাম।’[৪২৯]

আরাফা হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তির দিন। এদিন আরাফায় অবস্থানকারী এবং অনুপস্থিত মুসলমানদেরকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। এজন্যই এর পরবর্তী দিনটি সব জায়গার মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন হয়ে থাকে। হাজ্জের অনুষ্ঠানে কেউ থাকুক বা না-থাকুক, আরাফার দিনে মুক্তি এবং ক্ষমা পাওয়ায় ঈদ সবার জন্য। সবাই প্রতি বছর হাজ্জে অংশ নিতে না-পারা মূলত বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। কারণ তিনি হাজ্জকে জীবনে একবার ফরয করেছেন। প্রতি বছর নয়। বছর বছর হাজ্জ করা মূলত ফরযে কিফায়া। পক্ষান্তরে প্রতি বছর সিয়াম পালন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয।

মোদ্দাকথা, আরাফার দিনের সমাপ্তি এবং মুমিনদেরকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়ার পর, মুসলিমরা সবাই ঈদে অংশগ্রহণ করে থাকে। এসময় সবাইকে জন্তুর রক্ত প্রবাহিত করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের বিধান দেওয়া হয়েছে। হাজিরা তখন জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করে ইহরাম থেকে মুক্ত হয়। অপরিচ্ছন্নতা দূর করে পরিস্কার হয়, মানত পূর্ণ করে এবং কুরবানি দেয়। তারপর বাইতুল্লাহ’র তাওয়াফ করে। আর সাধারণ লোকেরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর যিকর করে, তাকবীর দেয় এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে থাকে। এরপর তারা পশু

[৪২৯] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৮৮৯

জবাইয়ের মাধ্যমে কুরবানির আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে। এটাই হয় নিয়ামাতের শুকরিয়া।

ঈদুল আযহাতে সালাত আদায় এবং কুরবানি করা ঈদুল ফিতরের সালাত এবং সাদাকার চেয়ে উত্তম কাজ। এজন্যই কাউসার পাওয়ার কারণে শুকরিয়াস্বরূপ নবি ﷺ-কে সালাত আদায় এবং কুরবানি করতে বলা হয়েছে। তাঁকে আরও বলা হয়েছে,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝١٦٢

'আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।'[৪৩০]

একারণেই কুরবানির পশু জবাইয়ের সময় এই আয়াত তিলাওয়াতের নির্দেশ রয়েছে। কুরবানি হলো ইবরাহীম عليه السلام এবং নবি ﷺ-এর সুন্নাহ। কারণ, ইবরাহীম عليه السلام এ কুরবানির বিধান প্রবর্তন করেন।

এই হলো দুনিয়াতে মুসলিমদের ঈদ। প্রকৃত মনিব, রাজাধিরাজ এবং পরম দাতার ইবাদাত পূর্ণ করা এবং প্রতিশ্রুত বিনিময় এবং সাওয়াব লাভের সময় এটা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নতুন পোশাক পরা মানেই ঈদ নয়। ইবাদাত বাড়িয়ে দেওয়াই সত্যিকারের ঈদ। জমকালো পোশাক আর নামিদামি বাহনের নাম ঈদ নয়। গুনাহ মাফ পাওয়াই হলো প্রকৃত ঈদ।

জান্নাতে মুমিনদের ঈদ হবে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ লাভের সময়। তারা আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ লাভ করলে, তিনি সর্বোচ্চ সম্মানে তাদেরকে ভূষিত করবেন। তাদের সামনে তিনি আপন নূরের বিকিরণ ঘটালে, তাঁর দিদার লাভ করে সবাই ধন্য হবে। এই দিদার হবে তাদের পাওয়া অন্যসব নিয়ামাতের চেয়েও পছন্দনীয়। এই নিয়ামাত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

"যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং 'আরও বেশি'।"[৪৩১]

[৪৩০] সূরা আনআম, ৬ : ১৬২

[৪৩১] সূরা ইউনুস, ১০ : ২৬

প্রেমিকের ঈদ তো কেবল প্রিয়জনের নৈকট্য লাভ করা। দুনিয়াতে মুসলিমদের ঈদের দিনটি আখিরাতেও হবে আনন্দের। সেদিন সম্মিলিতভাবে তারা আল্লাহ তাআলার দীদার লাভ করবে। তিনিও আপন নূরের বিকিরণ ঘটাবেন।

জুমুআর দিনকে জান্নাতে 'আরও বেশি' (প্রাপ্তির) দিন বলে অভিহিত করা হবে। ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিনও জান্নাতীরা আল্লাহ তাআলার দীদারের জন্য একত্র হবে। বর্ণিত আছে, দুনিয়ার ঈদে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও যেমন আনন্দ করে, তেমনি জান্নাতী ঈদের দিন দুটিতে পুরুষদের সাথে নারীরাও আল্লাহর দিদার লাভের জন্য সমবেত হবে। এই দিদার হবে সাধারণ জান্নাতীদের জন্য। অপরদিকে স্পেশাল জান্নাতীদের জন্য প্রতিটি দিনই হবে ঈদের দিন। তাঁরা সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলা আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ লাভ করবেন।

ঈদ দুটির মধ্যে কুরবানির ঈদ অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ। পাশাপাশি এতে হাজির সম্মান এবং হাজ্জের সময় অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই এ ঈদের আগে-পরে আনন্দ থাকে। আগের ঈদ-আনন্দ হলো আরাফার দিন, আর পরে তাশরীকের দিনগুলিতে। এই দিনগুলি প্রতিটি হাজির জন্য ঈদের দিন। যেমনটা উকবাহ ইবনু আমির ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবি ﷺ বলেছেন,

«يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»

'আরাফার দিন, কুরবানির দিন এবং তাশরীকের দিনগুলি হলো মুসলিম জনগণের ঈদের দিন। এ দিনগুলো হচ্ছে পানাহারের দিন।'[৪৩২]

এ কারণেই হাজির জন্য আরাফার দিন সিয়াম পালন করা শারীয়াত-সমর্থিত নয়। কারণ, দিনটি তাদের জন্য ঈদের প্রথম দিন এবং বড় সমাবেশস্থল। সেদিন নবি ﷺ জনসম্মুখেই সিয়াম ভঙ্গ করেছিলেন। সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা ﵀-কে আরাফার দিন হাজিদের সিয়াম জায়িয না হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, 'আরাফায় অবস্থানকারীগণ আল্লাহর মেহমান। মহান কেউ তার মেহমানের ক্ষুধার্ত থাকাকে পছন্দ করেন না।'

একই বিষয় পাওয়া যায় ঈদের দুই দিন এবং তাশরীকের দিনগুলিতে। এ দিনগুলিতে সমস্ত মানুষ আল্লাহর মেহমান হয়ে থাকে। বিশেষত কুরবানির দিনে। এ হাজি এবং সাধারণ মানুষ সবাই কুরবানির গোশত খেয়ে থাকে। তাশরীকের দিন তিনটিও

[৪৩২] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৭৭৩, সহীহ

ঈদের দিন। এ কারণেই নবি ﷺ মক্কাতে ঘোষক দিয়ে ঘোষণা করিয়েছিলেন, 'এ দিনগুলি পানাহার এবং আল্লাহর যিকর করার দিন। সুতরাং কেউ যেন সিয়াম না রাখে।'

কখনও কখনও একই দিনে দুই ঈদের সমন্বয় ঘটে। জুমুআ এবং আরাফার বা কুরবানির দিন একসাথে হয়। দুটি ঈদ একত্র হওয়ার ফলে সেদিনের শ্রেষ্ঠত্ব আরও বেড়ে যায়। নবি ﷺ-এর হাজ্জের সময় এমনটাই ঘটেছিল। সে-বার আরাফা হয়েছিল জুমুআর দিন। সেদিনই এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামাত পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।'[৪৩৩]

অধিকাংশ আলিমের মতে, হাজ্জ ফরয হওয়ার পরে এটাই ছিল মুসলিমদের প্রথম হাজ্জ। এর মাধ্যমে ইসলামের সবগুলো রোকনের ওপর তাদের আমল সম্পন্ন হওয়ায়, তাদের দ্বীনও পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা হাজ্জকে ইবরাহীম عليه السلام-এর ভিত্তির ওপর ফিরিয়ে এনে, মুশরিকদের জন্য (হাজ্জ) হারাম করে দেন। ফলে মুসলিমদের সাথে সে-সময় কোনো মুশরিক ছিল না।

শা'বি رحمه الله বলেছেন, 'এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময় নবি ﷺ আরাফায় ইবরাহীম عليه السلام-এর জায়গায় অবস্থান করছিলেন। শিরকের সমাপ্তি ঘটেছিল, অবসান ঘটেছিল জাহিলি যুগের এবং উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।' কাতাদা رحمه الله-সহ অনেকেই এ মত ব্যক্ত করেছেন। আবূ বকর ইবনু আইয়াশ رحمه الله বলেছেন, 'এ আয়াতের পরে হালাল বা হারামের বিধান-সম্বলিত আর কোনো আয়াত নাযিল হয়নি।'

আর নিয়ামাত পূর্ণ করা অর্জিত হয় মাগফিরাতের মাধ্যমে। কারণ এটা ছাড়া নিয়ামাত পূর্ণ হতে পারে না।

---

[৪৩৩] সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৩

নবি ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ۝٢

'যেন আল্লাহ আপনার অতীত আর ভবিষ্যতের ত্রুটিগুলো মার্জনা করেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নিয়ামাত পূর্ণ করেন এবং আপনাকে পরিচালিত করেন সরল পথে।'[৪৩৪]

অপরদিকে ওযুর বিধান-সংক্রান্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ

'বরং আল্লাহ তোমাদের পবিত্র করতে চান এবং তাঁর নিয়ামাত পূর্ণ করতে চান তোমাদের ওপর।'[৪৩৫]

এই আয়াত থেকেই মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আল-কুরাযি ﵀ এ মাসআলা উদ্‌ঘাটন করেছেন, ওযুর মাধ্যমে গুনাহের কাফফারা হয়ে থাকে। যেমনটা হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে।

আরাফার দিনের শ্রেষ্ঠত্ব

- এ দিনেই দ্বীন এবং নিয়ামাত পরিপূর্ণ হয়েছিল।
- আল্লাহ তাআলা কুরআনে জোড় এবং বেজোড়ের শপথ করেছেন। এ দিনটি হলো জোড় তারিখ, আর কুরবানির দিনটি হলো বেজোড়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

  وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝٣

  'শপথ যে উপস্থিত হয় এবং যার কাছে উপস্থিত হয়।'[৪৩৬]

  কারও কারও মতে, এ আয়াতে 'যে উপস্থিত হয়' বলে আরাফার দিন উদ্দেশ্য।
- আরাফার দিনটি সর্বোত্তম দিন। ইবনু হিব্বান ﵀ তাঁর কিতাব সহীহ-তে

[৪৩৪] সূরা ফাতহ, ৪৮ : ২

[৪৩৫] সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৬

[৪৩৬] সূরা বুরূজ, ৮৫ : ৩

জাবির ﵁-এর সূত্রে নবি ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন,

«أَفْضَلُ الْأَيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةَ»

'আরাফার দিনটি সর্বোত্তম দিন।'

একদল আলিম এমনটাই বলেছেন। আবার তাদের অনেকে বলেন, কুরবানির দিনটি উত্তম। তাদের পক্ষে দলিল হলো, আবদুল্লাহ ইবনু কুরত ﵁-এর বর্ণনা। নবি ﷺ থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন,

«أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ»

'আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হলো কুরবানির দিন। এরপর তার পরবর্তী দিন।'[৪৩৭]

ইমাম আহমাদ ﵀ ছাড়া ইমাম আবূ দাউদ, নাসায়ি এবং ইবনু হিব্বান ﵀ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনু হিব্বান ﵀-এর বর্ণনার শব্দ হলো, أَفْضَلُ الْأَيَّامِ অর্থাৎ সর্বোত্তম দিন।

এ দিনটিতে আল্লাহ তাআলা বান্দার গুনাহ মাফ করেন, জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন এবং আরাফায় অবস্থানকারীদের নিয়ে গৌরব প্রকাশ করে থাকেন। সহীহ মুসলিম-এ আয়িশা ﵂-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمِ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟»

'অন্যান্য দিনের তুলনায় আরাফার দিন আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। সেদিন তিনি নিকটবর্তী হন। তারপর বান্দাদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের সামনে গৌরব প্রকাশ করে বলেন, এরা কী চায়?'[৪৩৮]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵄ থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى

[৪৩৭] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ১৯০৭৫

[৪৩৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৩৪৮

عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا

'আল্লাহ তাআলা আরাফার দিন বিকেলে আরাফায় অবস্থানকারীদের নিয়ে গৌরব প্রকাশ করে বলেন, আমার বান্দাদের প্রতি তোমরা লক্ষ করো। তারা এলোমেলো কেশে ধূলিধুসরিত অবস্থায় আমার দরবারে হাজির হয়েছে।'[৪৩৯]

আরাফার দিনে করণীয়

আরাফার দিনে নাজাত এবং ক্ষমা লাভের উপায়গুলির প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। তবেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং গুনাহের মাফ পাওয়া যাবে।

- সিয়াম পালন করা। সহীহ মুসলিমে আবূ কাতাদা ﵁-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন,

  «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»

  'আরাফার দিনের সিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি, এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী বছর এবং পরবর্তী বছরের গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে।'[৪৪০]

- অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখা।

- ক্ষমা এবং মুক্তির জন্য বেশি বেশি দুআ করা। কারণ, এটা দুআ কবুলের সম্ভাব্য সময়।

- একনিষ্ঠভাবে সততার সঙ্গে বেশি বেশি কালিমা পড়া। কারণ এটাই দ্বীন ইসলামের মূল ভিত্তি, যা আল্লাহ তাআলা সেদিন পূর্ণ করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵄ থেকে বর্ণিত আছে, আরাফার দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দুআ বেশি বেশি পড়ছিলেন,

  لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

  'এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই। সমস্ত

---

[৪৩৯] আলমুসনাদ, হাদীস নং : ৭০৮৯, মুনযিরি ﵀ বলেছেন, এ হাদীসের সনদে সমস্যা নেই।

[৪৪০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৬২

রাজত্ব তাঁর এবং যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই জন্য। তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ। আর তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।'[৪৪১]

সুনানুত তিরমিযিতে বর্ণিত হয়েছে, নবি ﷺ বলেছেন,

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي

'সর্বোত্তম দুআ হলো আরাফা দিনের দুআ। আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবিগণ যা বলেছি, তাই সবচেয়ে কল্যাণকর—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই। সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁর, সমস্ত প্রশংসাও তাঁরই প্রাপ্য। সবকিছুর ওপরই তিনি ক্ষমতা রাখেন।'[৪৪২]

তাওহীদের কালিমার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি সুনিশ্চিত। কারণ এই কালিমা দাসমুক্তির বরাবর (ফযিলত রাখে)। আর দাসমুক্তির ফলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ হয়। সহীহ বর্ণনা থেকে জানা যায়, 'তাওহীদের কালিমা এক শ বার পড়লে, দশটি দাসমুক্তির সাওয়াব পাওয়া যায়।' অন্য এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, 'তাওহীদের কালিমা দশবার পড়লে ইসমাঈল ﷺ-এর বংশের চারটি দাস মুক্ত করার সাওয়াব পাওয়া যায়।'[৪৪৩]

যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে পানাহ চায়, কিন্তু অনবরত কবীরা গুনাহ করছে! আল্লাহর রহমতকে নিজের থেকে সরিয়ে দিচ্ছে! (তাকে লক্ষ করে বলছি) : আল্লাহর কসম! তুমি নিজের প্রতি সদাচার করছ না, তোমার সাথে কেউ নেই। নাফরমানির মাধ্যমে তুমি নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছ। অবশেষে ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হলে তুমি বলবে, 'এমনটা কেন হলো?' জেনে রেখো, এটা তোমারই কর্মফল। মুক্তির আগ্রহী হলে, নিজেকে আল্লাহর থেকে কিনে নাও। কারণ, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।

---

[৪৪১] আলমুসনাদ, হাদীস নং : ১৬৯৬

[৪৪২] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৩৫৮৫, হাইসামি ﷺ মাজমাউয যাওয়াইদে বলেছেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত।

[৪৪৩] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৬৪০৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৬৯১

আত্মসম্মান থাকলে, জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য সবকিছু ব্যয় করা সহজ। জনৈক সালাফ নিজেকে আল্লাহর কাছ থেকে তিন অথবা চারবার কিনে নিয়েছিলেন। প্রতিবারই তিনি নিজের ওজন সমপরিমাণ রূপা সাদাকাহ করে দেন। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﵁-এর ছেলে আমির ﵀ ছয়বার নিজেকে আল্লাহ থেকে কিনে নিয়ে তার রক্তপণ সাদাকাহ করে দেন। হাবীব আজমি ﵀ নিজেকে আল্লাহর কাছ থেকে চল্লিশ হাজার দিরহামে কিনে নেন। এর পুরোটা তিনি সাদাকাহ করে দিয়েছিলেন। আবূ হুরায়রা ﵁ প্রতিদিন নিজের রক্তপণ হিসেবে বারো হাজার তাসবীহ পাঠ করতেন। এর মাধ্যমে নিজেকে তিনি মুক্ত করতেন।

আরাফার দিনে নেককারদের অবস্থা

অনেকে তো ভীতসন্ত্রস্ত এবং লজ্জিত হয়ে পড়তেন। একবার মুতাররিফ ইবনু আবদিল্লাহ এবং বকর আল-মুযানি ﵀ আরাফায় অবস্থান করছিলেন। তাঁদের একজন দুআয় বলছিলেন, 'ইয়া আল্লাহ! আমার কারণে এখানে অবস্থানকারীদের ফিরিয়ে দেবেন না।' আর অপরজন বলছিলেন, 'আমার মতো হতভাগা না থাকলে এ স্থানের সম্মান এবং এখানে অবস্থানকারীদের প্রত্যাশা কতই-না বেশি হতো!'

ফুযাইল ইবনু ইয়ায ﵀ একবার আরাফায় অবস্থান করছিলেন। লোকেরা তখন দুআ করছিল আর তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। দুআর তুলনায় তাঁর কান্নাই বেশি হয়েছিল। সূর্যাস্তের সময় তিনি আকাশের দিকে মাথা তুলে বললেন, 'আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করে দেন, তবুও আমি লজ্জায় আপনাকে কীভাবে মুখ দেখাব?'

একবার কয়েকজন আল্লাহভীরু ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান করছিলেন। সূর্যাস্তের সময় ঘনিয়ে এলে তাঁরা চিৎকার করে বলতে লাগলেন, আমরা নিরাপত্তা চাই। আমাদের নিরাপত্তা দিন। ফিরে যাওয়ার সময় তো হয়ে গেছে। হায়, অসহায়দের প্রয়োজনের কি ব্যবস্থা হয়েছে সেটা যদি জানতে পারতাম! মহানুভব রাজার কাছে বন্দি নিরাপত্তা চাইলে, তিনি তা দিয়ে থাকেন।

ইবনুল মুবারক ﵀ বলেছেন, আরাফার সন্ধ্যায় আমি সুফইয়ান সাওরির কাছে গেলাম। তখন তিনি হাঁটু গেড়ে বসা ছিলেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। তিনি আমার দিকে খেয়াল করলে আমি বললাম, এই মহাসমাবেশে সবচেয়ে দুর্ভাগা কে? তিনি বললেন, যে এটা ধারণা করে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেননি।

একবার ফুযাইল ﵀ আরাফার সন্ধ্যায় সেখানে উপস্থিত হলেন। লোকদের কান্নাকাটি দেখে পাশের লোকদের বললেন, 'আচ্ছা, এই লোকেরা সবাই মিলে

যদি কোনো এক লোকের কাছে গিয়ে এক দানিক[৪৪৪] চায়, তবে সে ব্যক্তি কি তাদের ফিরিয়ে দেবে?' লোকেরা বলল, না। ফুযাইল ﷺ বললেন, 'ক্ষমা করে দেওয়া, আল্লাহর কাছে কোনো ব্যক্তির পক্ষে এক দানিক প্রদান করার চেয়েও বেশি সহজ।'

খুব শীঘ্রই আপনাদের ভাইয়েরা আরাফায় অবস্থান করবে। অভিনন্দন তাদের প্রতি, যাদের সেই ভাগ্য হয়েছে। তারা তপ্ত হৃদয় এবং বিগলিত অশ্রু নিয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাবে। তাদের মাঝে এমন অনেক ভীত ব্যক্তি আছে ভয় যাদের অস্থির এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে রেখেছে। আছে অনেক আশাবাদী যারা আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে উত্তম ধারণা রেখেছে এবং বিশ্বাস করেছে। অনেক তাওবাকারী আল্লাহর ব্যাপারে সত্য এবং সঠিক ধারণা করেছে। অনেক আশ্রয়প্রার্থী এসে আশ্রয় নিয়েছে আল্লাহর দরবারে। সেখানে এমন অনেক লোক আছে যাদের জন্য জাহান্নাম আবশ্যক হয়ে গিয়েছিল, এরপর আল্লাহ তাদের উদ্ধার করেছেন। গুনাহের বেড়াজালে কত বন্দিকে তিনি দিয়েছেন মুক্তির পয়গাম। সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু তাদের সম্পর্কে খবর রাখেন। তাদের জমায়েত হওয়া নিয়ে আসমানবাসীদের সামনে তিনি গৌরব প্রকাশ করবেন। আরাফায় অবস্থানকারীদের নিকটবর্তী হয়ে তিনি বলবেন, এরা কি চায়?

এই বছর যে আরাফায় অবস্থান করতে পারছে না সে যেন আল্লাহর যেসব হক জানে তা পালনে সচেষ্ট হয়।

মুযদালিফাতে যে ব্যক্তি রাত কাটাতে পারছে না, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করার দৃঢ় সংকল্প করে। তাহলে আল্লাহ তাকে আপন নৈকট্য প্রদান করবেন। মসজিদুল খাইফের কিনারায় অবস্থানের সুযোগ থেকে যে বঞ্চিত হচ্ছে, আশা এবং ভীতি নিয়ে সে যেন আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়। মিনাতে যে কুরবানি করতে পারছে না, সে যেন মৃত্যুর আগে এখানেই নিজের প্রবৃত্তিকে কুরবানি করে দেয়। দূরে থাকার কারণে বাইতুল্লাহতে পৌঁছা যার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, সে যেন বাইতুল্লাহর রবের অভিমুখী হয়। কারণ যে তাঁকে ডাকে এবং তাঁর কাছে আশা রাখে, তিনি তার ধমনী থেকেও কাছে থাকেন।

---

[৪৪৪] এক দিরহামের এক ষষ্ঠাংশকে এক দানিক বলা হয়।

তৃতীয় পর্ব : তাশরীকের দিনগুলো সম্পর্কে

ইমাম মুসলিম ﷺ নুবায়শা আল-হুযালি ﷺ-এর হাদীসে বর্ণনা করেছেন, নবি ﷺ বলেছেন,

«أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ»

'তাশরীকের দিনগুলি পানাহার করা এবং আল্লাহর যিকর করার দিন।'[৪৪৫]

অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও বিভিন্ন সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনি ﷺ একটি দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন,

«إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ»

'পানাহার এবং স্ত্রীসম্ভোগ করার দিন।'[৪৪৬]

মিনার দিনগুলি হলো নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ

'নির্দিষ্ট দিনগুলিতে তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো।'[৪৪৭]

এ দিনগুলি হলো ঈদের পরবর্তী তিনদিন। যাকে তাশরীকের দিনও বলা হয়। ইবনু উমার ﷺ-সহ অধিকাংশ আলিম এ কথাই বলেছেন। ইবনু আব্বাস ﷺ এবং আতা ﷺ-এর মতে, ঈদের দিন-সহ পরবর্তী তিনদিন। মোট চারদিন মিনার দিন। আতা ﷺ এ দিনগুলিকে তাশরীকের দিন বলেছেন। তবে প্রথম বর্ণনাটিই বেশি শক্তিশালী।

আবদুর রহমান ইবনু ইয়ামার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»

'মিনাতে অবস্থানের দিন হলো তিনটি। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় দিনে (সব কাজ শেষে) জলদি প্রত্যাবর্তন করে, তার কোনো গুনাহ হবে না। আর যে ব্যক্তি বিলম্ব করে, তারও কোনো পাপ হবে না।'[৪৪৮]

---

[৪৪৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৪১

[৪৪৬] দারাকুতনি, আসসুনান, হাদীস নং : ২৪০৭, যয়ীফ

[৪৪৭] সূরা বাকারাহ, ২ : ২০৩

[৪৪৮] আবূ দাউদ, আসসুনান, হাদীস নং : ১৯৪৯

ইমাম ইবনু মাজাহ, আবূ দাঊদ, তিরমিযি এবং নাসায়ি ﷺ চারজনই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে উপর্যুক্ত দিন তিনটিই হলো তাশরীকের দিন। দিন তিনটির মাঝে প্রথমটি হলো সর্বোত্তম। কারণ সেদিন মিনাতে অবস্থান করা বাধ্যতামূলক।

আবদুল্লাহ ইবনু কুরত ﷺ থেকে বর্ণিত। নবি ﷺ বলেছেন,

«أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ»

'আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হলো কুরবানির দিন। এরপর তার পরবর্তী দিন।'[৪৪৯]

এরপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সর্বোত্তম দিন হলো পর্যায়ক্রমে মধ্যবর্তী দিন এবং শেষ দিনটি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ

'সুতরাং যে ব্যক্তি দ্বিতীয় দিনে (সব কাজ শেষে) দ্রুত ফিরে যায়, তার কোনো গুনাহ নেই। আর যে ব্যক্তি দেরিতে ফেরে, তারও কোনো পাপ নেই।'[৪৫০]

অধিকাংশ সালাফ বলেছেন, দ্রুত এবং বিলম্বে প্রস্থানকারী উভয়কেই ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদি সে হাজ্জ চলাকালীন অশালীন আচরণ এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকে। এমন ব্যক্তি সদ্য প্রসূত বাচ্চার মতো (নিষ্পাপ) হয়ে ফিরে যায়। এজন্যই শর্তারোপ করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِمَنِ ٱتَّقَىٰ

'যে তাকওয়া অবলম্বন করে।'[৪৫১]

তাহলে বোঝা গেল, এভাবে গুনাহ মাফের জন্য তাকওয়া শর্ত। আর আয়াতটির ব্যাখ্যাই হলো নবি ﷺ-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য,

«مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

[৪৪৯] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ১৯০৭৫

[৪৫০] সূরা বাকারাহ, ২ : ২০৩

[৪৫১] প্রাগুক্ত

'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হাজ্জ করল এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত থাকল, সে ওইদিনের মতো (নিষ্পাপ) হয়ে ফিরবে, যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।'[৪৫২]

এজন্যই এই নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর যিকর করতে আদেশ দিয়েছেন। আর নবি ﷺ বলেছেন,

«أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ»

'তাশরীকের দিনগুলি হলো পানাহার এবং আল্লাহর যিকর করার দিন।'[৪৫৩]

তাশরীকের দিনগুলিতে যিকর-আযকার

- ফরয সালাতের পরে তাকবীর বলা। অধিকাংশ আলিমের মতে, তাশরীকের দিনগুলির সমাপ্তি পর্যন্ত তা বলতে হয়।

- কুরবানির পশু জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নেওয়া এবং তাকবীর বলা। একদল আলিমের মতে, তাশরীকের দিনগুলির শেষ পর্যন্ত কুরবানি দেওয়া যায়।

- পানাহারের শুরুতে আল্লাহর নাম নেওয়া। নিয়ম হলো, পানাহারের শুরুতে আল্লাহর নাম নেওয়া এবং শেষে তাঁর প্রশংসা করা। এ ব্যাপারে নবি ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا»

'আল্লাহ তাআলা তো সে বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, যে খাওয়ার পরে এর জন্য প্রশংসা করে এবং পানীয় পান করার পরেও আল্লাহর প্রশংসা করে।'[৪৫৪]

- তাশরীকের দিনগুলিতে জামরাসমূহে পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলা। এটা অবশ্য হাজিদের সাথে সম্পৃক্ত।

---

[৪৫২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৫২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৩৫০

[৪৫৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৪১

[৪৫৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭৩৪

- সাধারণভাবে আল্লাহ তাআলার যিকর করা। তাশরীকের দিনগুলিতে এ আমল বেশি বেশি করা মুসতাহাব। উমার ﷺ মিনাতে নিজ তাঁবুতে অবস্থান করে তাকবীর বলতেন। তাঁর দেখাদেখি তাকবীর বলতেন অন্যান্যরাও। ফলে গোটা মিনা তাকবীরে গুঞ্জরিত হতো। এ সময়ে যিকর করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

'এরপর যখন তোমরা হাজ্জের কার্যাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেভাবে তোমরা নিজেদের বাপ–দাদাকে স্মরণ করতে। বরং তার চেয়েও বেশি মনোযোগ দিয়ে স্মরণ করবে। সে সময় অনেকে তো বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালেই দান করুন। বস্তুত পরকালে তাদের কোনো অংশ নেই। আবার তাদের মধ্যে অনেকে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।'[৪৫৫]

সালাফদের অনেকেই তাশরীকের দিনগুলিতে এই দুআ করা পছন্দ করতেন। ইকরিমা ﷺ বলেছেন, তাশরীকের দিনগুলিতে এই দুআ করা মুসতাহাব।

আতা ﷺ বলেছেন, হাজ্জ শেষ করে পরিবারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ার সময় তাদের দিকে অভিমুখী হয়ে এ দুআ পড়া উচিত।

এ দুআটি সমস্ত কল্যাণের আধার। নবি ﷺ এ দুআটি বেশি বেশি পড়তেন। বর্ণিত আছে, তাঁর অধিকাংশ দুআতেই এটি থাকত। কোনো দুআ করলে এটিও যুক্ত করে নিতেন।[৪৫৬] কারণ, এ দুআটি উভয় জগতের সব কল্যাণকে অন্তর্ভুক্ত করে।

হাসান ﷺ বলেছেন, দুনিয়াতে কল্যাণ হলো ইলম এবং ইবাদাত আর আখিরাতের কল্যাণ হলো জান্নাত।

সুফইয়ান ﷺ বলেছেন, দুনিয়ার কল্যাণ হলো ইলম এবং উত্তম রিযক।

---

[৪৫৫] সূরা বাকারাহ, ২ : ২০০-২০১

[৪৫৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৬৯০; সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৪৫২২

হাজ্জ শেষে দুআর মর্ম

সব ধরনের ইবাদাতের সমাপ্তি আছে এবং বান্দা তা থেকে অবসর লাভ করে। পক্ষান্তরে আল্লাহর যিকর এমন চিরস্থায়ী আমল, যার না আছে কোনো পরিসমাপ্তি আর না আছে তা থেকে অবসর। বরং এ আমল উভয় জাহানেই চলমান থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

'তারপর সালাত সম্পন্ন করার পরে তোমরা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করো।'[৪৫৭]

সালাতুল জুমুআর ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا

'সালাত সমাপ্তির পরে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো।'[৪৫৮]

সালাতের পরে যিকরের তাগিদ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۝٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ۝٨

'অতএব, অবসর পেলেই পরিশ্রম করুন। এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।'[৪৫৯]

এ থেকে বুঝে আসে, সব আমল থেকেই অবসর হওয়া যায়, কিন্তু যিকর থেকে না। যিকির থেকে না অবসর আছে, আর না আছে তার সমাপ্তি। দুনিয়া ত্যাগ করার সাথে সাথে সব আমলই শেষ হয়ে যায়। আখিরাতে কেবল আমলের বিনিময় পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে যিকরের কখনও সমাপ্তি ঘটে না। মুমিনের জীবন ও মরণ যিকর-নির্ভর। আবার যিকরের সাথেই হবে তার পুনরুত্থান।

মোটকথা, তাশরীকের দিনগুলিতে পানাহারের মতো শরীরের নিয়ামাত যেমন লাভ হয়, তেমনি যিকর এবং শোকরের মতো অন্তরের নিয়ামাতও মিলে। এর মাধ্যমেই

---

[৪৫৭] সূরা নিসা, ৪ : ১০৩

[৪৫৮] সূরা জুমুআ, ৬২ : ১০

[৪৫৯] সূরা ইনশিরাহ, ৯৪ : ৭-৮

নিয়ামাত পূর্ণ হয়ে থাকে। নিয়ামাতের শোকর করাও আরেকটি নিয়ামাত। যার জন্য আরেকটি শোকরের প্রয়োজন পড়ে। এভাবে শোকরের প্রয়োজন কখনও নিঃশেষ হয় না।

তাশরীকের দিনগুলি 'পানাহার এবং আল্লাহর যিকর করার দিন'। এই কথা বলে নবি ﷺ এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, পানাহার আসলে আল্লাহ যিকর এবং তাঁর ইবাদাতে সহায়তার জন্যই হয়ে থাকে। কারণ নিয়ামাতকে ইবাদাতের সাহায্যে কাজে লাগানো হলো নিয়ামাতের পূর্ণাঙ্গ শোকর।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা উত্তম খাবার খেতে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আদেশ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাতকে গুনাহের কাজে লাগায়, সে তো নাফরমান। আল্লাহর নিয়ামাতকে সে কুফরিতে বদলে দেয়। এমন ব্যক্তিকে নিয়ামাত দেওয়ার পরিবর্তে ছিনিয়ে নেওয়াই শ্রেয়।

তাশরীকের দিনগুলিতে চতুষ্পদ জন্তুর গোশত আহারের নিয়ামাত দান করা হয়েছে। কারণ এই জন্তুগুলি আল্লাহর আনুগত্য করে; তাঁর অবাধ্যতা হয় না। তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

'প্রতিটি বস্তুই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে থাকে। কিন্তু তাদের পবিত্রতা এবং মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না।'[৪৬০]

এসব জন্তু আল্লাহকে সিজদাহ করে থাকে। যেমনটা সূরা নাহল[৪৬১] এবং সূরা হাজ্জ[৪৬২] এ আল্লাহ তাআলা বলেছেন। কখনও কখনও তো মানুষের তুলনায় তারা আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে থাকে। এ ব্যাপারে নবি ﷺ বলেছেন,

رُبَّ مَرْكُوبَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَاكِبِهَا، وَأَكْثَرُ ذِكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ

'অনেক বাহন তার আরোহী থেকে উত্তম হয় এবং তার থেকে বেশি আল্লাহর যিকর করে।'[৪৬৩]

---

[৪৬০] সূরা ইসরা, ১৭ : ৪৪

[৪৬১] সূরা নাহল, ১৬ : ৪৯

[৪৬২] সূরা হাজ্জ, ২২ : ১৮

[৪৬৩] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ১৫৬২৯

এছাড়াও কুরআনে আল্লাহ তাআলা অনেক মানুষ এবং জিন সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট।

বান্দাদের জন্য এমন সব পশু জবাইয়ের বৈধতা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, যেগুলো তাঁর অনুগত এবং তাঁর যিকর করে। যেন এগুলোর গোশত আহারেরর মাধ্যমে তাদের শরীরে শক্তি সঞ্চারিত হয় এবং স্বাদ পূর্ণতা পায়। কারণ, এগুলো পুষ্টিকর হওয়ার পাশাপাশি সুস্বাদুও বটে। শাক-সবজির মাধ্যমে দেহ সচল থাকলেও, শক্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং স্বাদ থাকে কেবল মাংসে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এসব প্রাণী জবাই করা এবং সেসবের গোশত আহার করার বৈধতা দিয়েছেন। যাতে করে বান্দার শক্তি এবং বুদ্ধি পূর্ণতা পায়। সুতরাং মুমিনের উচিত এই নিয়ামাত প্রাপ্তির কারণে আল্লাহর শোকর করা। ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া, তাঁর যিকর করা। তিনি আদম-সন্তানকে অনেক সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তেমনি এসব জানোয়ারকে তাদের অনুগত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرۡنَٰهَا لَكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ۝٣٦

'তা থেকে তোমরা নিজেরা খাও। যে অভাবী, মানুষের কাছে হাত পাতে না এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায়, তাদেরকে খেতে দাও। এভাবেই আমি ওগুলিকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।'[৪৬৪]

এ দিনগুলিতে সিয়াম পালনের নিষেধাজ্ঞা এবং পানাহার করার আদেশের একটি সুন্দর তাৎপর্য আছে। আল্লাহর ঘরে আগতদের থাকে সফরজনিত ক্লান্তি, ইহরামের পরিশ্রম এবং হাজ্জ পালনের কষ্ট। তাই কুরবানির দিন এবং এর পরে তাশরীকের তিনদিন মিনাতে অবস্থান করে, আল্লাহ তাদেরকে বিশ্রাম গ্রহণ এবং কুরবানির গোশত খাওয়ার আদেশ দেন। কারণ, তারা আল্লাহ তাআলার মেহমান। এটা বান্দার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া ও মেহেরবানি।

যারা হাজ্জে অংশ নিতে পারেনি, তারাও এ অনুগ্রহের ভাগীদার। কারণ তারাও আল্লাহর ইবাদাত এবং মেহনত করেছিলেন। যুলহিজ্জার প্রথম দশ দিন সিয়াম, যিকর এবং ইবাদাতের অধ্যবসায়ে তারাও শরিক ছিলেন। আল্লাহ তাআলার মাগফিরাত এবং জন্তু জবাইয়ের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জনে তাঁরাও ছিলেন সচেষ্ট। দশটি দিন ইবাদাতে পরিশ্রম সবাই করেছে। তাই ঈদের দিনগুলিতে পানাহার এবং

[৪৬৪] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩৬

বিশ্রাম গ্রহণের ক্ষেত্রে সবাই সমান। এভাবে মুসলমানরা সবাই আল্লাহ তাআলার মেহমানদারি উপভোগ করে। আল্লাহর দেওয়া রিযক খেয়ে তাঁর শোকর আদায় করে। এই সময় সিয়াম পালনে নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো, মেহমানদের ক্ষুধার্ত রাখা মহানুভবের পক্ষে অসমীচীন। যেন মুমিনদের এটা বলা হচ্ছে, আমল শেষে এবার তোমাদের বিশ্রামের পালা। একইভাবে, রমাদান মাসে আল্লাহর জন্য সিয়াম পালন করার পর, ঈদের দিন তাদেরকে সিয়াম ছাড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এ থেকে মুমিনের দুনিয়ার জীবনের প্রতিও ইঙ্গিত লাভ করা যায়। দুনিয়ার জীবন পুরোটাই হলো হাজ্জের দিনগুলির মতো সফরের দিন। এ সময়টাতে বান্দাকে ইহরাম পরিহিত ব্যক্তির মতো হারাম চাহিদা থেকে বেঁচে থাকতে হয়। জীবন-সফর শেষ করে সে যখন মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছায়, সেটা হয় মিনাতে পৌঁছানোর মতো। যেখানে পৌঁছে সে পরিচ্ছন্ন হয় এবং মানত পূর্ণ করে। এরপর মিনাতে থাকা দিনগুলির মতো পানাহার এবং যিকর করে (জান্নাতে) তার সময় কাটাবে। আল্লাহ তাআলার মেহমানদারি সে উপভোগ করতে থাকবে চিরকালের জন্য। এজন্য জান্নাতীদের বলা হবে,

كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓـَٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

‘তোমরা যে আমল করতে তার বিনিময়ে—তৃপ্তি সহকারে খাও এবং পান করো।’[৪৬৫]

كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيٓـَٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

‘পানাহার করো তৃপ্তিভরে, বিগত দিনগুলিতে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।’[৪৬৬]

অবশ্য সিয়াম পালনকারীদের সম্পর্কে এটা নাজিল হয়েছিল বলে বর্ণিত আছে। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি নিজের চাহিদা মেটানো থেকে বিরত থাকবে, মৃত্যুর পরে তার সেই চাহিদা পূরণ হবে। দুনিয়াতে নিষিদ্ধ স্বাদ উপভোগের জন্য যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া করবে, সে জান্নাতের বৈধ স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে। আবদুল্লাহ ইবনু উমার رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ»

[৪৬৫] সূরা তূর, ৫২ : ১৯

[৪৬৬] সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ২৪

'দুনিয়াতে যে শরাব পান করবে, আখিরাতে সে তা থেকে বঞ্চিত হবে।'[৪৬৭]

আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﵁ বক্তৃতাতে নবি ﷺ-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করেছেন,

«مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ»

'দুনিয়াতে যে রেশম পরিধান করবে, আখিরাতে সে তা পরতে পারবে না।'[৪৬৮]

জান্নাত হলো বান্দার আতিথেয়তার জন্য আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত স্থান। সেখানে এমন সব নিয়ামাত আছে, যা বান্দা কখনও চোখে দেখেনি। কোনো কান সেটা শোনেনি, কোনো মানুষ তা কল্পনাও করেনি। আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ঈমান, ইসলাম এবং ইহসানের মাধ্যমে সেই জান্নাতের দিকে আহ্বান করেছেন। এ আহ্বানে যে সাড়া দেবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং আতিথেয়তা ভোগ করতে পারবে। পক্ষান্তরে যে সাড়া দেবে না, সে বঞ্চিত থাকবে।

ইমাম তিরমিযি ﵀ জাবির ﵁-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ একদিন বাইরে এসে বললেন,

«إِنِّي رَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأَنَّ جِبْرِيلَ عِنْدَ رَأْسِي وَمِيكَائِيلَ عِنْدَ رِجْلَيَّ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اضْرِبْ لَهُ مَثَلًا، فَقَالَ: اسْمَعْ سَمِعَتْ أُذُنُكَ وَاعْقِلْ عَقَلَ قَلْبُكَ، إِنَّمَا مَثَلُكَ وَمَثَلُ أُمَّتِكَ كَمَثَلِ مَلِكٍ اتَّخَذَ دَارًا ثُمَّ بَنَى فِيهَا بَيْتًا ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا مَائِدَةً ثُمَّ بَعَثَ رَسُولًا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرَّسُولَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَهُ، فَاللهُ هُوَ المَلِكُ وَالدَّارُ الإِسْلَامُ وَالبَيْتُ الجَنَّةُ وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ رَسُولٌ، فَمَنْ أَجَابَكَ دَخَلَ الإِسْلَامَ، وَمَنْ دَخَلَ الإِسْلَامَ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ دَخَلَ الجَنَّةَ أَكَلَ مَا فِيهَا».

'আমি স্বপ্নে দেখেছি, জিবরীল আমার শিয়রে আর মিকাঈল আমার পায়ের কাছে। একজন অপরজনকে বলছেন, এ ব্যক্তির একটি উদাহরণ দিন। অপরজন বললেন, শুনুন। আর আপনার কান যেন শ্রবণে নিবিষ্ট থাকে, আর আপনার অন্তর যেন যথার্থ উপলব্ধিতে নিয়োজিত থাকে। আপনার এবং আপনার উম্মাতের উপমা এমন, যেন এক সম্রাট একটি মহল

[৪৬৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২০০৩

[৪৬৮] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৫৮৩৩

বানালেন। তারপর তাতে বানালেন কক্ষ। এরপর তাতে রাখলেন খাদ্যভর্তি খাঞ্চা। তারপর লোকদের আহারের দাওয়াত দিতে তিনি একজন ঘোষক পাঠালেন। তাদের একদল দাওয়াত কবুল করল, আরেক দল প্রত্যাখ্যান করল। আল্লাহ তাআলা হলেন সেই সম্রাট। মহলটি হচ্ছে ইসলাম। কক্ষটি হলো জান্নাত। আর হে মুহাম্মাদ! আপনি হলেন সেই ঘোষক। আপনার ডাকে সাড়া দিলে ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করবে। ইসলামে প্রবেশ করা মানে জান্নাতে প্রবেশ করা। আর যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে তাতে যা আছে তা উপভোগ করবে।'[৪৬৯]

ইমাম বুখারি ﷺ এ শব্দে বর্ণনা করেছেন, 'তাঁর উপমা হলো সে ব্যক্তির মতো, যে একটি ঘর নির্মাণ করে সেখানে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করল। এবং (লোকদের ডাকতে) একজন ঘোষক পাঠাল। যারা দাওয়াত কবুল করল, তারা ঘরে প্রবেশ করে খাওয়ার সুযোগ পেল। আর যারা প্রত্যাখ্যান করল, তারা ঘরেও ঢুকতে পারল না আর খাবারও খেতে পারল না। এখানে ঘরটি হলো জান্নাত আর ঘোষক হলেন মুহাম্মাদ ﷺ।'[৪৭০]

সুতরাং মনিবের ডাকে যে সাড়া দিয়েছে, তাকে অভিনন্দন।

يَٰقَوْمَنَآ أَجِيبُوا۟ دَاعِىَ ٱللَّهِ

'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও।'

চতুর্থ পর্ব : বছরের পড়ন্ত বেলা

ইমাম আহমাদ ﷺ জাবির ﷺ-এর সূত্রে নবি ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

«لَا تَمَنَّوْا الْمَوْتَ، فَإِنَّ هَوْلَ الْمَطْلَعِ شَدِيدٌ، وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولَ عُمْرُ الْعَبْدِ، وَيَرْزُقَهُ اللهُ الْإِنَابَةَ».

'তোমরা মৃত্যু কামনা কোরো না। কারণ মৃত্যুর প্রথম ছোবল বড় ভয়াবহ।

[৪৬৯] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ২৮৬০; হাকিম ﷺ আলমুসতাদরাক : ২/৩৬৯ এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪৭০] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৭২৮১

আসল সৌভাগ্য হলো বান্দার আয়ু দীর্ঘ হওয়া এবং আল্লাহ (কর্তৃক) তাঁকে একাগ্রতা দান করা।'[৪৭১]

মৃত্যুকামনার ধরন

১. দুনিয়াবি কষ্টের কারণে।

২. দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কা হলে।

৩. শহীদ হওয়ার সুযোগ মিলে গেলে।

১. দুনিয়াবি কষ্টের কারণে : এ ক্ষেত্রে মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي».

'দুঃখ কষ্টে নিপতিত হওয়ার কারণে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। এমন একটা কিছু যদি করতেই হয়, তাহলে সে যেন বলে—ইয়া আল্লাহ! যতদিন জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয়, আমাকে জীবিত রাখুন। আর আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর হলে, আমাকে মৃত্যু দিন।'[৪৭২]

দুঃখকষ্টে নিপতিত ব্যক্তি মৃত্যু কামনা করে মূলত দ্রুত স্বস্তি লাভের আশায়। অথচ মৃত্যুর পরে কী হবে, সেটা তার অজানা। এমনও তো হতে পারে—মৃত্যুর পরে সে এর থেকেও ভয়ানক মুসিবতের সম্মুখীন হবে। ব্যক্তির অবস্থা তখন যেন কড়াইয়ের গরম থেকে বাঁচতে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো।

নবি ﷺ একবার কাউকে বলতে শুনলেন, অমুক মহিলা মরে গিয়ে স্বস্তি লাভ করেছে। এ কথা অপছন্দ করে তিনি বললেন,

«إِنَّمَا يَسْتَرِيحُ مَنْ غُفِرَ لَهُ».

'আসলে স্বস্তি তো সেই লাভ করেছে, যাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।'[৪৭৩]

এজন্যই মৃত্যু কামনার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার কাছে কল্যাণ চাওয়া উচিত। দরিদ্রতা, সচ্ছলতা প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যে কোনটিতে কল্যাণ আছে, বান্দার তা

[৪৭১] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ১৪৫৬৪, হাসান

[৪৭২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৫৬৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৬৮০

[৪৭৩] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ২৪৭১৩

অজানা। তাই উচিত হলো কল্যাণ সহকারে সেগুলি চাওয়া। অজানা বিষয়ে কল্যাণ আছে কি না, তা জানার জন্য শারীয়াত ইসতিখারার বিধান দিয়েছে। মাগফিরাত, রহমত, ক্ষমা, নিরাপত্তা, হিদায়াত, তাকওয়া ইত্যাদির মতো নিশ্চিত কল্যাণকর জিনিসও আল্লাহর কাছে দৃঢ়তা এবং নিশ্চয়তার সাথে প্রার্থনা করা দরকার।

২. দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কা হলে : এটা জায়িয আছে। অনেক সাহাবি এবং ইসলামের নেতৃস্থানীয় অনেকেই এটা করেছেন। দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কা হলে, মৃত্যু কামনার পাশাপাশি তাঁরা দুআও করতেন। একটি হাদীসে এ দুআ এসেছে,

«وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ»

‘বান্দাদের বিষয়ে আপনি কোনো ফিতনার ইচ্ছা করলে, আমাকে ফিতনামুক্ত অবস্থায় তুলে নিন।’[৪৭৪]

৩. শহীদ হওয়ার সুযোগ মিলে গেলে : এটাও বৈধ। জিহাদের ময়দানে শহীদি মৃত্যু চাওয়া, সাহাবিদের মধ্যে বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। তদ্রূপ সিরিয়াতে মহামারি ছড়িয়ে পড়লে, মুআয ﷺ নিজের এবং পরিবারের জন্য শাহাদাত কামনা করেছিলেন।

জাবির ﷺ-এর বর্ণিত হাদীসটিতে দুটি কারণে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রথমত, মৃত্যুর ছোবল ভয়ানক। মৃত্যুর সময় ব্যক্তির সামনে উন্মোচিত অবস্থার সাথে, দুনিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন : ফেরেশতাদের দেখা, নিজের আমল প্রত্যক্ষ করা, জান্নাত-জাহান্নামের সংবাদ পাওয়া ইত্যাদি। এসব মিলিয়েই ব্যক্তি মৃত্যুর ভয়াবহতার সম্মুখীন হয় এবং তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায়। নবি ﷺ বলেছেন,

«إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، قَالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ».

‘জানাযা খাটে রাখার পর লোকেরা যখন তা কাঁধে বহন করে নেয়, তখন মৃতব্যক্তি নেককার হলে বলতে থাকে : আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাও। আর নেককার না হলে সে বলতে থাকে : হায়! তোমরা একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? মানুষ ছাড়া সবাই তার চিৎকার শুনতে পায়। মানুষ তা শুনলে জ্ঞান

[৪৭৪] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৩২৩৩, সহীহ

হারিয়ে ফেলত।’[৪৭৫]

দ্বিতীয়ত, মুমিন বান্দা বেঁচে থাকলে কেবল কল্যাণই লাভ করতে থাকে। দীর্ঘ হায়াত, আল্লাহ তাআলার প্রতি একাগ্রতা, গুনাহ থেকে তাওবা এবং নেক আমলে সচেষ্ট হওয়া মুমিনের জন্য বিরাট সৌভাগ্যের। এমতাবস্থায় মৃত্যু কামনা করা মানে নেক আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া। এটা সমীচীন নয়। সহীহ বুখারিতে আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ: إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ».

‘তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, সে ভালো লোক হলে (বয়স বেশি পাওয়ার কারণে) তার নেক আমল বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ পাবে। পক্ষান্তরে মন্দ লোক হলে সে লজ্জিত হয়ে তাওবা করার সুযোগ লাভ করবে।’[৪৭৬]

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা ﵁-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا».

‘তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যু আসার আগে যেন এর জন্য দুআ না করে। কারণ, তোমাদের কেউ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। আর মুমিনের আয়ু দীর্ঘায়িত হলে এতে তার কল্যাণই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।’[৪৭৭]

কাজেই যে মুমিন ঈমানের শর্ত পূরণ করে থাকে, বয়স বাড়লে তার শুধু উপকার আর উপকার। এমন ব্যক্তির হায়াত, মৃত্যু অপেক্ষা উত্তম।

নবি ﷺ-এর কাছে উত্তম ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন,

«مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ».

---

[৪৭৫] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৩১৪

[৪৭৬] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৫৬৭৩

[৪৭৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৬৮২

‘যার জীবন দীর্ঘ এবং আমল সুন্দর।’[৪৭৮]

নবি ﷺ দুআতে বলতেন,

«اجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ».

‘আমার জীবনকে প্রতিটি কল্যাণময় কাজের জন্য দীর্ঘায়িত করে দিন। আমার মৃত্যুকে সমস্ত খারাবি থেকে প্রশান্তিকর বানিয়ে দিন।’[৪৭৯]

এ কারণেই দেখা যেত, সালাফে সালিহীনগণ মুমূর্ষু অবস্থায় নেক আমল করতে না পারার দুঃখ করতেন। মুআয ﷺ মুমূর্ষ অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, ‘আমি তো কান্না করছি এ দুঃখে যে, গ্রীষ্মের দুপুরে (সাওম রেখে) আর তৃষ্ণার্ত থাকতে পারব না। শীতের রাতে কিয়াম করতে পারব না। উলামায়ে কেরামের সাথে যিকরের মজলিসে আর বসা হবে না।’

আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ ﷺ মৃত্যুর সময় কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, ‘হায়! আর তো সিয়াম-সালাত আদায় করা হবে না।’ এরপর তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে ইন্তেকাল করলেন।

ইয়াযীদ আর-রাক্কাশি মৃতুশয্যায় কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, ‘রাতের কিয়াম আর দিনের সিয়াম করতে পারব না বলে আমি কান্না করছি।’ তিনি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আরও বললেন, ‘ইয়াযীদ! কে তোমার পক্ষ থেকে সালাত আদায় করবে? সিয়াম পালন করবে কে? কে তোমার পক্ষ থেকে নফল আমল করবে? তোমার গুনাহের জন্য কে তাওবা করে দেবে?’

সালাফদের অনেকে মৃত্যুর সময় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বলতেন, ‘রোজাদাররা সিয়াম পালন করবে, অথচ আমি পারব না। মুসল্লিরা সালাত আদায় করবে, কিন্তু আমি থাকব না। যিকরকারীরা যিকর করবে, অথচ আমার দ্বারা তা হবে না। এ কারণেই আমি কান্না করছি।’

আমল করতে না পারার দুঃখে নেককারদের অবস্থা যদি এমন হয়, তাহলে গুনাহগারের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত? মৃত ব্যক্তিরা তাদের কবরে একবার তাসবীহ অথবা এক রাকাআত সালাত বৃদ্ধি করার জন্য আফসোস করতে থাকে। অনেকে তো এজন্য দুনিয়াতে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়ে ওঠে

[৪৭৮] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ২৩২৯

[৪৭৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭২০

না। আমল আর তাদের মাঝে (মৃত্যু) অন্তরাল হয়ে গেছে।

জনৈক সালাফ বলেছেন, মুমিনের বেঁচে থাকা প্রতিটি দিনই গানীমাতস্বরূপ।

যাপিত জীবন যত দীর্ঘই হোক না কেন, তার স্বাদ চলে যায় এবং রয়ে যায় দায়ভার। মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে গেলে অবস্থা এমন হয়, যেন দুনিয়া ছিলই না কখনও। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ ۝٢٠٥ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۝٢٠٦ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ۝٢٠٧

'আপনি ভেবে দেখুন, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দিই, এরপরে যে বিষয়ে তাদের ভীতি প্রদর্শন করা হতো সেটা তাদের কাছে এসে পড়ে, তখন তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ কোনো কাজে আসবে কি?'[৪৮০]

সালাফদের অনেকে এই আয়াত তিলাওয়াত করে কাঁদতে কাঁদতে বলতেন, মৃত্যু যখন এসে যাবে তখন ভোগ-বিলাসের কিছুই মানুষের কোনো কাজে আসবে না। সহীহ বুখারিতে আছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«أَعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ، حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً»

'আল্লাহ যাকে দীর্ঘ হায়াত দিয়েছেন, এমনকি যাকে ষাট বছরে পৌঁছিয়েছেন, তার ওজর পেশ করার কোনো সুযোগ রাখেননি।'[৪৮১]

সুনানুত তিরমিযিতে বর্ণিত হয়েছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ، إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ»

'আমার উম্মাতের বয়স হলো ষাট থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত। তাদের অল্পসংখ্যকই এটা অতিক্রম করে।'[৪৮২]

যাদের বয়স বিশ হয়েছে, তাদের মতো কতজনই তো মৃত্যুবরণ করেছে! ত্রিশ বছর যাদের হয়েছে, যৌবনে পদার্পণ করার পরও তাদের কি কোনো আক্ষেপ নেই!

[৪৮০] সূরা শু'আরা, ২৬ : ২০৫-২০৭

[৪৮১] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৬৪১৯

[৪৮২] ইবনু মাজাহ, আসসুনান, হাদীস নং : ৪২৩৬

যাদের চল্লিশ বছর চলছে, তারা তো শৈশব পার করে ফেলেছে। এরপরও কিনা তারা খেলাধুলায় মত্ত! পঞ্চাশ বছর যাদের, তারা তো নিজেদের অজান্তেই অর্ধশত পূরণ করে ফেলেছে। ষাট বছর বয়সিরা তো মৃত্যুর কিনারায় দাঁড়িয়ে। এমন সময় খেলাধুলায় লিপ্ত থাকা তাদের সাজে না।

ফুযাইল ﵀ এক ব্যক্তিকে তার বয়স জিজ্ঞেস করলেন। সে জানাল, তার ষাট বছর চলছে। ফুযাইল ﵀ তখন বললেন, 'ষাট বছর ধরে তুমি আল্লাহর দিকে সফর করে চলছ। অচিরেই তোমার সফর সমাপ্ত হবে।'

বয়স পার হলে যে আনন্দিত হয়, সে তো আসলে আয়ু কমলে খুশি হয়ে থাকে।

আবুদ দারদা ﵁ এবং হাসান ﵀ বলেছেন, 'তুমি তো কয়েকটি দিনের সমষ্টি মাত্র। তোমার জীবনের একটি দিন চলে যাওয়া মানে তোমার একটি অংশ চলে যাওয়া।'

জনৈক জ্ঞানী বলেছেন, রাত এবং দিন তোমার জীবনে পালাক্রমে আসছে। রাত তোমাকে দিনের দিকে ঠেলে দেয়, তো দিন ঠেলে দেয় রাতের দিকে। এভাবে মৃত্যু তোমার কাছে চলে আসবে।

সৌরবর্ষের ঋতুগুলোতে করণীয়

প্রথম পর্ব : বসন্তকালের আলোচনা

আবূ সাঈদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ»

'তোমাদের জন্য এ ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করি যে, আল্লাহ জমিনের বরকতসমূহ তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন।'

জমিনের বরকত কী জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন,

«زَهْرَةُ الدُّنْيَا»

'দুনিয়ার চাকচিক্য।'

তখন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, কল্যাণ কি অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে? তখন নবি ﷺ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। আমরা ধারণা করলাম, তাঁর ওপর ওহি নাযিল হচ্ছে। এরপর তিনি কপাল থেকে ঘাম মুছলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, প্রশ্নকারী কোথায়। ব্যক্তিটি বলল, এই যে আমি।

নবি ﷺ তখন বললেন,

«لَا يَأْتِي الخَيْرُ إِلَّا بِالخَيْرِ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ، إِلَّا آكِلَةَ الخَضِرَةِ، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ، فَاجْتَرَّتْ وَثَلَطَتْ وَبَالَتْ، ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ. وَإِنَّ هَذَا المَالَ حُلْوَةٌ، مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ، فَنِعْمَ المَعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي

يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ».

‘কল্যাণ শুধু কল্যাণই বয়ে আনে। এ ধনসম্পদ তো শ্যামল সুমিষ্ট। অবশ্য বসন্ত যে সবজি উৎপাদন করে, তা ভক্ষণকারী পশুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় অথবা নিকটবর্তী করে দেয়। তবে যে প্রাণী ঘাস খায়, রোদ পোহায়, জাবর কাটে, মল-মূত্র ত্যাগ করে এরপর আবার খায়, তার অবস্থা হয় ভিন্ন। ধনদৌলত তো সুমিষ্ট। সৎভাবে গ্রহণ করলে এবং সৎকাজে ব্যয় করলে সেটা ব্যক্তির জন্য হয় উত্তম সাহায্যকারী। আর অন্যায়ভাবে গ্রহণ করলে তার অবস্থা হবে ওই ব্যক্তির মতো, যে (দিনের পর দিন) খেয়েই চলে কিন্তু তৃপ্ত হয় না।’[৪৮৩]

উম্মাতের ব্যাপারে নবি ﷺ-এর আশঙ্কা ছিল যে, দুনিয়ার কর্তৃত্ব দেওয়ার ফলে তারা ফিতনায় পড়ে যাবে। আমর ইবনু আউফ ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, বাহরাইন থেকে সম্পদ এলে আনসারদের উদ্দেশ্যে নবি ﷺ বললেন,

«فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ».

‘তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং যা তোমাদের খুশি করবে তার আশা রাখো। আল্লাহর কসম! তোমাদের ওপর দারিদ্র্য আসবে এ আশঙ্কা আমি করি না। আমি তোমাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা করি, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য দুনিয়া প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল, তোমাদের জন্যও তেমনি দুনিয়া প্রশস্ত হয়ে যাবে। তারপর তাদের মতো তোমরাও প্রতিযোগিতায় মেতে উঠবে। অবশেষে সেটা তাদেরকে যেমন ধ্বংস করে দিয়েছিল, তোমাদেরকেও তেমনি ধ্বংস করে দেবে।’[৪৮৪]

মিম্বরের ওপর নবি ﷺ-এর শেষ বক্তব্য ছিল, দুনিয়ার চাকচিক্য সম্পর্কে সতর্কবার্তা। উকবা ইবনু আমির ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ মিম্বরে উঠে বললেন,

«إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا، وَتَقْتَتِلُوا، فَتَهْلِكُوا، كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ».

[৪৮৩] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৬৪২৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১০৫২

[৪৮৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৯৬১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৬৪২৫

'তোমাদের ব্যাপারে আমি এ আশঙ্কা করি না যে, আমার পরে তোমরা শিরক শুরু করে দেবে। তবে তোমাদের ব্যাপারে আমি দুনিয়ার আশঙ্কা করি যে, এর অর্জনের প্রতিযোগিতায় তোমরা মত্ত হয়ে যাবে। আর পরস্পরে হানাহানি করবে। ফলে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো তোমরাও ধ্বংস হয়ে যাবে।'

উকবা ﵁ বলেছেন, এটাই ছিল মিম্বরের ওপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার শেষ দেখা।[৪৮৫]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ، أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟»

'রোম এবং পারস্য বিজিত হলে তোমরা কোন সম্প্রদায় হবে?' (অর্থাৎ তোমাদের আচরণ কেমন হবে?)

জবাবে আবদুর রহমান ইবনু আউফ ﵁ বললেন, আল্লাহ আমাদেরকে যেমন আদেশ করেছেন, আমরা তা-ই বলব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

«أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، تَتَنَافَسُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ».

'(না,) অন্য কিছু। তখন তোমরা পরস্পর ঈর্ষা করবে, তারপর করবে হিংসা, এরপর সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তারপর করবে শত্রুতা।'

আবূ সাঈদ ﵁-এর বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা

- নবিজি বলেছেন, '...**আল্লাহ জমিনের বরকতসমূহ তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন।**' এর ব্যাখ্যায় নবি ﷺ নিজেই বলেছেন, 'দুনিয়ার চাকচিক্য।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—রোম ও পারস্য-সহ অন্যান্য কাফির সম্রাটদের থেকে এই উম্মাত ঘরবাড়ি, ধনসম্পদ, নদনদী, ফলফলাদি ও খনিজদ্রব্যের মতো বরকতময় জমিনের কর্তৃত্ব লাভ করবে। রোম এবং পারস্যের ধনসম্পদ এবং এলাকাসমূহ বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করা এবং তা বাস্তবায়িত হওয়া নবি ﷺ-এর অন্যতম বড় মুজিযা।

[৪৮৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২২৯৬

নবি ﷺ সেগুলোকে জমিনের বরকত বলে অভিহিত করেছেন। পাশাপাশি উম্মাতের জন্য সেগুলো নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাই শ্রোতাদের কারও কারও কাছে বিষয়টা খটকা লেগেছিল। কারণ বরকত তো কল্যাণকর হয়ে থাকে। তাহলে নবিজি শঙ্কা কেন করছেন?

আল্লাহ তাআলা কুরআনের একাধিক স্থানে সম্পদকে خَيْر তথা কল্যাণ নামে অভিহিত করেছেন। যেমন,

(ক) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (অবশ্যই মানুষ ধনসম্পদের প্রতি প্রবল আসক্ত।)[৪৮৬]

(খ) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ (তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন সে যদি কিছু ধনসম্পদ রেখে যায়, তবে ন্যায়ানুগ পদ্ধতিতে ওসিয়ত করার বিধান তোমাদের দেওয়া হলো।)[৪৮৭]

(গ) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي (তখন সুলাইমান বললেন, আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে সম্পদ-প্রীতিতে মজে গেছি।)[৪৮৮]

- **'কল্যাণ কি অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে?'** এটা জানতে চাইলে নবি ﷺ নিরবতা অবলম্বন করেন। সাহাবিরা ভেবেছিলেন, তখন ওহি নাজিল হচ্ছে। ঘটেওছিল তাই। সহীহ মুসলিমে এক বর্ণনায় এসেছে, 'তারপর তিনি স্বাভাবিক হয়ে নিজের ঘাম মুছে ফেললেন।' ওহি নাজিল হওয়ার সময় এর গুরুভারের কারণে নবিজির কপালে মুক্তার মতো ঘাম জমত। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ওহির বিধান নেই এমন বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে নবি ﷺ ওহির অপেক্ষা করতেন। ওহি নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত সে বিষয়ে কোনো কথা বলতেন না।

ওহি মারফত উত্তর নাযিল হলে নবি ﷺ প্রশ্নকারীকে খোঁজ করে তাকে জানিয়ে দেন যে, 'কল্যাণ শুধু কল্যাণই বয়ে আনে।' এরপর তিনি যথাযথ পদ্ধতিতে সম্পদ গ্রহণকারী ও ব্যয়কারী এবং অন্যায়ভাবে সম্পদ গ্রহণকারী

[৪৮৬] সূরা আদিয়াত, ১০০ : ৮

[৪৮৭] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮০

[৪৮৮] সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ৩২

ও ব্যয়কারীর উদাহরণ প্রদান করেন। সম্পদ প্রথম ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর। এ থেকে বুঝে আসে, সম্পদ নিরঙ্কুশ কল্যাণজনক নয়। বরং শর্তসাপেক্ষে তা কল্যাণময় হয়ে থাকে। মুমিন ব্যক্তি আখিরাতের কাজে সম্পদ লাগালে, তখন সেটা কল্যাণকর হয়; অন্যথায় সেটা ক্ষতিকর।

- সম্পদকে নবি ﷺ **'শ্যামল সুমিষ্ট'** বলেছেন। সম্পদ এবং দুনিয়ার এই বিশেষণ অনেক হাদীসেই বর্ণিত হয়েছে। হাকীম ইবনু হিযাম ﷛ বলেছেন, আমি নবি ﷺ-এর কাছে কিছু চাইলে তিনি দিলেন। আমি আবার চাইলেও তিনি দিলেন। এরপর আমি পুনরায় চাইলাম। তিনি দিয়ে বললেন,

«يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ».

'হাকীম! এই সম্পদ তো শ্যামল সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি প্রশস্ত অন্তরে (লোভ ছাড়া) তা গ্রহণ করে, তার জন্য সেটা বরকতময় হয়। আর যে ব্যক্তি অন্তরের লোভের সাথে তা গ্রহণ করে, তার জন্য সেটা বরকতময় করা হয় না। সে এমন ব্যক্তির মতো হয়, যে খেয়ে চলে কিন্তু তার ক্ষুধা মেটে না।'[৪৮৯]

আবূ সাঈদ খুদরি ﷛ থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ».

'নিশ্চয়ই দুনিয়া সুমিষ্ট শ্যামল। আল্লাহ সেখানে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। তিনি দেখতে চান, তোমরা কী করো। তোমরা দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকো এবং নারী থেকে সাবধান থাকো। কারণ, বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথম ফিতনা দেখা দিয়েছিল নারীকে কেন্দ্র করে।'[৪৯০]

'স্থলাভিষিক্ত' বলে বোঝানো হয়েছে যে, রোম-পারস্যের মতো পূর্ববর্তী জাতির কাছ থেকে নিয়ে এ উম্মাতের হাতে কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এখানে নবি ﷺ উম্মাতকে দুনিয়ার ব্যাপারে, বিশেষত নারীর ব্যাপারে সতর্ক

[৪৮৯] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৪৭২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১০৩৫
[৪৯০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭৪২

করেছেন। কারণ দুনিয়াতে যেসব জিনিসের প্রতি মানুষ আসক্ত হয়, তার প্রথমটিই নারী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

'নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের কাছে সুশোভিত করা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর কাছেই আছে উত্তম আশ্রয়।[৪৯১]

- **'অবশ্য বসন্ত যে সবজি উৎপাদন করে, তা ভক্ষণকারী পশুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় অথবা নিকটবর্তী করে দেয়।'** এ কথা বলে নবি ﷺ দুনিয়ার চাকচিক্য, এখানকার আকর্ষণীয় দৃশ্য, উত্তম নিয়ামাত এবং অন্তরে স্বাদ প্রাপ্তির আরেকটি উদাহরণ দিয়েছেন। বসন্তকালীন উদ্ভিদের দৃশ্য। বসন্তকালে চারণভূমি সবুজ শ্যামল হয়ে থাকে। এই নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে প্রাণীরা খুশি হয়। সুস্বাদু উদ্ভিদ খেতে থাকে। অনেকসময় তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে যায়। ফলে কখনও কখনও পেট ফেটে তার মৃত্যু ঘটে। কিংবা বদহজমের কারণে অসুস্থ হয়ে প্রায় মরতে বসে।

  লোভ আর অন্তরের ক্ষুধা নিয়ে যে ব্যক্তি নির্বিচারে দুনিয়া কামাই করে, এটা হলো তার উদাহরণ। সে ব্যক্তি না অল্পতে তুষ্ট হয়, আর না বেশি পেলে সন্তুষ্ট থাকে। হালাল-হারামের কোনো তোয়াক্কা সে করে না। বরং তার কাছে হালাল সেটাই, যার নাগাল সে পায়। আর হারাম সেটা, যা তার নাগালের বাইরে চলে যায়। এমন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্পদে বেপরোভাবে হস্তক্ষেপ করে। কিয়ামাতের দিন সে আগুন ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

  আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্পদ বলে এমন দৌলত উদ্দেশ্য, যা তাঁদের মর্জিমাফিক খরচ করা এবং হেফাজতে রাখা দায়িত্বশীলের কর্তব্য। যেমন ফাই, গানীমাত, খারাজ, জিযইয়া, সাদাকা, যাকাত ও ওয়াকফের সম্পদ ইত্যাদি।

---

[৪৯১] সূরা আলি ইমরান, ৩:১৪

এখানে একটি সতর্কবার্তা রয়েছে। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সুদের টাকা, লুটের মাল, চোরাই কারবারি, বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি, আমানতের খেয়ানত, অন্যায়ভাবে দাবি করা-সহ অসৎ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ ভোগ করে, জাহান্নামই তার উপযুক্ত ঠিকানা। এ জাতীয় সম্পদের মাধ্যমে ব্যক্তি দুনিয়ার মজা উপভোগ করে, তবে মৃত্যুর পরে তার পেটে কেবল জ্বলন্ত কয়লা ঢুকবে। একারণেই নবি ﷺ হারাম পন্থায় দুনিয়া কামাই এবং অন্যায়ভাবে ব্যয়কারীর তুলনা এমন পশুর সাথে দিয়েছেন, যা বসন্তের সবুজ শ্যামল উদ্ভিদ দেখে লোভ শামলাতে পারে না। মাত্রাতিরিক্ত খেতে খেতে পেট ফেটে মরে যায়। কিংবা এমন বদহজমের শিকার হয় যে, জীবন যেন তার যায় যায়। তেমনিভাবে, হারাম উপার্জন এবং অবৈধ খরচের কারণে ব্যক্তির অন্তর এবং দ্বীনের অপমৃত্যু ঘটে। এমন ব্যক্তি তাওবা এবং সংশোধন ছাড়াই মারা যায়। ফলে তার পরিণতি হয় জাহান্নাম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَٰمُ وَٱلنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾

'যারা কুফরি করে, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো পেট ভরে; জাহান্নামই তাদের বাসস্থান।'[৪৯২]

পক্ষান্তরে মৃতপ্রায় পশুর পুনরায় সুস্থতা লাভ করতে পারে। এর উদাহরণ ওই ব্যক্তি মতো, যে কিনা দুনিয়ার মাতলামি থেকে বিরত হয়ে তাওবা করে নিয়েছে। মৃত্যুর পূর্বেই সংশোধন করেছে আমলকে।

- **'তবে যে প্রাণী ঘাস খায়, রোদ পোহায়, জাবর কাটে, মল-মূত্র ত্যাগ করে এরপর আবার খায়, তার অবস্থা হয় ভিন্ন।'** এই ধরনের প্রাণীকে আলাদা করার দ্বারা নবিজি মধ্যমপন্থি উম্মাতদেরকে বুঝিয়েছেন। যারা কেবল প্রয়োজন পরিমাণ দুনিয়া গ্রহণ করে থাকে। এই অংশ ফুরিয়ে গেলে পুনরায় জরুরত পরিমাণ গ্রহণ করে।

ঘাস খায় এমন প্রাণী নিতান্তই সাধারণ। প্রয়োজন হলে দরকার পরিমাণ ঘাস খায় এরপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রোদ পোহায়, জাবর কাটে এবং ক্ষতিকর বাড়তি অংশ বিসর্জন দিয়ে থাকে। কথিত আছে, আরবদের কাছে ঘাস বসন্তকালীন উদ্ভিদ নয়। বরং গ্রীষ্মকালীন ঘাস শুকিয়ে হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর তা থেকে সৃষ্ট লতা মাত্র। গবাদি পশুর মধ্যে উট সেটা খুব বেশি পরিমাণে আহার করে না। বরং অল্প অল্প খায়। এর ফলে উটের বদহজমও হয় না। দুনিয়া থেকে

[৪৯২] সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১২

মধ্যম পন্থায় গ্রহণকারী মুমিনের অবস্থা এমন হয়ে থাকে। হারাম বাদ দিয়ে নিতান্ত কম হালাল জিনিসও সে কেবল জরুরত পরিমাণই গ্রহণ করে থাকে। দুনিয়ার সাধারণ বস্তুও তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। সাথে থাকা বস্তু নিঃশেষ হওয়া এবং অতিরিক্ত বর্জ্য বেরিয়ে যাওয়ার পরই কেবল পুনরায় গ্রহণ করে থাকে। তাই এই পুনরায় গ্রহণ কোনো রকম ক্ষতি বা ধ্বংসের কারণ হয় না। বরং এটা তার জীবনের পাথেয়, যা দিয়ে সে ইহকালীন এবং পরকালীন জীবনের জন্য আসবাব সংগ্রহ করে থাকে। এই হাদীসে এমন ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়েছে, যে দুনিয়া থেকে হালাল অংশ প্রয়োজন অনুপাতে গ্রহণ করে এবং এতে সন্তুষ্ট থাকে। যেমন অন্য জায়গায় নবি ﷺ বলেছেন,

«قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ»

'অবশ্যই সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি, যে ইসলামগ্রহণ করেছে, তাকে প্রয়োজনমাফিক জীবিকা প্রদান করা হয়েছে এবং তাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন তা নিয়ে সে সন্তুষ্ট থেকেছে।'[৪৯৩]

কুরআনের চোখে দুনিয়া

কুরআনে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া, সবুজ গাছপালা, সজীবতা, দ্রুত পরিবর্তন এবং বিলীন হওয়ার উদাহরণ এনেছেন। বৃষ্টির মাধ্যমে উৎপন্ন উদ্ভিদ এবং তার পরিণতির সাথে দুনিয়ার উপমা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾

'তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা হলো পানির মতো, যা তিনি আকাশ হতে বর্ষণ করেন, যা দিয়ে যমীনে গাছ-গাছড়া ঘন হয়ে উদ্গত হয়। অতঃপর তা শুকনো খড়কুটায় পরিণত হয়, যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ হলেন সকল বিষয়ে শক্তিমান।'[৪৯৪]

---

[৪৯৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১০৫৪

[৪৯৪] সূরা কাহফ, ১৮ : ৪৫

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَٰمُ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَٰدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَٰهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

'আসলে পার্থিব জীবনের উদাহরণ এমন, যেমন আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, যা দ্বারা ভূমিজ লতাপাতা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উৎপন্ন হয়। তা থেকে মানুষ ও জীবজন্তু খেয়ে থাকে। এমনকি জমিন যখন সৌন্দর্যে ভরে উঠে এবং নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারীরা মনে করে, এগুলো তাদের আয়ত্তাধীন। তখন তার প্রতি আমার নির্দেশ এসে পড়ে রাতে বা দিনে। আর সেগুলোকে আমি এমনভাবে নির্মূল করে দিই, যেন গতকালও তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এভাবে নিদর্শনাবলি আমি বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি চিন্তাশীল লোকদের জন্য।'[৪৯৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا ۖ وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

'জেনে রেখো, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহমিকা, ধনসম্পদ এবং সন্তানসন্ততির প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তার উপমা বৃষ্টি, যা দ্বারা উৎপন্ন সবুজ ফসল কৃষকদের চমৎকৃত করে। এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তা খড়কুটায় পরিণত হয়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা আর সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়।'[৪৯৬]

---

[৪৯৫] সূরা ইউনুস, ১০ : ২৪

[৪৯৬] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২০

বসন্তের সৌন্দর্য, শোভা এবং চাকচিক্যের মতোই যৌবনের পরিধিও সংক্ষিপ্ত। ফসল পেকে গেলে কাটার সময় হয়। তেমনি স্বাস্থ্য কমে যাওয়া এবং চুলে পাক ধরার মাধ্যমে বার্ধক্যের সময় ঘনিয়ে এসেছে বোঝা যায়।

প্রকৃতি কী আভাস দিয়ে যায়

শীতকালে সবকিছু শুকিয়ে যাওয়ার পর, বসন্তকালে পুনরায় লতাপাতা গজায়। সবুজশ্যামল হয়ে যায় চারিদিক। ফুলে ফুলে ছেয়ে যেতে থাকে গাছপালা। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃতদের পুনরায় জীবিত করা হবে। কুরআনের অনেক স্থানেই আল্লাহ তাআলা এ কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন,

وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۝٥ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝٦ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِى ٱلْقُبُورِ ۝٧

'ভূমিকে আপনি শুষ্ক দেখতে পান, তারপর আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্য শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। এবং উৎপন্ন করে সব ধরনের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। এটা এ কারণে যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতা রাখেন। আর কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর কবরে যারা আছে, তাদেরকে আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন।'[৪৯৭]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَٰرَكًا فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ جَنَّٰتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ۝٩ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۝١٠ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ ۝١١

'আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করে তা দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পাকা শস্য এবং সমুন্নত খেজুরগাছ। যাতে আছে থোকায় থোকায় খেজুর, আমার বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ। আর বৃষ্টি দিয়ে আমি মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করে থাকি। এভাবে (তাদের) পুনরুত্থান ঘটবে।'[৪৯৮]

---

[৪৯৭] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৫-৭

[৪৯৮] সূরা ক্বাফ, ৫০ : ৯-১১

আরেক জায়গায় বলা হয়েছে,

وَهُوَ ٱلَّذِى يُرۡسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ بُشۡرَۢا بَيۡنَ يَدَىۡ رَحۡمَتِهِۦۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَقَلَّتۡ سَحَابٗا ثِقَالٗا سُقۡنَـٰهُ لِبَلَدٖ مَّيِّتٖ فَأَنزَلۡنَا بِهِ ٱلۡمَآءَ فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِۚ كَذَٰلِكَ نُخۡرِجُ ٱلۡمَوۡتَىٰ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ۝٥٧

'তিনিই বৃষ্টির আগে সুসংবাদবাহী বাতাস পাঠান। বাতাস যখন পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন এ মেঘমালাকে আমি একটি নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি। পরে এ মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি। তারপর এর মাধ্যমে আমি সব রকমের ফল–ফলাদি উৎপাদন করি। এভাবে আমি মৃতদের জীবিত করব, যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ করো।'[৪৯৯]

ফল-ফসল উৎপন্ন হওয়ার পর জমিন শুকিয়ে যায়। একেবারে স্বল্প সময়ের ব্যাবধানে। এর পরিণিতি—মাটি থেকে সৃষ্টি হওয়া আদম সন্তানের পুনরায় মাটিতে ফিরে যাওয়ার মতোই।

- গ্রীষ্মকালে গরম স্মরণ করিয়ে দেয় জাহান্নামের উত্তাপের কথা। জাহান্নামের আগুন থেকেই তো গ্রীষ্মের উৎপত্তি।
- শীতকালের কনকনে হাওয়ায়, জাহান্নামের তীব্র ঠান্ডার কথা স্মরণ হয়। সেখান থেকেই উৎপত্তি ঘটে শীতের।
- শরৎকালে ফলফলাদি পরিপক্ক হয় এবং সেগুলো সংরক্ষণ করা হয় ঘরে। এথেকে বোঝা যায়, আমলের ফলাফল আখিরাতে লাভ হবে।
- বসন্ত হলো ঋতুরাজ। এর মাধ্যমে জান্নাতের নিয়ামাত এবং উত্তম জীবনের কথা স্মরণ হয়। সুতরাং মুমিনের উচিত নেক আমলের মাধ্যমে জান্নাত তালাশের প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

  জনৈক সালাফের অভ্যাস এমন ছিল যে, ফলফলাদি পাকার মৌসুমে তিনি বাজারে যেতেন। শিক্ষা গ্রহণের জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেগুলো দেখতেন এবং আল্লাহর কাছে জান্নাত চেয়ে দুআ করতেন।

শিক্ষাগ্রহণের জন্য বসন্তকালে শুকিয়ে যাওয়া রুক্ষ জমিনের দিকে লক্ষ করে দেখা উচিত—কিভাবে আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে বর্ষিত বৃষ্টির পানি দিয়ে তাকে সজীব করে তোলেন। এভাবে, গুনাহের কারণে মৃত এবং উদাসীন অন্তরকেও

[৪৯৯] সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫৭

আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে অবতীর্ণ উপদেশের মাধ্যমে সজীব করে থাকেন। এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

'আল্লাহর স্মরণ এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার কারণে মুমিনদের হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি? তারা যেন সেসব লোকের মতো না হয়, যাদেরকে অতীতে কিতাব দেওয়া হয়েছিল এরপর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরে তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেছে। যাদের অধিকাংশই পাপাচারী। জেনে রেখো, ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন আল্লাহই দিয়ে থাকেন। আমি পরিস্কারভাবে তোমাদের জন্য নিদর্শনগুলো ব্যক্ত করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।'

এখানে বোঝানো হয়েছে, মুষলধারে বৃষ্টি দিয়ে যিনি ভূমিকে পুনরায় জীবিত করে থাকেন, তিনি তো মৃত এবং কঠোর হৃদয়কে উপদেশের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম।

মৃত ভূমিকে বৃষ্টি দিয়ে যিনি জীবিত করেন, যিকরের মাধ্যমে তিনি মৃত অন্তরকে জীবিত করে দেবেন। কারণ, তিনি দয়াময়, মহানুভব। আশা করা যায়, তাঁর রহমতের হাওয়া বয়ে যাবে। যার গায়ে সেই বাতাস লাগবে, সে আর কখনোই দুর্ভাগা হবে না। কারণ, তিনি তো অনুগ্রহশীল, চিরদয়াময়।

দ্বিতীয় পর্ব : গ্রীষ্মকালের আলোচনা

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি সা. বলেছেন,

«اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهْوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ».

'জাহান্নামের আগুন আল্লাহর কাছে অভিযোগ জানিয়ে বলল, ইয়া রব! আমার একাংশ আরেকাংশকে খেয়ে ফেলছে। আল্লাহ তখন তাকে দুটি নিঃশ্বাসের অনুমতি দিলেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে এবং আরেকটি নিঃশ্বাস গ্রীষ্মকালে। এ কারণেই তোমরা গ্রীষ্মের প্রখরতা ও (শীতে) ঠান্ডার তীব্রতা অনুভব করে থাকো।'[৫০০]

বান্দার আমলের বদলা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা দুটি স্থান নির্ধারণ করেছেন। (অর্থাৎ, জান্নাত ও জাহান্নাম)। আর একটি স্থান বানিয়েছেন আমল করার জন্য—(দুনিয়া)। দুনিয়াতেই জীবন-মৃত্যু নির্ধারণ করে রাখা আছে। আদেশ এবং নিষেধের মাধ্যমে বান্দাকে এখানে তিনি পরীক্ষা করে থাকেন। গায়েব এবং প্রতিদান দিবসের ওপর ঈমান আনার দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে কিতাব এবং রাসূল পাঠিয়ে, গায়েব এবং জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এমন সব প্রমাণ আর নিদর্শন তিনি দেখিয়েছেন, যার দ্বারা নির্ধারিত স্থান দুটির অস্তিত্ব সাব্যস্ত হয়। এর একটি কেবল নিয়ামাত দ্বারা পরিপূর্ণ, যেখানে যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই। অপরটি বেদনায় পরিপূর্ণ, শান্তির ছোঁয়াও সেখানে নেই। আর এই নশ্বর দুনিয়াতে নিয়ামাত ও বেদনা দুটিই মিলেমিশে আছে। এখানে থাকা নিয়ামাত জান্নাতের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর বেদনা স্মরণ করিয়ে দেয় জাহান্নামের যন্ত্রণার কথা। দুনিয়াতে আল্লাহ এমন অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন, যা পরকালের কথা জানান দেয়। জান্নাত ও জাহান্নামের কথা মনে করিয়ে দেয়, এমন অনেক কিছুই এখানে আছে। স্থান, সময়, বস্তু ইত্যাদি অনেক কিছুই আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, যা জাহান্নাম এবং সেখানকার শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

দুনিয়ার সবকিছুই আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের প্রমাণ। তাঁর গুণাবলির নিদর্শন। সে হিসেবে এখানে থাকা সুখ, শান্তি ও আরাম আল্লাহ তাআলার মহত্ব, অনুগ্রহ ও উদারতার প্রমাণ বহন করে। এখানকার দুঃখ, কষ্ট আর যন্ত্রণা তাঁর কঠোর শাস্তি, পাকড়াও এবং আযাবের প্রমাণ। শীত-গ্রীষ্ম এবং রাত-দিনের মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এটা প্রমাণ করে যে, দুনিয়া খুব দ্রুতই নিঃশেষ হয়ে যাবে। জাহান্নামের আগুনের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো দুনিয়ার আগুন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

نَحْنُ جَعَلْنَٰهَا تَذْكِرَةً

---

[৫০০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৬১৮; সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৫৩৭

'আমি তাকে নিদর্শন বানিয়েছি।'[৫০১]

দুনিয়ার আগুনকে আল্লাহ তাআলা আখিরাতের আগুনের নিদর্শন বানিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ কামারের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে যেতেন। আগুন থেকে লোহা বের করার দৃশ্য দেখে কান্না করতেন। উয়াইস ﷺ দাঁড়িয়ে থাকতেন কামারের কাছে। হাপরে বাতাস দিলে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে আসে—এটা দেখে তিনি চিৎকার দিয়ে মূর্ছা যেতেন। সালাফদের অনেকেই কামারের কাছে গিয়ে কাজকর্ম দেখতেন। আর কাঁদতে কাঁদতে জাহান্নাম থেকে পানাহ চাইতেন আল্লাহর কাছে। উমার ﷺ বলতেন, 'জাহান্নামকে বেশি বেশি স্মরণ করো। কারণ তার উত্তাপ খুব ভয়ানক, গভীরতা অনেক বেশি। সেখানকার মুগুর হলো লোহার।'

ইবনু উমার ﷺ-সহ সালাফদের অনেকেই ঠান্ডা পানি পান করার সময় কান্না করতেন। তারা স্মরণ করতেন জাহান্নামীদের চাহিদার কথা। জাহান্নামীরা ঠান্ডা পানি খেতে চাইবে, কিন্তু তাদের চাওয়া পূরণ হবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ أَنۡ أَفِيضُواْ عَلَيۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ أَوۡ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُۚ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ۝٥٠

'জাহান্নামীরা জান্নাতবাসীদের ডেকে বলবে, আমাদের ওপর সামান্য পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ জীবিকা হিসেবে তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে কিছু দাও। তারা বলবে, আল্লাহ তো এই দুটি বস্তু কাফিরদের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন।'[৫০২]

সবচেয়ে বড় বিপদ তো তখন হবে, যখন জাহান্নামের আগুন সেখানে থাকা লোকদের ঢেকে নেবে। ফলে তারা নাজাতের ব্যাপারে হতাশ হয়ে যাবে। এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে জান্নাতবাসীরা নিরাপদ থাকবে। আল্লাহ তাআলার কাছে আগে থেকেই তাদের জন্য কল্যাণ নির্ধারিত করা আছে। তাদেরকে সরিয়ে রাখা হবে এমন ভয়াবহ অবস্থা থেকে।

---

[৫০১] সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৭৩

[৫০২] সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫০

তৃতীয় পর্ব : শীতকালের আলোচনা

আবূ সাঈদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, নবি সা. বলেছেন,

«الشِّتَاءُ رَبِيعُ الْمُؤْمِنِ»

'শীতকাল মুমিনের জন্য বসন্ত।'[৫০৩]

বায়হাকি ﵀-সহ অন্য আরও কয়েকজন মুহাদ্দিস এইটুকু বাড়তি এনেছেন,

«قَصُرَ نَهَارُهُ فَصَامَ وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ»

'(শীতকালে) দিন ছোট হওয়ায় তাতে সিয়াম এবং রাত দীর্ঘ হওয়ায় তাতে কিয়াম করতে পারে।'[৫০৪]

শীতঋতু মুমিনের জন্য বসন্তকাল। কারণ, মুমিন ব্যক্তি তখন নির্বিঘ্নে ইবাদাত করতে পারে। আর স্বস্তিতে আমল করতে পেরে তার মন উৎফুল্ল হয় ওঠে। গবাদি পশু যেমন বসন্তকালে খেয়েদেয়ে মোটাতাজা হয়, তেমনিভাবে মুমিনও শীতকালে ইবাদাতে মশগুল হতে পারে। আল্লাহ তাআলার তাদেরকে এই সুযোগ করে দেন। শীতকালে সিয়াম পালন করলে ক্ষুধার কষ্ট এবং পিপাসার বেগ পেতে হয় না। কারণ সে-সময় দিন ছোট হয় আর আবহাওয়া থাকে শীতল। আবূ হুরায়রা রা লোকদের উদ্দেশ্যে বলতেন, 'ঠান্ডা গানীমাত সম্পর্কে তোমাদের বলব না?' শ্রোতারা আগ্রহ ব্যক্ত করলে তিনি বলতেন, 'শীতকালে সিয়াম পালন করা।'

শীতকালে এমন সুযোগ, কোনো লড়াই কিংবা সংগ্রাম ছাড়াই অর্জিত হয়। আনায়াসেই সবাই তা লাভ করে। তাই একে ঠান্ডা গানীমাত বলার হয়েছে। শীতের রাত দীর্ঘ হওয়ার কারণে প্রয়োজন পরিমাণ ঘুমিয়ে তারপর সালাত আদায় করা যায়। সালাত আদায়কারী বেশ নির্বিঘ্নে কুরআন পড়তে পারে। নির্দিষ্ট ওয়াযীফা আদায়ের পাশাপাশি প্রয়োজন পরিমাণ ঘুম পূর্ণ হয়ে যায় বলে দ্বীনি এবং দুনিয়াবি উভয় ধরনের চাহিদাই পূর্ণ হয়।

ইয়াহইয়া ইবনু মুআয ﵀ বলতেন, 'রাত দীর্ঘ, ঘুমিয়ে সেটাকে সংক্ষিপ্ত করো না। ইসলাম পরিচ্ছন্ন, গুনাহের মাধ্যমে তাকে নোংরা করো না।'

পক্ষান্তরে গ্রীষ্মকালীন রাতের কথা ভিন্ন। ওটা সংক্ষিপ্ত আর গরম। তাই পূর্ণ রাত

[৫০৩] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ১১৭১৬
[৫০৪] বায়হাকি, আসসুনানুল কুবরা, হাদীস নং : ৮৪৫৬

(এপাশ-ওপাশ করে) কাটানো ছাড়া মনের অন্য কোনো ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না। ফলে তাতে ইবাদাত করতে গেলে বাড়তি পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ে। নির্দিষ্ট ওয়াযীফা আদায় করার ফুরসতও অনেকসময় হয় না।

ইবনু মাসঊদ ﵁ বলতেন, 'শীতকালকে অভিনন্দন। তাতে বরকত নাযিল হয়, রাতে কিয়াম করার সুযোগ থাকে আবার দিনেও সিয়াম পালন সহজ হয়।' এ কথাটি তাঁর থেকে মারফূভাবে বর্ণিত হয়েছে বলা হলেও আদতে তা সঠিক নয়।

হাসান ﵀ বলতেন, 'মুমিনের জন্য শীতকাল বড় উত্তম সময়। রাত দীর্ঘ থাকে বলে কিয়াম করা যায়, আবার দিন ছোট দেখে সিয়ামও রাখা যায়।'

শীতকাল এলে উবাইদ ইবনু উমাইর বলতেন, 'হে কুরআনের অধিকারীগণ! তিলাওয়াত করার জন্য রাতকে দীর্ঘ আর সিয়াম পালনের জন্য দিনকে সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সিয়াম এবং কিয়ামে মনোনিবেশ করো।'

শীতের রাতে কিয়াম করা নফসের জন্য কষ্টকর হয় দু'ভাবে।

১. প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে বিছানা ছেড়ে ওঠা।

২. পরিপূর্ণভাবে ওজু করা।

প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ওজু করা অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল। আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বললেন,

«أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟»

'তোমাদের কি আমি এমন (কাজের) কথা বলব না, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা পাপরাশি দূর করে মর্যাদা বুলন্দ করে দেবেন?'

তখন সাহাবিগণ বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই ইয়া রাসুলাল্লাহ! নবি ﷺ বললেন,

«إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ»

'অসুবিধা এবং কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে ওজু করা, মাসজিদে আসার জন্য বেশি বেশি পা ফেলা এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। জেনে রাখো, এটাই হলো রিবাত।'[৫০৫]

---

[৫০৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৫১

একটি হাদীসে নবি ﷺ-এর সাথে আল্লাহ তাআলার আলাপচারিতা বর্ণিত হয়েছে। মুআয ইবনু জাবাল ؓ এটি বর্ণনা করেছেন। নবি ﷺ বলেছেন,

قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي رَبِّ، قَالَهَا ثَلَاثًا " قَالَ: " فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: فِي الكَفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُنَّ؟ قُلْتُ: مَشْيُ الأَقْدَامِ إِلَى الجَمَاعَاتِ، وَالجُلُوسُ فِي المَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وَإِسْبَاغُ الوُضُوءِ فِي المَكْرُوهَاتِ، قَالَ: ثُمَّ فِيمَ؟ قُلْتُ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَلِينُ الكَلَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.»

আল্লাহ বললেন, ফেরেশতাদের সর্বোচ্চ পরিষদে কী নিয়ে আলোচনা হচ্ছে? আমি বললাম, ইয়া রব! আমি তো জানি না। আল্লাহ তাআলা তিনবার উক্তিটি করলেন। নবি ﷺ বলেন, এরপর তিনি আমার দুই কাঁধের মাঝে তাঁর হাত রাখলে, আমার বুকে তাঁর আঙুলের শীতলতা অনুভব করলাম। এতে প্রতিটি বস্তু আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সব আমি চিনে নিলাম। এবার তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম, ইয়া রব! বান্দা হাজির। তিনি বললেন, 'ফেরেশতাদের সর্বোচ্চ পরিষদে কী নিয়ে আলোচনা হচ্ছে? আমি বললাম, গুনাহের কাফফারা নিয়ে। তিনি বললেন, সেগুলো কী? আমি বললাম, জামাআতের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে যাওয়া, সালাতের পর মাসজিদে অবস্থান করা এবং কষ্টের সময়ও পরিপূর্ণভাবে ওজু করা। তিনি বললেন, এরপর কী বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে? আমি বললাম, খাবার খাওয়ানো, নরম কথা বলা, মানুষ যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত (তথা তাহাজ্জুদ) আদায় করা।'[৫০৬]

কোনো কোনো বর্ণনাতে ভিন্ন শব্দে إسباغُ الوضوءِ في السَّبَرَاتِ বর্ণিত হয়েছে। যার অর্থ 'প্রচণ্ড শীতে পরিপূর্ণভাবে ওজু করা।' তাহলে বোঝা গেল, প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যেও পরিপূর্ণভাবে ওজু করা ঈমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চতুষ্পদ জন্তুর পশম, লোম এবং চুলের মাধ্যমে শীত নিবারণের ব্যবস্থা করে বান্দার প্রতি আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَٱلْأَنْعَٰمَ خَلَقَهَاۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَٰفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

---

[৫০৬] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৩২৩৫, সহীহ।

‘আর চতুষ্পদ জন্তুগুলো তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাতে রয়েছে উষ্ণতার উপকরণ ও বিবিধ উপকার। আর তা থেকে তোমরা আহার গ্রহণ করো।’[৫০৭]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَٰثًا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾

‘চতুষ্পদ জন্তুর পশম, লোম এবং চুল দিয়ে তিনি এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আসবাবপত্র ও ব্যবহারের সামগ্রী তৈরি করে দিয়েছেন।’[৫০৮]

ইবনুল মুবারক ﷬ বর্ণনা করেছেন, উমার ইবনুল খাত্তাব ﷛ শীতকাল এলে সকলের প্রতি খেয়াল রাখতেন এবং উপদেশ দিয়ে এভাবে ফরমান জারি করতেন; ‘শীতকাল তো এসে পড়েছে। এতে তোমাদের ক্ষতি হবে। পশমি কাপড়, চামড়ার মোজা ইত্যাদির মাধ্যমে শীত মোকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করো। পশম দিয়ে ভিতর এবং বাইরের আবরণ বানিয়ে নাও। নয়তো ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। ঠান্ডা লাগে দ্রুত, কিন্তু উপশমে হয় দেরিতে।’

উমার ﷛-এর খিলাফতকালে শাম বিজিত হলে সেখানে থাকা সাহাবি এবং অন্যান্যদের ব্যাপারে এমনই একটি ফরমান তিনি লিখেছিলেন। কারণ ঠান্ডার ব্যাপারে যাদের কোনো রকম অভিজ্ঞতা নেই, শামে তাদের কষ্ট হতে পারে। এটা ছিল অধীনস্থদের প্রতি উমার ﷛-এর হামদর্দি, সুনজর, স্নেহ এবং জিম্মাদারির নিদর্শন।

অবশ্য শারীয়াত এমনটা বলে না যে ঠান্ডা থেকে এমনভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে, যাতে একেবারেই ঠান্ডা না লাগে। কারণ এমন করাটা ক্ষতিকর। জনৈক শাসক ঠান্ডা এবং গরম থেকে শরীরকে সম্পূর্ণভাবে বাঁচিয়ে চলতেন। ফলে শরীরের অভ্যন্তর ভাগ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে তার মৃত্যু ঘটে। দেহরস মুক্ত হওয়ার জন্য উষ্ণতা এবং জমাট বাঁধার জন্য শীতলতা প্রয়োজন। উষ্ণতা এবং শীতলতা না পেলে শরীর দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি এ দুটির ক্ষতিও রয়েছে। কারণ ক্ষতিকর উত্তাপ এবং ঠান্ডা দুটোই মানবদেহের জন্য চরম বিপজ্জনক।

---

[৫০৭] সূরা নাহল, ১৬ : ৫

[৫০৮] সূরা নাহল, ১৬ : ৮০

জান্নাতে অবস্থানকারীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾

'সেখানে তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে। বেশি গরম বা বেশি শীত সেখানে অনুভব করবে না।'[৫০৯]

এখানে নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশের কথা বলা হয়েছে। কাতাদা ﵀ বলেছেন, 'অধিক গরম এবং অধিক শীত দুটোই ক্ষতিকর। সেই জন্য আল্লাহ তাআলা দুটো থেকেই তাদের রক্ষা করবে।'

'সইফ' মূলত বসন্তকাল। যে সময়টাকে 'সইফ' ডাকা হয়, সেটাকে আরবিতে 'কইয' বলা হয়ে থাকে। কারণ শীতকালে উত্তাপ গাছের ভেতরে ঢুকে গিয়ে তৈরি হয় ফলের মূল উপকরণ। তারপর বসন্তকালে তার প্রাথমিক অবস্থা প্রকাশ পায়। তখন গাছে ফুল ধরে, পাতা বের হয়, এরপর ফল ধরার পরে তা পরিপক্ক করার জন্য প্রয়োজন সূর্যের তাপ।

শীতকালে দরিদ্রদের শীতনিবারক পণ্য দেওয়া অনেক ফযীলতের বিষয়। একবার জনৈক নেককার মন্ত্রীর কাছে খবর পৌঁছল, একজন মহিলা চারটি ইয়াতীম সন্তান নিয়ে অভাবে দিন যাপন করছে। তাদের কাছে না আছে পরনের কাপড়, না আছে খাবার। এ কথা শুনে মন্ত্রী তাদের কাছে প্রয়োজনীয় অন্ন, বস্ত্র পৌঁছানোর নির্দেশ দিলেন। আর নিজের পরনের কাপড় ছিঁড়ে ফেললেন। এরপর শপথ করে বললেন, তাদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা হয়েছে এটা জানার আগ পর্যন্ত আমি কোনো কাপড় পরব করব না। দূত সেই মহিলা এবং তার সন্তানদের কাপড় এবং খাবারের ব্যবস্থা করে ফিরে এল। এসে মন্ত্রীকে অবহিত করলেন। মন্ত্রী তখন শীতে কাঁপছিলেন। খবর পেয়ে অবশেষে তিনি কাপড় পরিধান করলেন।

শীতকালের একটা বিশেষত্ব হলো, এর মাধ্যমে জাহান্নামের হিমশীতল অবস্থার কথা স্মরণ হয় এবং তা থেকে পানাহ চাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের কথা উল্লেখ করে বলেন,

لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾

'সেখানে তারা কোনো শীতল (অবস্থা) ও পানীয় আস্বাদন করবে না, ফুটন্ত পানি ও গাসসাক ছাড়া।'[৫১০]

---

[৫০৯] সূরা ইনসান, ৭৬ : ১৩

সূরা নাবা, ৭৮ : ২৪-২৫

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾

‘এসব (আল্লাহদ্রোহীদের জন্য), কাজেই সেখানে তারা পান করুক ফুটন্ত পানি ও গাসসাক।’[৫১১]

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, ‘গাসসাক’ হলো এমন হিমশীতল পানি, যা অঙ্গ ভস্ম করে দেয়। মুজাহিদ ﷺ-এর মতে ‘গাস্‌সাক’ এমন পানীয়, ঠান্ডার তীব্রতার কারণে যা মুখে নেওয়াই সম্ভব হবে না। কার কারও মতে, ‘গাস্‌সাক’ হবে হিম শীতল এবং দুর্গন্ধযুক্ত।[৫১২] এটা থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করুন।

জাহান্নামের বিবরণ যাকে শোনানো হয়েছে, যার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারপরও সে জেনেবুঝে সেখানে যাওয়ার মতো দুঃসাহস কিভাবে করতে পারে? অচিরেই জাহান্নামকে যখন সত্তর হাজার লাগাম পরিয়ে টেনে আনা হবে, তখন সে ঠিকই অনুতপ্ত হবে। আপনি কি পারবেন, জাহান্নামের আগুন আর হিমশীতলতা সহ্য করতে?

---

[৫১১] সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ৫৭

[৫১২] ভাষাবিদগণ এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এর একটি অর্থ হচ্ছে, শরীর থেকে বের হয়ে আসা রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি নোংরা পদার্থ। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, অত্যন্ত ও চরম ঠান্ডা জিনিস। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, চরম দুর্গন্ধযুক্ত পচা জিনিস। কিন্তু প্রথম অর্থেই এ শব্দটির সাধারণ ব্যবহার হয়। বাকি দুটি অর্থও আভিধানিকভাবেও শুদ্ধ।

পরিশিষ্ট : তাওবার আলোচনা

মৃত্যুর আগেই তাওবা করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তাওবা সারা জীবনের আমল। ইবনু উমার ﵄ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ»

'রুহ কণ্ঠাগত না হওয়া পর্যন্ত, বান্দার তাওবা আল্লাহ অবশ্যই কবুল করে থাকেন।'[৫১৩]

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, বান্দার রূহ কণ্ঠনালিতে পৌঁছার আগ পর্যন্ত আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে নেন। কুরআন থেকেও এমনটা জানা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْۗ

'আল্লাহ অবশ্যই সেসব লোকের তাওবা কবুল করেন, যারা মন্দ কাজ **অজ্ঞতাবশত** করে এরপর **অনতিবিলম্বে** তাওবা করে নেয়। এরাই সেসব লোক, যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।'[৫১৪]

স্বাভাবিকভাবে 'মন্দ কাজ' বলা হলে সগীরা এবং কবীরা উভয় প্রকার গোনাহ-ই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

'অজ্ঞতাবশত' মন্দ কাজ করার ব্যাখ্যা

'অজ্ঞতাবশত' বলে গুনাহ করা উদ্দেশ্য। যদিও কাজটি সম্পর্কে ব্যক্তির জানা

[৫১৩] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৩৫৩৭; আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ৬৪০৮

[৫১৪] সূরা নিসা, ৪ : ১৭

থাকে। কারণ, আল্লাহর অবাধ্য ব্যক্তি মাত্রই মূর্খ এবং তাঁর অনুগত মাত্রই জ্ঞানী। এর ব্যাখ্যা দুটি।

প্রথমত : আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যার জানা থাকবে, সেই তাঁকে ভয় করবে। কারণ আল্লাহর কথা স্মরণ থাকাবস্থায় তাঁর অবাধ্যতা করা যায় না। জনৈক সালাফ বলেছেন, 'আল্লাহর বড়ত্ব সম্পর্কে চিন্তা করলে মানুষ কখনোই তাঁর অবাধ্যতা করত না।' অপর এক সালাফ বলেছেন, 'আল্লাহকে ভয় করাই প্রকৃত জ্ঞান এবং তাঁর ব্যাপারে ধোঁকা খাওয়াটাই প্রকৃত অজ্ঞতা।'

দ্বিতীয়ত : আল্লাহর অবাধ্যতা করার কারণ হলো মূর্খতা এবং দ্রুত (তাওবার) স্বাদ উপভোগ করা যাবে এমনটা ধারণা করা। এমন ব্যক্তি ঈমানদার হলে আশা করবে যে, শেষ জীবনে তাওবা করে গুনাহমুক্ত হয়ে যাবে। এটা নিরেট মূর্খতা। কারণ, তাকওয়ার সম্মান, সাওয়াব এবং আনুগত্যের স্বাদ তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। গুনাহ এবং লাঞ্ছনা দ্রুতই জুটবে তার কপালে। তাওবার সুযোগ তার হতেও পারে, আবার আচমকা মৃত্যুও এসে যেতে পারে। এই ব্যক্তির অবস্থা হলো এমন ভুখা ব্যক্তির মতো, যে উপস্থিত ক্ষুধা দূর করার জন্য বিষ খেয়ে নেয়। আবার এও আশা রাখে যে, অতি দ্রুতই যে প্রতিষেধক গ্রহণ করবে। এটা তো মূর্খতাসুলভ কাজ।

অনতিবিলম্বে তাওবার ব্যাখ্যা

অধিকাংশ আলিমের মতে 'অনতিবিলম্বে' বলতে মৃত্যুর পূর্বেই উদ্দেশ্য। কারণ, জীবনটা অনেক সংক্ষিপ্ত। আবার দুনিয়াটাও সংক্ষিপ্ত। সুতরাং মরার আগে তাওবা করা মানেই অনতিবিলম্বে তাওবা। মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করার ভাগ্য যার হয় না, সে তো অনেক দেরি করে ফেলে। কণ্ঠনালিতে রূহ পৌঁছার আগেই তাওবা করা মানে অনতিবিলম্বে তাওবা। সুতরাং এমন তাওবা কবুল হবে। পরের আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ
ٱلْـَٔـٰنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١٨

'তাওবা তাদের জন্য নয় যারা সারাজীবন মন্দ কাজ করে। অবশেষে তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, আমি এখন তাওবা করছি। আর তাওবা নেই তাদের জন্যও, যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়।

এরাই তারা, যাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।'[৫১৫]

এখানে মৃত্যুর সময় তাওবাকারী এবং তাওবা ছাড়াই মৃত্যু-বরণকারীকে আল্লাহ তাআলা এক কাতারভুক্ত করে দিয়েছেন। মৃত্যুর সময় চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে যায়। মুমূর্ষু ব্যক্তি আখিরাতের বিষয়াদি ও ফেরেশতাদের দৃশ্য দেখতে পায়। ঈমান, তাওবা এবং সমস্ত আমল তখনই কাজে আসবে, যখন সেটা না দেখে হবে। পর্দা সরে যাওয়া এবং অদৃশ্য বিষয়াবলি দৃশ্যমান হয়ে যাওয়ার পর, সে অবস্থায় ঈমান কোনো কাজে আসবে না।

'রূহ কণ্ঠাগত না হওয়া পর্যন্ত' এর ব্যাখ্যায় ইবনু উমার ﷺ বলেন, 'রূহ বের হওয়ার সময় যতক্ষণ-না কণ্ঠনালি পর্যন্ত পৌঁছায়।'

কুলি করার জন্য কণ্ঠনালি পর্যন্ত পানি নিয়ে গরগরা করার দৃশ্যের সাথে মুমূর্ষু ব্যক্তির অবস্থা তুলনা করা হয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করেই কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَـٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾

'যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং তোমরা কেবল তাকিয়ে থাকো, আমি তখন তোমাদের চেয়েও তার বেশি কাছে থাকি। কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।'[৫১৬]

তিনি আরও বলেন,

كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ ﴿٢٦﴾

'কখনও নয়, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে।'[৫১৭]

ইবনু আবিদ দুনইয়া ﷺ থেকে বর্ণিত, হাসান ﷺ বলেছেন, 'মৃত্যুর সময় বান্দার রূহ যখন কণ্ঠাগত হয়, ওই সময় তার সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়ে থাকে। তখন সে ছটফট করতে থাকে এবং প্রাণ বেরিয়ে যায়।' এরপর হাসান ﷺ কাঁদতে লাগলেন।

---

[৫১৫] সূরা নিসা, ৪ : ১৮

[৫১৬] সূরা ওয়াকিআ, ৫৬ : ৮৩-৮৫

[৫১৭] সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ২৬

আসলে জীবন মানুষকে আশান্বিত করতেই থাকে। দুনিয়াতে মানুষের আশা কখনোই শেষ হয় না। মানুষের মনও তাকে আশা ত্যাগ এবং গুনাহের আসক্তি পরিহার করতে সম্মতি দেয় না। শয়তান তাওবাকে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে থাকে। অবশেষে মৃত্যু এসে পড়লে এবং জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গেলে, তখন দুনিয়ার মোহ কেটে যায়। ব্যক্তি তখন ভীষণভাবে অনুতপ্ত হয়। দুনিয়াতে ফিরে গিয়ে তাওবা এবং নেক আমল করার সুযোগ চাইতে থাকে। কিন্তু সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয় না। ফলে একদিকে চলতে থাকে সুযোগ হারানোর আক্ষেপ, অপরদিকে মৃত্যুর যন্ত্রণা।

মৃত্যুর আগেই তাওবা এবং নেক আমলের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُۥ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾ وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَٰحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِى جَنۢبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّٰخِرِينَ ﴿٥٦﴾

‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো তোমাদের কাছে আজাব আসার আগেই। এরপর তোমাদের আর সাহায্য করা হবে না। অনুসরণ করো তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে উত্তম যা নাজিল হয়েছে তার। তোমাদের কাছে অতর্কিতভাবে ও অজ্ঞাতসারে আযাব আসার আগেই। যাতে কাউকে বলতে না হয়, হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে অবহেলা করেছি তার জন্য আফসোস! আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।’[৫১৮]

এক মুমূর্ষু ব্যক্তি কপাল চাপড়ে বলছিল, হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে অবহেলা করেছি, তার জন্য আফসোস! আরেক মৃত্যুপথযাত্রী বলছিল, দুনিয়া আমাকে নিয়ে উপহাস করে আমার দিনগুলিই শেষ করে দিয়েছে। অন্য এক মুমূর্ষু ব্যক্তি উপস্থিত লোকদের বলছিল, দুনিয়া আমাকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। তোমাদের যেন ধোঁকায় ফেলতে না পারে।

---

[৫১৮] সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৪-৫৬

আল্লাহ তাআলা বলেন,

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّآ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۖ

'তাদের কারও কাছে মৃত্যু এলে সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আবার (দুনিয়াতে) পাঠান। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি আগে করিনি। না, এটা হওয়ার নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র।'[৫১৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

'আমি তোমাদের যে রিযক দিয়েছি মৃত্যু আসার আগেই তা থেকে ব্যয় করো। অন্যথায় (মৃত্যু এসে গেলে ব্যক্তি) বলবে, ইয়া রব, আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলেন না কেন, তাহলে আমি সাদাকাহ করতাম এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ তাকে কোনোভাবেই অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে ব্যাপারে সম্যক অবহিত।'[৫২০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ

'তাদের এবং তাদের বাসনার মাঝে অন্তরাল করা হয়েছে।'[৫২১]

উমার ইবনু আবদিল আযীয ﷺ-সহ সালাফদের একটি দল এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা তাওবার আকাঙ্ক্ষা করেছিল। সে আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের মাঝে অন্তরাল করে দেওয়া হয়েছে।

---

[৫১৯] সূরা মুমিনূন, ২৩ : ৯৯-১০০

[৫২০] সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ : ১০-১১

[৫২১] সূরা সাবা, ৩৪ : ৫৪

হাসান ﷺ বলেছেন, 'হে আদম-সন্তান! তুমি আল্লাহকে ভয় করো। সুযোগ ছুটে যাওয়ার আক্ষেপ আর মৃত্যুর যন্ত্রণা তোমার মাঝে যেন একসাথে কাজ না করে।'

কবরে থাকা মৃত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা এটাই, কিছু সময়ের জন্য যেন তাদেরকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে তারা ছুটে গিয়ে তাওবা আর নেক আমল করবে। অথচ দুনিয়াবাসীরা অবহেলা করে থাকে। তাদের জীবন কেটে যায় উদাসীনতায় বা গুনাহের মাঝে।

তাওবার ক্ষেত্রে মানুষের ভিন্নতা

- **চরম হতভাগা :** কারও কারও তো খাঁটি তাওবা করার সুযোগই হয় না। বরং জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গুনাহে লিপ্ত থাকে। এমনকি তাদের মৃত্যুও হয় গুনাহে লিপ্ত অবস্থায়। এটা হলো হতভাগাদের অবস্থা। এর থেকেও শোচনীয় অবস্থা হয় তাদের, যারা জীবনের শুরু থেকে ভালো কাজ করতে থাকলেও শেষ দিকে এসে খারাপ কাজে লিপ্ত হয়। আর এ অবস্থাতেই তাদের মৃত্যু ঘটে। চক্ষুষ্মান থাকার পরে অন্ধ হয়ে যাওয়া যতটা কষ্টের, তার থেকেও বেশি কষ্টের হলো—হিদায়াত লাভের পর গোমরাহ হয়ে যাওয়া। কিংবা আল্লাহকে ভয় করার পর তাঁর নাফরমানি করে বসা।

- **অনুগ্রহ-প্রাপ্ত বান্দা :** আরেক প্রকার মানুষ উদাসীনতা এবং পাপাচারে জীবন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু একসময় ভালো কাজ করার সুযোগ পায়, আর এ অবস্থাতেই তার মৃত্যু ঘটে। এই ব্যক্তির অবস্থা এমন, যে কিনা জাহান্নামীদের পথে চলছিল। চলতে চলতে জাহান্নাম এবং তার মাঝে মাত্র এক হাত পরিমাণ দূরত্ব বাকি ছিল। তখন তাকদীরের লিখন তার থেকে অগ্রগামী হয়ে যায়। ফলে সে জান্নাতীদের আমল করে জান্নাতে চলে যায়।

একবার নবি ﷺ বললেন,

«إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا، عَسَلَهُ»

'আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার কল্যাণ চাইলে তাকে মধুমিশ্রিত করে দেন।'

সাহাবিরা 'মধুমিশ্রিত' করে দেওয়ার ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। নবি ﷺ বললেন,

«يَفْتَحُ اللهُ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا قَبْلَ مَوْتِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ»

'আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তিকে মৃত্যুর আগে কোনো ভালো কাজ করা সুযোগ দেন। তারপর এ অবস্থাতে তাকে তুলে নেন।'[৫২২]

আবদুল ওয়াহিদ ﷺ 'কতলাল কুরআন' গ্রন্থে নিজস্ব সনদে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বসরার এক সম্ভ্রান্ত লোক দাসীকে সাথে নিয়ে একটি নৌযানে ওঠে। সে মদ পান করছিল আর দাসীটি গান গাইছিল বীণা বাজিয়ে। নৌযানে আরোহী ছিলেন একজন বুজুর্গ ব্যক্তি। একপর্যায়ে সম্ভ্রান্ত লোকটি বুজুর্গ ব্যক্তিকে ডেকে বলল, এই দাসীর মতো গাইতে পারবে? তিনি বললেন, এর থেকেও উত্তম কিছু পারব।

বুজুর্গের গলা ছিল চমৎকার। তিনি পড়তে শুরু করলেন,

قُلْ مَتَـٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝٧٧ أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

'তাদের বলে দিন, পার্থিব ভোগ-বিলাস সীমিত এবং যে মুত্তাকি তার জন্য আখিরাতই উত্তম। তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই। এমনকি সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরে অবস্থান করলেও।'[৫২৩]

লোকটি তখন পাত্রে থাকা মদ পানিতে ফেলে দিয়ে বলল, 'এটা তো দেখছি আমার শোনা গান থেকেও উত্তম। এ ছাড়া আরও কিছু জানো কি?' বুজুর্গ তখন হাঁ-বাচক উত্তর দিয়ে তিলাওয়াত করলেন,

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّـٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ

'বলুন, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে; সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা হয় প্রত্যাখান করুক। জালিমদের জন্য আমি আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার প্রাচীরগুলো তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে।'[৫২৪]

---

[৫২২] আহমাদ, আলমুসনাদ, হাদীস নং : ২১৯৪৯, ইরাকি ﷺ এ হাদীসের সনদ ভালো বলেছেন।

[৫২৩] সূরা নিসা, ৪ : ৭৭-৭৮

[৫২৪] সূরা কাহফ, ১৮ : ২৯

বুজুর্গের তিলাওয়াত শুনে লোকটির মনে দাগ কাটল। সমস্ত মদ পানিতে ফেলে দিয়ে বীণাটি সে ভেঙে ফেলল। তারপর বুজুর্গকে বলল, 'মুক্তির কোনো উপায় আছে কি?' বুজুর্গ বললেন, হ্যাঁ, আছে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন,

قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

'বলুন, হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ! আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৫২৫]

ওই লোকটি তখন বিকট চিৎকার দিল। সবাই লক্ষ করে দেখল, সে মৃত্যুবরণ করেছে।

ইবনু আবিদ দুনইয়া ﷬ নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেছেন, সালিহ আল-মুররি ﷬ একদিন তাঁর মজলিসে ছিলেন। লোকদেরকে শিক্ষণীয় ঘটনা শোনাচ্ছিলেন। তখন একজন লোক তাঁর সামনে এ আয়াত তিলাওয়াত করল,

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْءَازِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَٰظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾

'তাদেরকে সতর্ক করুন আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখ-কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। পাপিষ্ঠদের জন্যে কোনো বন্ধু নেই এবং সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন সুপারিশকারীও নেই।'[৫২৬]

সালিহ ﷬ তখন জাহান্নাম, জাহান্নামীদের অবস্থা এবং কীভাবে তাদের জাহান্নামে নিয়ে আসা হবে, সেই বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করলেন। মর্মস্পর্শী এ আলোচনা শুনে শ্রোতারা কাঁদতে লাগল। নিজের প্রতি অবিচার করেছিল এমন এক যুবক সেখানে উপস্থিত ছিল। সে দাঁড়িয়ে বলল, এতক্ষণ যা কিছুর বর্ণনা দিলেন এর সবই কি কিয়ামাতের দিন ঘটবে? সালিহ বললেন, হ্যাঁ। তবে এর থেকেও ভয়াবহ বিষয় ঘটবে। জাহান্নামীরা আহাজারি করতে

[৫২৫] সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৩
[৫২৬] সূরা মুমিন, ৪০ : ১৮

থাকবে। একসময় তাদের জবান থমকে গিয়ে রুগ্ন মানুষের মতো ফোঁপানির আওয়াজ বের হতে থাকবে।

যুবকটি তখন চিৎকার করে বলে উঠল, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আহহা! জীবনের দিনগুলি আমি কত উদাসীনভাবে কাটিয়েছি! আফসোস, দুনিয়ার জীবনটা আমি নষ্ট করে দিয়েছি।' এই বলে সে কিবলামুখী হয়ে খাঁটি অন্তরে তাওবা করল। তাওবা কবুল হওয়ার জন্য দুআ করল। এরপর সে কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে গেল। এ অবস্থায় তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো মজলিস থেকে। সালিহ ﷀ এবং তাঁর ছাত্ররা কয়েকদিন তার সেবা করলেন। এরপর তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। তার জানাযায় অনেক মানুষের সমাগম ঘটে। সালিহ ﷀ মজলিসে প্রায়ই সে যুবকের কথা আলোচনা করতেন। একবার একজন লোক যুবককে স্বপ্নে দেখল। তার অবস্থা জানতে চাইল। উত্তরে যুবক বলল, 'সালিহ'র বরকতময় মজলিসের কারণে আমি আল্লাহ তাআলার বিপুল রহমতের হিস্যা পেয়েছি।'

- **সর্বোচ্চ তবকা :** আরেক প্রকার লোক আছে যারা তিন প্রকারের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার। তারা এমন লোক যারা আল্লাহর হুকুম পালন করে জীবন কাটায়। এরপর মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তাদেরকে সতর্ক করা হয়। যাতে তারা নতুন উদ্যমে পাথেয় সংগ্রহ করে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে। এটাই হয় তার শেষ আমল।

ইবনু আব্বাস ﵄ বলেছেন, সূরা নাসর অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে নবি ﷺ-কে তাঁর মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে দেওয়া হয়। তখন থেকে আখিরাতের ব্যাপারে তিনি আরও বেশি মেহনত করতে থাকেন।

উম্মু সালামা ﵂ বলেছেন, নবি ﷺ শেষ বয়সে সব সময় 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি' পড়তেন। এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'এ ব্যাপারে আমি আদিষ্ট হয়েছি।' এরপর তিনি এই সূরা তিলাওয়াত করলেন।

নবি ﷺ-এর অভ্যাস ছিল রমাদানে দশ দিন ইতিকাফ করা এবং জিবরীল ﵇ কে একবার কুরআন শোনানো। কিন্তু শেষ বছর তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করেন এবং কুরআন দু'বার শোনান। তিনি বলতেন, 'মনে হয় আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে।'

নেককারদের সরদারকেই যদি অন্তিম মুহূর্তে নেক আমল বাড়িয়ে দিতে বলা হয়, তাহলে অলীক আশা এবং বিভ্রান্তিতে জর্জজরিত ব্যক্তির অবস্থা কেমন হওয়া দরকার।

জনৈক সালাফ বলেছেন, 'সকাল সন্ধ্যায় তাওবা করো।'

মুমিনের উচিত সর্বাবস্থায় তাওবা করতে থাকা। কখন মৃত্যু এসে পড়বে, তা তো কারও জানা নেই। কেউ সকাল-সন্ধ্যা তাওবা ছাড়া কাটালে, সেটা তার জন্য ভয়ের বিষয়। কারণ আল্লাহ তাআলার সাথে তাওবা ছাড়া সাক্ষাৎ করলে জালিমদের দলভুক্ত হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ۝١١

'যারা তাওবা করে না, তারাই জালিম।'[৫২৭]

যৌবনে তাওবা করতে দেরি করা নিন্দনীয় কাজ। বৃদ্ধ বয়সে এটা তো আরও বেশি নিন্দনীয় এবং চরম ঘৃণিত। অসুস্থ হলে তাওবা করতে বিলম্ব করা আরও ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় বিষয়। কারণ, অসুস্থতা হলো মৃত্যুর সতর্কবার্তা। রোগীর সেবাকারীর উচিত তাকে তাওবা-ইসতিগফারের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। কারণ শেষ সময়ে সর্বোত্তম আমল হলো তাওবা-ইসতিগফার। এগুলো গুনাহের কাফফারা এবং নেক আমলের সীলমোহর। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন।

সাইয়িদুল ইসতিগফার সকাল-সন্ধ্যায় পাঠকারী সে দিন মারা গেলে জান্নাতী হবে।[৫২৮] আবূ সাঈদ এবং আবু হুরায়রা ﵄ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন,

«وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، وَأَنَا أَكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ قَالَ: يَقُولُ اللهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ اللهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، قَالَ اللهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، لِيَ الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ قَالَ اللهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي»

وَكَانَ يَقُولُ: «مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ»

---

[৫২৭] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১১

[৫২৮] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৬৩০৬

“কেউ যখন বলে, ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই’, তখন এই বক্তব্য সত্যায়ন করে তার রব বলেন, ‘হ্যাঁ, আমি ছাড়া ইলাহ নেই। আমি মহান।’ যখন সে বলে, ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক’, তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি ছাড়া ইলাহ নেই, আমি একক।’ যখন সে বলে, ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক। তার কোনো শরিক নেই’, তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি ছাড়া ইলাহ নেই। আমি একক, আমার শরিক নেই।’ যখন সে বলে, ‘আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই, সার্বভৌমত্ব তাঁর আর তাঁরই জন্য সব প্রশংসা’, তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি ছাড়া ইলাহ নেই। সার্বভৌমত্ব আমারই, আর আমার জন্যই সব তারীফ।’ সে বলে, ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আল্লাহ ছাড়া কারোর শক্তি-সামর্থ্য নেই’, তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি ছাড়া ইলাহ নেই। ছাড়া কারোর শক্তি-সামর্থ্য নেই।’” নবি ﷺ আরও বলতেন, ‘রোগশয্যায় এই কথাগুলো বলার পর কেউ যদি মারা যায়, তবে জাহান্নামের আগুন তাকে গ্রাস করবে না।’[৫২৯]

রমাদানের সিয়াম, হাজ্জ বা উমরা সম্পন্ন করার পর কেউ মারা গেলে, সালাফগণ সে ব্যক্তির ব্যাপারে জান্নাতের আশা রাখতেন। নেক আমল সঠিকভাবে করার প্রচেষ্টা, তাঁরা সব সময় করতেন। তা সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় তাওবা-ইসতিগফার জারি রাখতেন। আমলের শেষে ইসতিগফার এবং কালিমা তাওহীদ পাঠ করতেন। সুতরাং তাওবা করুন। মৃত্যুর পালা আসার আগেই তাওবা করে নিন। অন্যথায় অবহেলাকারীর কপালে অনুতাপ আর ব্যার্থতা ছাড়া কিছুই জুটবে না। বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই আল্লাহর দুয়ারে ধর্ণা দিন। সচেতন হোন। এখনই সময় প্রয়োজন পেশ করার। তাওবাকারীদের উৎকণ্ঠার দৃশ্য অতি মনোরম। আল্লাহর দরবার থেকে যারা অনুপস্থিত ছিল, তাদের ফিরে আসার দৃশ্য অতি চমৎকার। আল্লাহর দরবারে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকার দৃশ্য নয়নাভিরাম।

বার্ধক্যে উপনীত হওয়া ব্যক্তি হলো প্রসবের অপেক্ষারত নারীর মতো, যার সময় পূর্ণ হয়ে গেছে। তেমনিভাবে, বৃদ্ধ ব্যক্তিও মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এমন সময়েও গুনাহ করতে থাকা অত্যন্ত ঘৃণ্য বিষয়। তবে যৌবনেই তাওবা করে নেওয়া উত্তম। যুবক তো ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকে। আর বৃদ্ধ তো দুর্বল এবং শক্তিহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং উভয়ে সমান না হওয়াই স্বাভাবিক।

[৫২৯] তিরমিযি, আসসুনান, হাদীস নং : ৩৪৩০

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝٣

'আল্লাহর রাসূলের সামনে যারা নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তর তাকওয়ার জন্যে পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।'[৫৩০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উমার ﷺ বলেছেন, 'এরা এমন লোক, যারা গুনাহ করতে ইচ্ছা করে কিন্তু সে কাজে জড়ায় না।'

ওহে গুনাহগার! তোমার লালসার সমাপ্তি কি ঘটেনি? জেনে রেখো, মজলিস থেকে তাওবার সংকল্প করে যখন তুমি উঠে যাও, তখন রহমতে ফেরেশতারা তোমাকে স্বাগত জানাতে থাকে। কাজেই গুনাহগাররা তোমাকে ডাকলে তুমি সেটা প্রত্যাখ্যান করে বলবে—কক্ষনো না! তোমরা আমাকে যে প্রবৃত্তির নেশাতে জড়াতে চাইছ, সেটাতে আমি কখনোই জড়াব না।

ওহে এমন ব্যক্তি, যার আমল গুনাহ দিয়ে কালো হয়ে গেছে! তাওবার মাধ্যমে সেগুলি মিটিয়ে দেওয়ার এখনই সময়। ওহে এমন ব্যক্তি, প্রবৃত্তির মাধ্যমে যার অন্তর মাতাল হয়ে আছে! তোমার কি সচেতন হওয়ার সময় আসেনি?

***

[৫৩০] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৩

دار الفلاح

দারুল ফালাহ

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

ক্রমিক নং	বই	লেখক
১	সত্য নবি শেষ নবি ﷺ	ইমাম ইবনু তাইমিয়া رحمه الله
২	জীবনকে কাজে লাগান	ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী رحمه الله
৩	মুসাফিরের পাথেয়	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله

আমাদের প্রকাশিতব্য বইসমূহ

ক্রমিক নং	বই	লেখক
১	মুখতাসার যাদুল মাআদ	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله
২	শব্দে-শব্দে আল কুরআন	-
৩	আল কুরআনের সরল অনুবাদ	-
৪	তাফসীর ইবনু রজব হাম্বলী	ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী رحمه الله
৫	আল-আদাবুল মুফরাদ	ইমাম বুখারি رحمه الله

জীবন কী? এ জীবন আমরা কেন পেলাম? পৃথিবীতে কী উদ্দেশ্যে আমাদের পাঠানো হয়েছে?—এসব দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর বহুকাল ধরেই মানুষ খুঁজে ফিরছে।

অবশ্য যিনি আমাদের পাঠিয়েছেন, সেই মহান আল্লাহ-ই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রেখেছেন কুরআন কারীমে। এ পৃথিবীতে মানুষকে পাঠানোর উদ্দেশ্য শুধু তাঁর ইবাদাত করা। স্রেফ এটুকুই, আর কিছু না। এই ইবাদাতের জন্যে তিনি আয়ুষ্কাল দিয়েছেন। সময়কে ভাগ করে দিয়েছেন বছর-মাস-সপ্তাহ ইত্যাদি এককে। এক সময়ের ওপর আরেক সময়কে শ্রেষ্ঠত্বও দিয়েছেন।

আমাদের এই দুনিয়ার জীবন কিছু ঘণ্টা-মিনিট-সেকেন্ডের সমষ্টি মাত্র। সময়কে উপযুক্ত খাতে ব্যয় করা তথা ইবাদাতে বিনিয়োগ করার মধ্যেই দুনিয়ার জীবনের সার্থকতা। আর এটাই জীবনকে কাজে লাগানো।

কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে জীবনকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তার একটা প্র্যাক্টিকাল গাইডবুক 'জীবনকে কাজে লাগান' বইটি। প্রায় ৭০০ বছর পূর্বে রচিত কিতাব থেকে অনূদিত এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে মহান রবের জন্যে বছরের বারোটি মাস কীভাবে নিবেদিত করা যায়, তারই নমুনা। বারো মাসের করণীয়-বর্জনীয়, গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক আমল, সেগুলোর দলিল-ভিত্তিক আলোচনা—সব মিলিয়ে ইবাদাত-বন্দেগির এক চমৎকার নির্দেশিকা 'জীবনকে কাজে লাগান'।

دار الفلاح
দারুল ফালাহ